কদম্ব কমল নামে তনয়যুগল
হাস্যমুখে বন্দে আসি পিতৃ-পদতল।
দাসীর কোলেতে থাকি বিপণি তনয়া
পিতৃ-কোলে যায় ক্ষুদ্র ভুজ প্রসারিয়া।
তখন কপিল দেব পুত্র কন্যা নিয়ে
বিশ্রাম করেন সুখশয্যায় বসিয়ে।
কস্তুরিকা সতী, তাঁর বসি পদতলে
পতিকে করেন তুষ্ট গল্প স্বল্পচ্ছলে।

২

পত্নীর ধরিয়া হস্ত প্রভাতে প্রদোষে
কপিল বাগানে যান—শীতল বাতাসে।
সুকোমল পুষ্পগুলি পড়ে চারিভিত,
শিশির ঝরিয়া পড়ে, পাখী গায় গীত।
চারি দিকে মনোহর মধুরসলিলা
মানস-সরসীগুলি হিল্লোল-কুন্তলা।
প্রভাতে শোভয় তাহে পদ্ম অলঙ্কার,
ঘন ঘন উঠে কৃষ্ণ ভ্রমরঝঙ্কার।
প্রদোষে মুদিত পদ্মে নিদ্রিত ভ্রমর,
কি মধুর! সমীরণ করে সরসর।
মানস-সরসে হংস, কপিল-পালিত
মৃণালিনী সহ করে মৃণালে দলিত।
কপিল ও কস্তুরিকা সরসীর তীরে
প্রদোষে প্রভাতে কত সুখে ক্রীড়া করে।
কখনো তুলিয়া ফুল পীরিতি সোহাগে
সাজান কপিল দেব প্রাণের জায়াকে,
কখন বা কস্তুরিকা তুলিয়া কমল
পূজেন ভবানী সম পতি-পদতল।
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন
তনয় তনয়া গুলি করে আগমন।
কখন বা অপরাহ্ণে পশিয়া বাগানে
সুখে আত্ম-হারা হয় শোভা দরশনে।
অঞ্জলি অঞ্জলি তুলি গোলাপ বকুল
নির্ম্মূল করিয়া ফেলে কিশলয়কুল।
মানস সরস ত্যজি রাজহংসদল
শিশুদের কাছে এসে করে কোলাহল।
চকিতে হরিণ-শিশু যায় পলাইয়া,
শিশুরা ধরিতে যায় হাত তালি দিয়া।
অদূরে বকুলতলে বসি তৃণোপরে
কপিল ও কস্তুরিকা এই শোভা হেরে।

৩

এরূপে দম্পতী প্রেমানন্দের তুফানে
সুখে কাল কাটে রোগ শোক নাহি জানে,
কস্তুরীর বিম্বাধরে হাস্যের লহরী
চির বিকশিত যেন বিশ্ব-মুগ্ধকরী।
অগাধ আনন্দভরা আত্মার ভিতরে,
অপার গাম্ভীর্য্যরাশি বদন উপরে,
ইহাতে হয়েছে অতি শোভা অতুলন
কপিলের—দৃষ্টি মাত্র মুগ্ধ হয় মন।
মধুর উজ্জ্বল যথা মন্দার-মালিকা,
তেমনি তাদের তিন বালক বালিকা।
মুখে হাসি বুকে দয়া কার্য্যেতে তৎপর,
দেহে পরিপূর্ণ রূপ, দানেতে সত্বর।
পরম পবিত্র ভাবে সুখের হিল্লোলে
দিনগুলি নেচে নেচে যাইতেছে চলে।
ওহে বিধি নিরদয় এমন সময়
কীট-দষ্ট করি দিলে সুখ-কুবলয়!
ফিরিল সৌভাগ্য চক্র, আইল কুদিন,
বাসনা মুকুল গুলি হইল মলিন।
কপিল দেবের হ'ল ক্ষয়কাশ রোগ,
ভুগিতে লাগিল সে যে নিদারুণ ভোগ।
অরুচি উৎকট জ্বালা সর্ব্ব কলেবরে
নিরখিয়া সকলের হৃদয় বিদরে।

ত্যজিয়া আহার নিদ্রা কস্তুরিকা সতী
সেবিতে লাগিল নিজ প্রাণাধিক পতি।
খেলা ধূলা ভুলি দুটী সুবোধ তনয়
পিতার চরণ তলে সদা বসি রয়।
হায়! এই ঘটনার মাস দুই পরে.
কপিল স্বরগে গেল মহাযাত্রা করে।

৪

কে গো তুমি বিষাদিনী বসি তরুতলে
এলোচুলে ভাসিতেছ নয়নের জলে?
তেজশূন্য শোভাশূন্য যুগল নয়ন
রক্তশূন্য, মধুশূন্য, সরোজ বদন।
দুই দিকে বসি দুই নীরব তনয়,
কোলের নিকটে কন্যা হেঁট মুখে রয়।
তোমারে চিনেছি অয়ি কস্তুরিকা সতী!
ধরেছ বিষাদমূর্ত্তি হারাইয়া পতি।
দুই দিকে বসি দুই তনয় রতন
জননীকে বাহু দিয়া করেছে বেষ্টন।
কোলের নিকটে বসি বালিকা বিপণি
মাতার যন্ত্রণা হেরি বিরস-বদনী।
উঠ উঠ সতী সাধ্বী কস্তুরী ললনা,
জগত-জীবন ঘুচাবেন এ যাতনা।
কস্তুরিকা এসংসার পরীক্ষার স্থল,
অসার সংসারে সার ধর্ম্মই কেবল।
অতএব উঠ, কর শোক পরিহার,
সাধুজনে রক্ষিবেন দেব সারাৎসার।
ধর্ম্মের চরণে করি দৃঢ় প্রাণ মন
উঠিলেক সতী করি অশ্রু সম্বরণ,
চিরাঙ্কিত করি বুকে পতির মূরতি,
কর্ত্তব্য পালন হেতু উঠিলেন সতী।
কপিলের যদি হ'ল দেহের পতন
কৃষ্ণকান্তের(ও) হইল রোগের লক্ষণ।
দুই তিন দিন রহি রোগ শয্যাপরে
কৃষ্ণকান্ত চলে গেল অমর নগরে—
কপিল গিয়াছে যথা। হায় হায় হায়!
কস্তুরীর মুখ পানে কেবা ফিরে চায়?
কস্তুরীর টাকা কড়ি সব ফুরাইল,
দাস দাসী লোক জনে বিদায় করিল।
মানস সরস সহ ফুলের বাগান
বিক্রী করি টাকা দিয়ে কিনিলেক ধান।
আপনার অঙ্গে ছিল যত অলঙ্কার
বেচি বেচি অভাগিনী চালায় সংসার।
ঘরে নাই অন্ন গোটা অঙ্গে নাই বল,
ললাটে চিন্তার রেখা চক্ষে অশ্রুজল?
এইরূপে বিষাদিনী শিশুগণে নিয়ে
কভু অন্ন খায়, কভু না থাকে খাইয়ে।
'মা' বলিয়ে ডাকে যবে কদম্ব কমল,
কস্তুরীর ভাঙ্গা বুকে আসে কত বল।
দেড় বৎসরের শিশু, বালিকা বিপণি
মা বলিয়া আসে যবে তুলি হাতখানি।
আধ হাসি আধ কান্না মাখা সেই মুখ
হেরিলে দুঃখিনী যেন ভোলে সব দুখ।
কি আশ্চর্য্য বিধাতার মঙ্গলবিধান—
দুঃখের মধ্যেও প্রাণে করে শান্তি দান!!

(ক্রমশঃ)

Damaged.

দয়ানন্দ সরস্বতী।

মরভি রাজ্যের অন্তর্গত কাথিওয়ার নামক স্থানে মহাত্মা দয়ানন্দ খৃঃ ১৮২৪ অব্দে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তিনি দেবনাগর বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বংশগত রীত্যনুসারে তিনি টীকা টিপ্পনীসহ বহুসংখ্যক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন এবং গায়ত্রী শিক্ষা হয়। তাঁহার পিতৃদেব শিবোপাসক ছিলেন, সুতরাং বালককাল হইতেই তাঁহাকে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। পাছে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এই ভয়ে তদীয় মাতা শিবপূজার্থ যেরূপ উপবাসাদি করিতে হয়, তাহা করিতে দিতেন না। এই জন্য তাঁহার পিতা মাতার মধ্যে সময়ে সময়ে বাগ্‌বিতণ্ডাও হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বেদ অধ্যয়ন শেষ করিবার পর তিনি পিতৃদেবের সহিত শিব-মন্দিরে পূজার্চ্চনার জন্য গমন করিতেন। তাঁহার পিতার বিশ্বাস ছিল, শিব পূজা করাই ধর্ম্মার্জ্জনের একমাত্র পথ।

দয়ানন্দের পিতা তহসীলদারী কার্য্য করিতেন। অভাব অনাটনের মর্ম্মভেদিনী যাতনায় কখনও উৎপীড়িত হন নাই, সুতরাং দয়ানন্দ বেশ সুখ-সচ্ছন্দেই বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শঙ্করকে পূজা করিতে হইবে স্থির হইল; পিতাপুত্রে মঠে গমন করিলেন। রাত্রির গভীরতার সহিত উপাসকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা দুরূহ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা একপ্রকার নির্জ্জন হইয়া পড়িল। উপাসকমণ্ডলী ও মঠের কার্য্যকারকগণ নিদ্রার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শঙ্করের সেবা ত্যাগ করিয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাছে উপাসনার কোন অঙ্গহীন হয়, এই ভয়ে একমাত্র দয়ানন্দই জাগ্রত রহিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া মঠের বহির্ভাগে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগে রত হইলেন।

কিছুক্ষণ একাকী উপবিষ্ট থাকিবার পর তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, অভিসম্পাত-প্রদাতা, পান ভোজন-নিদ্রা-বিহার-পরায়ণ ত্রিশূল-ডম্বরু-হস্ত এই মূর্ত্তি দেবাদিদেব মহাদেব, ইহা কি সম্ভবপর? এইরূপ সন্দেহে তাঁহার মন এরূপ অশান্ত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া সুষুপ্ত পিতাকে জাগ্রত করিয়া এই মূর্ত্তি শাস্ত্রোক্ত মহাদেব কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পিতা এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কারণ জ্ঞাত হইতে …হিলে তিনি বলিলেন, মূষিকাদি যাঁহার …পর বিচরণ করিয়া যাঁহার পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে অথচ যিনি তাহার কোনও প্রতিবিধান করিতেছেন না, সে প্রতিমূর্ত্তিকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করা আমি অসম্ভব বলিয়া বোধ করিতেছি। তাঁহার পিতা বলিলেন, এই কলিযুগে মহাদেবকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব…র নহে, এই জন্য পবিত্র ব্রাহ্মণেরা মহাদেবের এই প্রস্তরমূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ভক্তেরা ইহাকেই মহাদেব বলিয়া জানে।

পিতৃদেবের এই উপদেশে তাঁহার মন কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অতিমাত্র শ্রান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসা-প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, এ জন্য উপস্থিত সন্দেহের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার জন্য পিতৃ-আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। পিতা, উপবাস ভঙ্গ করিতে বিশেষরূপ নিবারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা পালন করিতে অক্ষম হইয়া মাতৃদত্ত খাদ্য ভোজন করতঃ শয়ন করিলেন।

তাঁহার পিতা গৃহে আসিয়া শুনিলেন, তিনি উপবাস ভঙ্গ করিয়াছেন। উপবাস ভঙ্গ জন্য তাঁহার যে কি ভয়ানক পাপসঞ্চার হইয়াছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দয়ানন্দের মন হইতে পৌত্তলিকতা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি আপন ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সমস্ত সময় অধ্যয়নে নিয়োজিত করিলেন।

দয়ানন্দের দুইটি সহোদর ও দুইটি কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। একটি সহোদরা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। তিনি জীবনে এই প্রথম শোক—অতি ভয়ানক শোক প্রাপ্ত হইলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উত্তোলিত করিলেন। কিন্তু তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "মৃত্যুর নিদারুণ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এরূপ কেহ কি ইহ-জগতে ছিলেন না? আমিও হয়ত হঠাৎ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে পারি। মনুষ্য-জীবনের এই দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব? মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিব?" তিনি তৎক্ষণাৎ সংকল্প করিলেন, যেরূপেই হউক তিনি উহা লাভ করিয়া, অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা মৃত্যুসময়ে যে অনির্ব্বচনীয় কষ্টভোগ করে, তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। তদবধি ব্রতোপবাসাদির কপটতা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বিষয় কাহাকেও জানিতে দিলেন না। সোদরার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই দয়ানন্দের একটী কৃতবিদ্য খুল্লতাত জীবন-লীলা সংবরণ করেন। উপর্য্যুপরি দুইটি শোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি স্থিরনিশ্চয় করিলেন, ইহজগতে কিছুই স্থায়ী নহে, উপভোগ করিবার কোন বস্তুই এখানে নাই।

Page 70 to 105 Damaged.

যখন সংসারবিরাগের বীজ দয়ানন্দের হৃদয়ে অল্প অল্প অঙ্কুরিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে পরিণীত করিবার সংকল্প করিলেন। পরিণীত জীবন প্রশংসার্হ বলিয়া তাঁহার কখনই ধারণা ছিল না। যাহাহউক নানা উপায়ে তিনি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধ রাখিলেন। তিনি শিক্ষালাভের জন্য বারাণসী গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু, তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। বাসস্থানের ছয় মাইল দূরে একজন পণ্ডিত বাস করিতেন, তাহার নিকট তিনি সংস্কৃতশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর তিনি গৃহে আনীত হইলেন ; দেখিলেন তাঁহার বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে। এই সময়ে তাহার বয়স একবিংশবর্ষ। বিবাহ বন্ধ করিবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, যাহাতে কখনও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে না হয়, এরূপ কোনও পথাবলম্বনে স্থির-সংকল্প হইলেন।

দয়ানন্দ গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। দয়ানন্দ একাকী গমন করিতেছেন দেখিয়া একদল ব্রাহ্মণভিখারী আসিয়া তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমুদয় কাড়িয়া লইল। যাইবার সময় তাহারা বলিয়া গেল, ইহজীবনে যতই ... করিবে, যতই আত্মত্যাগী হইবে, ... জীবনে ততই ফল ভোগ করিবে। ... দিন পরে তিনি সয়লা নামক ... উপস্থিত হইলেন। লালা ভাগবত না... একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত তথায় বাস ক... তেন। দয়ানন্দ তাঁহার সম্প্রদায়ভু... হইবেন স্থির করিলেন।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে তাঁহা... নাম ও বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। তি... গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেন ; তাঁহা... নূতন নাম হইল শুদ্ধ চৈতন্য। নূত... বেশে দয়ানন্দ আহম্মদাবাদের নিকটব... কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন, এম... সময় একজন পরিচিত বৈরাগীর সহি... তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শিধপুরে... মেলায় যাইতেছেন জানিতে পারিয়... বৈরাগী তাঁহার পিতাকে সংবাদ দেয়... দয়ানন্দ নীলকান্ত মহাদেবের মন্দির... ভ্যন্তরে কয়েকজন সতীর্থের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পিতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পিতা কয়েদীর ন্যায় তাঁহাকে অনুচর সিপাহীদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু দয়ানন্দকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে তাহারা সক্ষম হইল না। কৌশলে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তিনি প্রথমে আহম্মদাবাদে আসিলেন, পরে বরদায় যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি কিছুকাল বাস করিলেন। চেতন... ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার বেদান্তের আলোচনা হইত। অনেক সন্ন্যাসী ও ...চারীর সহিতও তিনি বেদান্তের ...র্ক মীমাংসা করিতেন। ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে তিনি অহংজ্ঞান লাভ করেন ; জীব (আত্মা) ও ব্রহ্ম এক ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

মহদ্বাক্য।

১। তোমার জীবনই তোমার যথার্থ ...র্পণ।

২। নিজের সুখ বা আনন্দ পরকে বিতরণ করিতে পারিলে তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠে।

৩। আমরা বুদ্ধি পাইয়াছি এই জন্য যে ঈশ্বরের সৃষ্টি আলোচনা করিয়া ঈশ্বরকে বুঝিব।

৪। পাপজনিত দুঃখ ও যন্ত্রণা কোথায় পলায়ন করিবে, তুমি যদি এখনই মুক্তির পথ অবলম্বন কর।

৫। ঈশ্বরের চক্ষে আমরা যেরূপ প্রতীয়মান হই, যদি আমরা আমাদিগকে সেইরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের অসীম ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা উপলব্ধি করিয়া আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি সন্দেহ নাই।

৬। বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না।

৭। যে সংসারীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নাই এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা নাই, সাংসারিক চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতে পারে না।

৮। অনেক সময় পাপেরা আলস্যাধীন হইয়া যাহা হারাইতেছি, তাহা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। এরূপ কপট প্রার্থনা ভগবান্ কখনও পূর্ণ করেন না।

৯। ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণ করিয়া সুখী হইবেন, যিনি নিজকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছেন, এবং নিজে এই শিক্ষা অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করেন, তাঁহার আর সুখের অভাব হয় না।

১০। যাহা সত্য বলিয়া জান, তাহা পালন না করিয়া তুমি যত দিন জীবন-ধারণ করিবে, ততদিন তোমার শান্তি লাভের আশা নাই।

১১। ইন্দ্রিয় ও মলিন কামনাকে জয় করা সর্ব্বপ্রধান জয়। কামনাকে জয় করিলে সর্ব্বজয়ী হওয়া যায়।

১২। কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া ধর্ম্ম পালন না করিয়া, যখন আনন্দকর ও সুখকর বলিয়া তাহা পালন করিতে পারিবে, তখনই জানিবে যে তুমি জীবন্মুক্ত হইয়াছ।

১৩। তুমি নিজে আগামী কল্য কিসে

Page 110/105 Damaged.

অধিক সুখী হইবে, কিসে অধিক আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে, এই চিন্তা অধিক সময় তোমার মনে প্রবল ? না, আগামী কল্য কিসে অপরকে সুখী করিবে, কিসে অপরের আনন্দের কারণ হইতে পারিবে, এই চিন্তা তোমার মনে প্রবল ? যদি শেষোক্ত চিন্তা প্রবল না হয়, তাহা হইলে নিজের স্বার্থপরতা উপলব্ধি করিয়া নতশির হও।

১৪। এমন একটিও মানব বা মানবী নাই যে ধার্ম্মিক ও সদাচারী হইলে সমস্ত মানবজাতি উপকৃত হয় না। প্রকৃত পক্ষে, সমগ্র মানবজাতি একশরীর ও একাত্মা।

১৫। তোমার অহঙ্কারের স্ফীততা অনুসারে তুমি দেবত্ব হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছ।

১৬। তোমরা সকলে পরস্পরের সহায়তা কর, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, ইহাই সমাজ, ধর্ম্ম ও শাসানপ্রণালীর প্রাণ, ইহাই উচ্চতম সভ্যতার ভিত্তি।

১৭। নম্রতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা এই তিনটী গুণ মনুষ্যত্বের অনুগামী।

১৮। একটি প্রধান নিয়মের উপর সমগ্র নৈতিক জগৎ স্থিতি করিতেছে ; উহা এই যে ধর্ম্মসাধন দ্বারা ধর্ম্ম-পরায়ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ধর্ম্মসাধন হইতেই আত্মার উন্নতি ও মুক্তি হয়।

১৯। ক্রমে ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যেমন বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হ... যায়, তেমনি ক্রমে ক্রমে এক একটি দো... দুর্ব্বলতা ও পাপ হইতে আপনাকে ... করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অনু... চরিত্র রূপ পরম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ... যায়। সংসারে মানব যেন এই স... কখনও বিস্মৃত না হয়েন।

২০। জ্ঞান ও ধর্ম্মশূন্য অহঙ্কারী ধ... ব্যক্তির আত্মম্ভরিতার ন্যায় হাস্যকর ... হেয় পদার্থ অতি অল্পই দেখা যায়।

২১। যাহার প্রতি তোমার অনুরা... নাই, তাহার উপর তোমার কোন ... প্রভাব খাটিতে পারে না।

২২। ভ্রমে পতিত হইয়া যখন আম... ভ্রম দেখিতে পাই, তখন যে লজ্জার ... উদ্রেক হয়, তাহার তীব্রতা দুঃসহ ... অতএব ভ্রম হইতে দূরে থাকিতে সতত ... সচেষ্ট হইবে।

২৩। যদি তোমার নৈতিক শিক্ষার ... দোষ থাকে, তুমি স্বাভাবিক সরলতা গুণে ... তাহা অবশ্যই ক্ষালন করিতে পার।

২৪। ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার অভি-ব্যক্তি, ধর্ম্মজীবন ঈশ্বরের প্রকাশ।

২৫। আমার প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বর যেন সন্তুষ্ট হন, আমরা প্রত্যেকে যদি অহ-রহ এই প্রার্থনা হৃদয়ে লইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে এই পৃথিবী এক অভিনব ... সুখশান্তির আলয় হয়।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের নামাবলী।

য

...যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্, যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্ব-কিন্নর-সেবিত, যক্ষেশনাথ, যজনীয়, যজ্ঞ-...রূপ, যজ্ঞেশ্বর, যৎপরোনাস্তি, যতনের ...ধন, যতঃসর্ব্বং, যেন সর্ব্বং, যতি-জীবন, যতীন্দ্রলভ্য, যতীশ, যত্নসাধ্য, যথাকাম, যথাপূর্ব্বং তথাপরং, যন্ত্রচালক যন্ত্রণাহর, ...ন্ত্রী, যমশাসন, যমান্তক, যবনাচার্য্যপূজিত, যশস্বান্, যশস্বী, যশোদ, যশোধন, যশোধর, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, যাচক, যাচনীয়, যাচ্য, যাজ্য, যাগযজ্ঞফল-বিধাতা, যাজ্ঞিক, যাতনাহারী, যাত্রাহীন, যাত্রাসাথী, যাদু, যাদুকর, যাদুবাছাধন, যাদোনাথ নাথ, যামল, যামিকভট, যাবজ্জীবনসখা, যিহোবা, যুক্তিমূল, যুক্তি-সিদ্ধ, যুগধারী, যুগযুগান্তব্যাপী, যুগান্ত-কারী, যুগপৎসেব্য-সেবক, যুগলমেলক, যুগলসাধন-সাধ্য, যোক্তা, যুধাজিৎ, যোগ-নাথ, যোগসাধ্য, যোগক্ষেম-বিধাতা, যোগ-নিদ্রাশীল, যোগলভ্য, যোগীন্দ্রহৃদিবল্লভ, যোগীশ, যোগেশ, যোগ্যাযোগ্যবিচারক, যোগ্যযোগ্যনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, যোজক, যৌতুক যোনি, যোভ, যৌবনেশ্বর।

র

রক্তমাংসবিবর্জ্জিত, রক্তচালক, রক্ষক, রক্তশাসন, রক্ষণং রক্ষণানাং, রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষাকবচ, রক্ষোভয়-ত্রাতা, রচক, রচয়িতা, রজোহীন, রঞ্জক, রঞ্জন, রণেন্দ্র, রতিমতি-দাতা, রত্ন, রত্নসার, রত্নাকর, রথচালক, রথী, রন্ধ্রহীন, রম, রমণীয়, রম্য, রবহীন, রবীন্দ্র, রবিজভয়নাশন, রস, রসজ্ঞ, রসদাতা, রসময়, রসরাজ, রসস্বরূপ, রসাল, রসিক, রসিকেশ্বর, রহস্য, রাখালরাজ, রাগদ্বেষবিহীন, রাজধর্ম্মাদর্শ, রাজরাজ, রাজা, রাজ-রাজেশ্বর, রাজার রাজা, রাম, রাসেশ্বর, রিপুনাশন, রুগ্নবন্ধু, রুচির, রুদ্র, রুদ্রেশ্বর, রূপবান্, রূপবিবর্জ্জিত, রেণুর রেণু, রোগনাশন, রোগহা, রোচক, রোচিষ্ণু, রোদননিবারণ, রৌরব-ত্রাতা।

ল

লক্ষনামা, লক্ষপতি, লক্ষভুবনেশ্বর, লক্ষ-বিপদবারণ, লক্ষসম্পদকারণ, লক্ষ্মীশ, লক্ষ্য, লঘিষ্ঠ, লঘুতম, লঘুহস্ত, লজ্জাদাতা, লজ্জা-নিবারণ, লজ্জাশীল, লয়কারী, লয়হীন, ললাট-লিপি-বিধাতা, ললাম, ললিত, লালক, লালিত্যময়, লাবণ্যময়, লাভালাভ-হীন, লিপ্সাহীন, লীলাময়, লীলারসময়, লুকান ধন, লুক্কায়িত, লোকগুরু, লোক-নাথ, লোকপাল, লোকবন্ধু, লোকস্থিতি-কারণ, লোকান্তরসাথী, লোকেন্দ্র, লোকেশ, লোকভঙ্গনিবারণ, লোকভয়-হারী, লোচন, লোচনানন্দ, লোপভয়-বিরহিত, লোভনীয়, লৌকিকাতীত।

উত্তপ্ত করিলে লাফিংগ্যাস বহির্গত হয় ও জল অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যথা—
$NH_4NO_3 = 2H_2O + N_2O$

২। অল্প জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিডে জিঙ্ক্ দ্রব করিলে অল্পে অল্পে লাফিংগ্যাস বহির্গত হয়।

পরীক্ষা—ইহার সমস্ত পরীক্ষা অক্সিজেনের ন্যায়; এজন্য ইহাকে অক্সিজেন বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ইহা অধিক পরিমাণে জলে দ্রব হয় বলিয়া ইহাকে অক্সিজেন হইতে পৃথক্ করা যায়।

নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide)

চিহ্ন N_2O_2 বা NO;

মৌলিক গুরুত্ব ৩০।

বায়ুতে যে O আছে, পণ্ডিতেরা ইহা দ্বারা তাহা নির্ণয় করেন। ইহা সাল্‌ফিউরিক এসিডের প্রস্তুতির এক প্রধান উপযোগী পদার্থ।

ধর্ম্ম। ইহা বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন, স্বচ্ছ, অদৃষ্ট বায়বীয় পদার্থ। অসংযুক্ত অম্লজান সংযোগে N_2O_2 রক্তবর্ণ ধূম উত্থিত হয়। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী; বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ১.০৩৯ ধরা যায়। ইহা জলে দ্রব হয় না। ইহা না দাহক, না দাহ্য হইলেও ইহার মধ্যে ফস্‌ফরাস্ দগ্ধ হয়।

সংগ্রহপ্রণালী—

১। কপার অক্সাইডে (Copper Oxide) জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড (Nitric Acid) ঢালিয়া দিলে তাম্র দ্রব হয় এবং নীলবর্ণ কপার নাইট্রেট ও নাইট্রিক অক্সাইড প্রস্তুত হয়। যথা—
$3Cu + 8HNO_3 = 3(CuN_2O_6) + 8H_2O + 2NO$ বা $3Cu + 8HNO_3 = (3Cu, 2NO_3) + 4H_2O + 2NO$.

২। এসিড ফেরাস্ ক্লোরাইডের (Acid Ferrous chloride) সহিত নাইটর্ (Nitre) মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে নাইট্রিক অক্সাইড প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নাইট্রজেন ট্রয়ক্সাইড ও নাইট্রজেন টেট্রক্সাইড।

Nitrious Acid and Nitric Peroxide.

চিহ্ন N_2O_3 ও N_2O_4;

মৌলিক গুরুত্ব—৭৬ ও ৯২।

এই দুইটী যৌগিক পদার্থের প্রকৃত গুণ ও পরস্পরের সম্বন্ধ স্থিরীকরণ পক্ষে অদ্যাপি সন্দেহ আছে। ইহা স্থির হইয়াছে যে, যখন নাইট্রিক অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা রক্তিমবর্ণ ধূমাকারে নাইট্রিক পার্‌অক্সাইড প্রস্তুত করে এবং যদি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন না পায়, তাহা হইলে নাইট্রজেন ট্রায়অক্সাইড উৎপন্ন করে।

ধর্ম্ম—ইহা রক্তবর্ণ গন্ধহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহা জলে অধিক পরিমাণে দ্রব হয়। ইহা অতি সহজে যাহার তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এক শ্রেণীর লবণ প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে নাইট্রস কহে।

প্রস্তুতপ্রণালী—বড় বোতলে (Retort) নাইট্রিক এসিডের সহিত ষ্টার্চ (Starch) মিশ্রিত করিলে নাইট্রস এনহাইড্রাইড প্রস্তুত হয়। নাইট্রেট্ অব লেড্‌কে (Nitrate of Lead) উত্তপ্ত করিলে নাইট্রিক পার্ অক্সাইড পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন পেণ্টক্সাইড।

Nitric Anhydride.

চিহ্ন—N_2O_5; মৌলিক গুরুত্ব—১০৮।

ইতিহাস—১৮৪৪ অব্দে ডিভিল্ (Deville) সাহেব প্রথমে নাইট্রিক এনহাইড্রাইডকে শ্বেতবর্ণ স্ফটিকাকারে আনয়ন করেন। অসংযুক্ত অবস্থায় বায়ুরাশিতে অতি অল্প পরিমাণে ইহার সত্তা আছে।

সংগ্রহপ্রণালী—

ইহা সহজে পাওয়া যায় না। আর্জেন্টিক্ নাইট্রেটের উপর শুষ্ক ক্লোরাইণের স্রোত চালাইলে ইহা পাওয়া যায়। যথা—
$4AgNO_3 + 4Cl = 4AgCl + O_2 + 2N_2O_5$।

চতুর্দ্দশ ভুবন ও জীবদেহ।

চতুর্দ্দশ ভুবন।

এই বিরাট-দেহরূপ পুরীকে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের কল্পনা করা যায়। নিম্ন ও ঊর্দ্ধভেদে চতুর্দ্দশ ভুবনের দুইটী অংশ আছে। নিম্নাংশকে পাতাল ও ঊর্দ্ধাংশকে স্বর্গ বলে। পাতাল সাতটী ও স্বর্গও সাতটী। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন হইয়াছে। বিরাট পুরুষের কটি হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল; এবং কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহালোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিরাট-দেহের সন্ধিস্থানকে (কটিদেশকে) ভূলোক (পৃথিবী) বলা যায়।

বিরাট পুরুষের কটিদেশ অতল, ঊরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদেশে তলাতল, গুল্‌ফদেশে মহাতল, দুই পায়ের অগ্রভাগে রসাতল ও পদতল পাতাল। তোড়ল তন্ত্র।

তাঁহার নাভিস্থলে অন্তরীক্ষলোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, বক্ষঃস্থলে মহালোক, গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথ যে ব্রহ্মলোক তাহা সনাতন। ভাগবত ৫ অঃ ২ ক্ষ।

জীবদেহ।

বিরাট-দেহ যেরূপ চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বলিয়া কল্পিত হয়, জীবদেহও তদ্রূপ

কল্পিত হইয়া থাকে। জীবশরীরের পদ-তলকে তলাতল, তদূর্দ্ধকে বিতল, জানু-দেশকে সুতল, সন্ধিস্থানকে অতল, গুহ্যকে তলাতল, লিঙ্গমূলকে রসাতল ও কটি-দেশকে পাতাল কহে। তৎপরে নাভিদেশে ভূলোক, হৃদয়ে ভুবলোক, কণ্ঠে স্বর্গ-লোক, চক্ষুদ্বয়ে মহল্লোক, ভ্রূমণ্ডলে জনলোক, ললাটে তপোলোক, ব্রহ্মরন্ধ্রে সত্যলোক। তদনন্তর সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র সমস্তই দেহিগণের দেহমধ্যে বিদ্যমান আছে।

পরমাত্মা পরব্রহ্ম এই প্রকার প্রকৃতি-গঠিত বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে অভিমান স্থাপন করতঃ জীবরূপে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া এই বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন হইয়াও বন্ধমোক্ষের বাসনা হেতু মায়া ও অবিদ্যা বশে কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মাত্মা পুরুষরূপে প্রথমতঃ সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহে জীবরূপে সংযুক্ত হন। সাংখ্যভাষ্য।

যিনি কর্ম্মাত্মা পুরুষ (জীব), তাঁহা... বন্ধমোক্ষ হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মা... পুরুষই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র... বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সহিত সং... হইয়া থাকেন।

তদনন্তর গর্ভান্তরীণ হইয়া অস্থি-মা... বিশিষ্ট স্থূলদেহ ধারণ করতঃ অষ্টপাশে... হইয়া আমি তুমিরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানে... হইয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ক...

অতএব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ... এই প্রকৃতি পুরুষের গূঢ় রহস্য ... করিতে পারেন, তাঁহাকে আর সংসা... পথে ভ্রমণ করিতে হয় না।

এই সংসাররূপ বৃক্ষ সনাতন অ... ইহার আদ্যন্ত নাই। ঊর্দ্ধে ইহার ... ও অধোভাগে ইহার শাখা। বৃক্ষের ... দৃষ্ট না হইলেও যেরূপ তাহার আ... সম্ভব হয়, সেইরূপ সংসারবৃক্ষের মূল... সেই একমাত্র ব্রহ্ম অদৃশ্যভাবে আছে... তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত জ... প্রকাশ পাইতেছে।

ইলিয়াড।

(৪৮০ সংখ্যা—১১৭ পৃষ্ঠার পর)

এ দিকেতে আকিলিস বসি তরীমাঝে
রোষাবেশে যুদ্ধ হ'তে রহিলা বিরত।
কিন্তু প্রাণ তার হতেছিল প্রতিক্ষণ
ব্যাকুল—অধীর পশিতে সমরে আর
শুনিতে সঘন পুনঃ রণ-কলরোল।

হেথায় সুদীপ্তিময় রশ্মিদল সহ
দ্বাদশ দিবস অন্তে উদিলেন যবে
দিনপতি দেবপুরে, ফিরিলা হরষে
দূর আর্কিনোস হতে সহ সুরদল
দেবেন্দ্র জিয়াস। তবে থেটিস সুন্দরী

বন উর্ম্মিদল ভেদি জলতল হ'তে
চলিলা ত্রিদশপুরে নিবেদিতে ত্বরা
পুত্রের আক্ষেপ যত দেবেশ-সমীপে।
উত্তরি অলিম্পশৃঙ্গে হেরিলা সুন্দরী
দেবদল হ'তে দূরে বিরাজেন সুখে
দেবরাজ অলিম্পির উচ্চ শৃঙ্গপরে।
বসিয়া সম্মুখে দেবী জড়ায়ে সাদরে
জানুদেশ দেবেন্দ্রের প্রার্থিলা এরূপেঃ—
"হে পিতঃ যদ্যপি কভু সঙ্কটসময়ে,
করে থাকি কোন দিন সাহায্য তোমার,
তবে দেব! এবে তার প্রতিদান-রূপে
তনয়েরে মম করহ গৌরবে শ্রেষ্ঠ
অবনীর মাঝে; (দণ্ডিত স্বল্পায়ু দণ্ডে
যেই নরকুলে!) সম্প্রতি হে সুরপতি!
আগামেমনন গৌরবের পুরস্কার
বন্দিনীরে তার কাড়ি নিয়ে হতমান
করেছে তাহারে। এবে মোর অনুরোধে
যতক্ষণ গর্ব্বোন্মত্ত আচিয়ানগণ*
নাহি করে সমাদর পুনঃ সগৌরবে
ব্যথিত সে বীরবরে দ্বিগুণ সম্মানে,
প্রদানো জয়শ্রী রণে প্রতিপক্ষগণে;
তাহলে হইবে সিদ্ধ বাসনা আমার।"
এতেক কহিয়া যবে নীরবিলা সতী,
উত্তর না দিলা কিছু ঘনদলপতি
যোভদেব। এইরূপে কাটি গেল যবে
বহুক্ষণ, পুনঃ ধীরে থেটিস সুন্দরী
জড়ায়ে চরণযুগ কহিলা কাতরে;—
"হে পিতঃ! এখনি তব নত করি শির
পূর্ণিতে বাসনা মম কর অঙ্গীকার।
নতুবা নির্ভয়ে — এ জগতে হায় দেব
কারে ভয় তব?—কর অস্বীকার তুমি
না পূরাতে নিবেদিত আক্ষেপ আমার।
তা হ'লে বুঝিব সর্ব্বদেবগণমাঝে
হেয় হীনতম কেবা গৌরব সম্মানে"।
শুনিয়া থেটিস-বাণী ব্যথিত অন্তরে
উত্তরিলা মৃদুস্বরে ত্রিদশের পতি—
"সত্য, এ ঘটনা হবে অতি শোচনীয়,
তব আগমনে যদি দারুণ কলহ
বাধে মোর গৃহে হায়! হীরা* দেবী সহ।
কারণ সে সুরেশ্বরী ক্রুদ্ধ হয় যবে,
বিন্ধে হিয়া মোর অতি তীব্র বাক্যবাণে।
সম্প্রতি সে দেবরাণী দেবসভা-মাঝে
নিন্দিছে আমারে বলি ট্রয়-পক্ষপাতী।
অবিলম্বে এবে তুমি ত্রিদিব হইতে
করহ প্রস্থান, বড় ভয় বাসি মনে,
তব আগমনবার্ত্তা পাছে কোনরূপে
জুনোর সদনে দেবি! হয় হে বিদিত।
আর জেনো সুনিশ্চিত দেব-বাণী মম
তব অভিলাষ পূর্ণ হইবে অচিরে।
এস তবে তব প্রাণে আশ্বাস কারণ
হ'তেছি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নত করি শির—
দেবগণমাঝে ইহা 'ক্রনসের' † জেনো
অঙ্গীকৃত পূতবাণী—সুসিদ্ধির চির
সুনিশ্চিত নিদর্শন আছয়ে বিদিত।
একবার যদি আমি নত করি শির
কভু অঙ্গীকার-বদ্ধ হই কোন কাজে,
অন্যথা ঘটে না তার জেনো কোন কালে।"
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেটিস সদনে
এতেক কহিয়া দেব নোয়াইলা শির।

* আচিয়ান—গ্রীকদিগের অপর নাম।

* হীরা—জুনোর অপর নাম।

† ক্রনস ও জিয়াস—যোভদেবের অপর নামদ্বয়।

সুগন্ধি অলকারাশি আয়ত ললাটে
আন্দোলিল থরে থরে, কাঁপিল সঘনে,
সভয়ে সে অভ্রভেদী—অলিম্পি-শিখর।

লজ্জাবতী বসু

মহদ্বাক্য।

(৪৮০ সংখ্যা—১১২ পৃষ্ঠার পর)

২৬। তোমার মুখ হইতে অসন্তোষ ও বিরক্তিব্যঞ্জক বাণী কেন বিনির্গত হইতেছে? যদি তোমার এমন কিছু কষ্ট থাকে যাহা দূর করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে নীরব হইয়া থাকাই যুক্তি-সঙ্গত। আর যদি তাহা দূর করা যায়, তাহা হইলে অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া ধৈর্য্য সহকারে তাহা দূর করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করাই বিজ্ঞোচিত কার্য্য।

২৭। কেমন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইব, মনে মনে তাহার উপায় স্থির করা অতি সহজ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ হইতে বিরত হওয়া অতি কঠিন।

২৮। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল অকপটভাবে ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত হয়, ঈশ্বরের সহবাসে ক্ষেপণ করে, সে কখনও জ্ঞানপূর্ব্বক কোন পাপ করিতে পারে না।

২৯। পাপের তাড়না অনুভব করিলে যদি তাহা দমন করা তোমার সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে পাপদমনার্থ ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা কর। প্রকৃতরূপে মুমুক্ষু যিনি, তিনি দিবারাত্রে শতবার পাপের আকর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্য শতবার ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্মবল প্রার্থনা করেন। শতবারই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত কত দেখা গিয়াছে।

৩০। তুমি খুব কর্ম্মশীল হইতে পার, কিন্তু যাহা কিছু কর, তাহা যদি সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত বলের সহিত সম্পন্ন না কর, তাহা হইলে কর্ম্মের পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারিবে না।

৩১। তুমি যতটুকু কাজ করিতে পার, ততটুকুই সম্পন্ন কর, তাহাতেই তোমার গৌরব। যদি সূর্য্যের ন্যায় আলোক বিতরণ করিতে না পার, খদ্যোতের ন্যায় আলোক দানে লজ্জিত হইও না।

৩২। যদি এ পৃথিবী অন্ধকারময় মনে কর, তবে জানিও যে, এই অন্ধকারময় পৃথিবীর অন্ধকার সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তন্মধ্যে যতটুকু পার আলোক আনয়ন করিবার জন্য ঈশ্বর তোমাকে এখানে রক্ষা করিতেছেন।

৩৩। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শ সর্ব্বদা মনশ্চক্ষু সমক্ষে রাখিবে, কেননা আদর্শ অতি উচ্চ না হইলে জীবন উচ্চ হইতে পারে না। আদর্শ যদি

এককালে বিস্মৃত হও, তাহা হইলে তোমার কার্য্য হীন হইতে হীনতর হইতে থাকিবে।

৩৪। পরের অপকার করিতে যখনই প্রবৃত্ত হই, তখনই প্রকৃত পক্ষে আমার স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়।

৩৫। ঈশ্বরের প্রতি অচল বিশ্বাস এবং সকল অবস্থায় সকলের প্রতি সর্ব্বদা প্রেমের অনুশীলন করিলে আমরা কখন কখন সাংসারিক হিসাবে সুযুক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু উক্ত অনু-শীলনের ফল স্বরূপ হৃদয়ে যে মধুরতার এবং আত্মায় যে পবিত্রতার সঞ্চার হয়, তাহাতে ঐহিক পারত্রিক পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

৩৬। কৃতজ্ঞতা কি? হৃদয়ের স্মৃতি।

৩৭। আশা কি? আনন্দের পুষ্প।

৩৮। অনন্ত কালের লক্ষণ কি? যাহাতে গত কল্য ও আগামী কল্যের অস্তিত্ব নাই, যাহাতে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে পরিণত হইয়াছে।

৩৯। কামনা পত্রময় বৃক্ষের ন্যায়, আশা পুষ্পময় বৃক্ষের অনুরূপ, এবং আত্ম-প্রসাদ ফলপূর্ণ বৃক্ষের তুল্য।

৪০। যে ব্যক্তি ত্যাগস্বীকার করিতে পারে, তাহাকে পরের কৃপার ভিখারী হইতে হয় না।

৪১। কুৎসারূপ শর ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে পারে না; উহা তাঁহার পদতলে ধীরভাবে নিপতিত হয়।

৪২। শারীরিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি সময়ের প্রভাবে ক্ষীণ হইতে থাকে, কিন্তু সদ্‌গুণের সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী।

৪৩। বন্ধুর জন্য জীবন সমর্পণ করা কঠিন নহে; কিন্তু জীবন দান করা যাইতে পারে এরূপ বন্ধু পাওয়াই কঠিন।

৪৪। আমরা যে পরিমাণে আমাদের মনের অভাব বুঝিতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইবে।

৪৫। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে বিজ্ঞ হইবার ইচ্ছা করে, সে অদ্যাপি নিজের অজ্ঞতার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

৪৬। যে অতুলধনশালী কিন্তু জ্ঞানহীন, সে ফলশূন্য সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে।

৪৭। প্রকৃত সাহস পরিণামদর্শিতার সহিত সতত সংযুক্ত থাকে।

৪৮। যেমন অতি কদর্য্য স্থানে বহু-মূল্য মণি পাইলে আমরা তাহা কুড়াইয়া লইয়া থাকি, তেমনি অতি হীন স্থানে সত্য প্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৪৯। প্রকৃতি প্রচুর দান করেন, কিন্তু অল্পই গ্রহণ করেন।

৫০। বীণাবাদনের ন্যায় সুখলাভ শিক্ষা-সাপেক্ষ।

৫১। কেবল নিজের বিষয় ভাবিও না, কেন না জগতে তুমি একমাত্র জীব নহ।

৫২। আনন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল

হইও না, কিন্তু আনন্দিত হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।

৫৩। প্রফুল্লতা ধর্ম্মের প্রাণ। যেমন সূর্য্যকিরণে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, মুকুল ফলে পরিণত হয়, তেমনি প্রফুল্লতার প্রভাবে মানবহৃদয়ের অনেক উচ্চ সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়া উঠে।

৫৪। আমরা এ পৃথিবীতে দুঃখ কষ্টের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু মনকে এরূপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি যে, তাহা সর্ব্বদা দুঃখ কষ্টের উপরে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়।

৫৫। অর্থসম্পদ্ সর্ব্বথা সুখের কারণ নহে; কত ধনী লোকের জীবনে দেখা যায়, ধনের জন্যই তাহারা বিশ্রাম, ধৈর্য্য শান্তি সুখ কখনই অনুভব করিতে পা নাই।

৫৬। প্রেম ও দয়াশূন্য হইয়াও দু পৃথিবীতে শক্তিশালী পুরুষরূপে গ হইতে পার, কিন্তু কখন প্রকৃতরূপে সু হইতে পার না।

৫৭। বাহিরে সুখ নাই, অন্তরে সুখের প্রস্রবণ। এই জন্য খ্রীষ্ট বলিয়াছে "স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে।"

৫৮। অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা যথার্থ বলিয়াছেন, "আশা ধর্ম্মের একটী অঙ্গ নৈরাশ্য হইতে অবনতির উৎপত্তি, অতএব হৃদয় হইতে আশা নির্ব্বাসি করিও না।"

চৈতন্যাষ্টকং।

হে প্রেমসিন্ধোঽখিলজীববন্ধো!
হে পাতকিত্রাণভবাবতার!
ত্বং ভারতে পাবয়িতুং ধরিত্রীং
গৌরাঙ্গ! গাঙ্গৌঘ ইবোদিতোঽভূঃ ॥১॥

পুণ্যা নবদ্বীপধরা ত্বয়াদৌ
সংপ্লাবিতা প্রেমসুধাপ্রবাহৈঃ।
হে লোকশোকাপহ! দর্শিতং যৎ
প্রেম্ণা হরিঃ প্রেমময়ো হি লভ্যঃ ॥২॥

তব প্রসাদাদয়ি দেব! লোকো
মমজ্জ নামামৃত-সিন্ধুপূরে।
ব্যাপ্তা দিশশ্চন্দনমাল্যগন্ধৈঃ
মহোৎসবৈর্মঙ্গলবাদ্যঘোষৈঃ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসিবেশস্য তব প্রসাদাৎ
দদর্শ বৈরাগ্যতরীং জনৌঘঃ।
সদ্যো বিসস্মার চ পাপতাপান্
সুনির্ভরং ভক্তিসুধাং নিপীয় ॥ ৪ ॥

শোকং জহাবুৎপুলকশ্চ লোকঃ
শ্মশানভূর্নন্দনতাং প্রপেদে।
ধরা জরা-মৃত্যু-ভয়-প্রমুক্তা
রেমে সদানন্দপুরীব বিষ্ণোঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো
ন জীবভেদোঽখিলমেকমেব।
ত্বয়েতি গীতা ভবকর্ণধার!
প্রেম্ণো মহাগীতিরনর্ঘ্যনীতিঃ ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভো পূর্ণমহাবতার!
নমামি পাদৌ তব কোটিকৃত্বঃ।
পাপাধমং পাতকিতারণ! ত্বং
পদেঽগতিং মাং তব রক্ষ রক্ষ ॥ ৭॥

কিমপি কিমপি শান্তং পাবনং মোহনং চ
মধুরমধুরমুন্মৎকোটিচন্দ্রপ্রকাশম্।
অমৃতমমৃতবর্ষং দগ্ধজীবদ্রুমস্য
স্ফুরতু হৃদি মদীয়ে দিব্যচৈতন্যরূপম্ ॥৮॥

(অনুবাদ)

জেনেছি হে প্রেমসিন্ধু!
তুমিই জীবের বন্ধু,
পাতকী তরা'তে ভবে তব আগমন;
ধরিয়া গৌরাঙ্গ-নাম
পবিত্রিতে ধরাধাম
উরিলে ভারতে গঙ্গা-প্রবাহ যেমন।১

নবদ্বীপ পুণ্যভূমি
প্রথমে প্লাবিলে তুমি,
অদ্বৈত প্রেমের ধারা প্রবাহিত করি';
হরিলে জীবের শোক,
হেরিল আনন্দে লোক—
প্রেমেরি সাধনে মিলে প্রেমময় হরি।২

হে দেব! প্রসাদে তব
করি' মহামহোৎসব
হরি-নাম-সুধা-রসে ডুবিল ভুবন;
গন্ধ-মাল্য-পরিমল
আবরিল জল-স্থল,
উথলিল মধুময় মঙ্গল-বাদন।৩

সন্ন্যাসীর বেশ ধরি'
দেখা'লে বৈরাগ্য-তরি,
দিলে ভবে ভক্তি-সুধা-সমুদ্র ঢালিয়া;
সে সুধা হৃদয় ভরি'
প্রেমানন্দে পান করি'
গেল সবে পাপ-তাপ সকলি ভুলিয়া।৪

দূরে গেল রোগ শোক,
পুলকে পূরিল লোক,
হইল শ্মশান-ভূমি নন্দন-কানন;
গেল জরা-মৃত্যু-ভয়,
সকলি আনন্দময়,
ভূলোক হইল যেন গোলোক-ভবন।৫

এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
জীবে জীবে নাহি ভেদ,
নাহি উচ্চ, নাহি নীচ, সবি একাকার;
এ অমূল্য মহানীতি—
মহাপ্রেম-মহাগীতি—
গাইলে তুমি হে ভবে ভব-কর্ণধার!৬

পূর্ণ-ব্রহ্ম-অবতার!
কোটি কোটি নমস্কার—
প্রভু হে! চরণে তব করি বারবার;
অধম পাতকী আমি,
অধম-তারণ তুমি,
রেখ রেখ অশরণে চরণে তোমার।৭

মরি কি মোহন কান্তি!
কিবা পবিত্রতা শান্তি!
যেন কোটি অকলঙ্ক চাঁদের উদয়!
পাপে তাপে মৃত যা'রা,
তা'দের অমৃত-ধারা,
পিয় রে! চৈতন্য-রূপ ভরিয়া হৃদয়।৮

ইতি শ্রীতারাকুমার-রচিতং
চৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তম্।

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৬)

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী।

যেমন নদী সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থির-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে, ভোগ সকল যাঁহাকে সেইরূপে আশ্রয় করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন, ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সমুদ্রের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! অগাধ জলে পরিপূর্ণ হইয়া আপনাতে আপনি স্থির রহিয়াছে, আর চারি দিক্ হইতে নদনদী প্রভৃতি জলস্রোত ক্রমাগত আসিয়া তাহার মধ্যে পড়িতেছে। কোনও স্রোত শুষ্ক হইয়া জলদানে বিরত হইতেছে, কোনও স্রোত নূতন প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছে, কিন্তু সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, যেমন তেমনি রহিয়াছে। সমুদ্র পূর্ণ গম্ভীর, কিছুই চাহিতেছে না, কিন্তু নদনদী সকল কত দূর দূরান্তর হইতে যাচিয়া যাচিয়া আসিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছে। সমুদ্রের বিকার নাই, সমুদ্র আপনাতে আপনি স্থির ও অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে, আপনার আনন্দে যেন আপনি চিরকাল নাচিতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্রের জল কত উচ্ছ্সি হইয়া দেশদেশান্তর ভাসাইতেছে, কত বা ও মেঘ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইতে সমুদ্রের তাহাতে ক্ষোভ নাই—হ্র নাই। সমুদ্রের জল কোথায় যাইবে বাষ্প, মেঘ, কুয়াশা, শিল, বরফ প্রভৃ নানা আকার ধরিয়া যেখানে যাউক যেখানে থাকুক, ফিরিয়া ঘুরিয়া আবা সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রে জলও চিরনির্ম্মল, কখনও বিকৃত হয় না সমুদ্র অসীম, পূর্ণ, শান্ত, বিশুদ্ধ সর্ব্বগ্রাসী।

পক্ষান্তরে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় দেখ তাহার ভাব অন্যরূপ। তাহা তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার জল কলস কলস করিয় যত ব্যয় হয়, সে তত ক্ষীণ হইয়া পড়ে গ্রীষ্মাতিশয্যে তাহার সকল জল ফুরাইয় যায়, সে ফুটিফাটা গহ্বরমাত্রসার হইয় থাকে এবং কখন আকাশের বৃষ্টিপা তাহার ক্ষুদ্র আয়তনকে পূর্ণ করিবে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। অনাবৃষ্টিতে তাহার যেমন ক্লেশ, অতিবৃষ্টিতেও সেইরূপ। অতিবৃষ্টিতে খাল বিল মাঠ ঘাটের সহিত সে একাকার হইয়া যায় ও সে জল ধার করিতে পারে না—সে আপনার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আকুল হয়। তাহার জল কখনও পরিষ্কার, কখনও আবিল, কখনও পূতিগন্ধময়। তাহার বক্ষে কখনও কত জলচর ক্রীড়া করে, কখনও কত কুমুদ কহ্লার বিকশিত হইয়া হাস্য করে, কখনও কিছুই দৃষ্ট হয় না। ক্ষুদ্র জলাশয়ের এইরূপ কত বিকার, কত পরিবর্ত্তন, কত অস্থিরতা! তাহার অভাব ও অপূর্ণতা চিরকালই।

মহাসমুদ্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেরূপ প্রভেদ, মহাপ্রাণ নিষ্কাম আত্মতৃপ্ত যোগীতে এবং ক্ষুদ্রপ্রাণ বিষয়কামী সংসারাসক্ত ভোগীতে সেইরূপ প্রভেদ। যোগী সর্ব্বকামনাত্যাগী, এ সংসারে ধন, মান, ভোগবিলাস, প্রভুত্ব কিছুরই স্পৃহা করেন না। রাজ্যসম্পদ্ পদধূলির ন্যায় তুচ্ছ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার কিছুই অভাব নাই এবং সংসারের সুখ সকল অযাচিতভাবে তাঁহার সেবা করিতে আইসে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর সকল তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে," ইহা যোগি-জীবনের কথা। ঋষি ডাইও-জিনিসকে বাধিত করিবার জন্য ভুবন-বিজয়ী সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি প্রার্থনা করেন বলুন, আমি পূর্ণ করিব।" ঋষি সবিনয়ে বলিলেন "মহাশয় যে রৌদ্র পোহাইতেছি, তাহা ঢাকিবেন না,—একটু সরিয়া দাঁড়ান, এইমাত্র প্রার্থনা।" যোগিগণ কেন এত নিষ্কাম-নিঃস্পৃহ অথচ কেন সদা সন্তুষ্ট? তাঁহাদের কাম্যবস্তু একমাত্র ভূমা মহান্ পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহারা পূর্ণকাম। হৃদয়ের মধ্যে যে অমৃতের খনি পায়, সে কি আর মর্ত্ত্য লোকের অসার মলিন ক্ষুদ্র কোনও বস্তুর প্রার্থনা করে? যাহার অন্তর পূর্ণব্রহ্মে পরিপূর্ণ, তার আর কিসের অভাব? সে তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণকাম। যোগী শান্তি-ময়কে হৃদয়ে ধরিয়া শান্ত, অচলশরণের শরণাপন্ন হইয়া অচলপ্রতিষ্ঠ, নির্ব্বিকার অজর অভয় অমৃতের আশ্রয়ে বিকার জরা মৃত্যু ও ভয়শূন্য; 'পরিপূর্ণমানন্দম্'-এর মধ্যে ডুবিয়া আনন্দপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক নিয়ম, যে চায়, সে পায় না; যে না চায়, সেই পায়। যোগী ধন চান না, অথচ তাঁহাকে ধনরত্ন দিবার জন্য কত লোক ব্যস্ত! তিনি যশোমানের প্রার্থনা করেন না; কিন্তু লোকে তাঁহার যশোগানে উন্মত্ত। তিনি জগতের আধিপত্য চান না, কিন্তু সকলের উপরে তাঁর অধিকার। আর তিনি ভোগসুখের কামনা করেন না, কিন্তু তাঁর মত সংসারের সুখ আর কেহ ভোগ করিতে পারে না। যাহা কিছু সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য, সুঘ্রেয়, সুপেয়, সুস্বাদ ও সুস্পর্শ, তাহাতে ভগবানের পবিত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তিনিই বিশেষরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। সর্ব্ব জীবের সুখে তিনি সুখী। কেবল তাহা নহে, সুখে দুঃখে জগতের সকল ঘটনাতে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া সানন্দমনে তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন। এই জন্য সৃষ্টির সকল বস্তু ও সকল ঘটনা ঈশ্বরপ্রেমিকের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। ধন আসিল আর

গেল, পুত্র জন্মিল আর মরিল, পদমর্য্যাদা পাইলেন আর হারাইলেন, সকল অবস্থায় তাঁহার সমভাব। তিনি শান্ত, নির্ব্বিকার ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অন্তরে বাহিরে পরম সুখ সম্ভোগ করেন। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার"—অমৃত-সিন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়া তিনি নিত্যপূর্ণ।

ক্ষুদ্রপ্রাণ বিষয়ী ব্যক্তিই কামকামী—সর্ব্বদা কামনার দাস। সে ধন মান সুখ সম্পদের জন্য কত লালায়িত! সামান্য অর্থের জন্য অতি নীচ বৃত্তি অবলম্বন করে, অথচ অর্থলালসা তৃপ্ত হয় না। সে একটু যশ পাইবার জন্য ছোট বড় সকল লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, শত ব্যক্তি প্রশংসা করিলেও এক ব্যক্তি তাহার দুর্নাম করিলেই তাহার সর্ব্বনাশ। তাহার ভোগস্পৃহা কত? যত ভোগ করে, ততই কামনার বৃদ্ধি, কিছুতেই শান্তি নাই। অস্থায়ী ক্ষুদ্র সংসারের প্রতি তা আসক্তি—পদে পদে ভয়—পদে নৈরাশ্য ও শোক। সংসারের সকল ব মরণশীল—সে প্রিয় বস্তুর বিনাশে যন্ত্রণা ভোগ করে। কামনার উপার্জ্জনে ক্লেশ, রক্ষণে ক্লেশ, বিনা ক্লেশ—তাহাতে শান্তি কোথায়? নি ব্যক্তি যেমন বিশ্বময় শোভা সৌন্দর্য্য সুখের রাজ্য দেখিয়া নিত্য শান্তি ভো করেন, কামী ব্যক্তি সেইরূপ বিশ্ব যন্ত্রণালয় নরক দর্শন করিয়া অবি অশান্তিতে দগ্ধ হয়। সে সর্ব্বদা লো সর্ব্বদা অভাবগ্রস্ত, সর্ব্বদা বিকারগ্র মলিন অস্থির ও অশান্ত। যত দিন আ সুখ-বাসনা, ততদিন এই অশান্তি ও দু বাসনা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে আত্মসমর্প পূর্ব্বক তাঁহাতে নিত্য যুক্ত হই পারিলেই চরম শান্তি ও পরম সুখ।

বিবিধতত্ত্ব-সংগ্রহ।

১। চিলি প্রদেশে বেরো নামক একটী নগর আছে। এই নগরবাসিগণ তাঁহাদিগের নগরটী অবিকল লণ্ডন নগরের অনুরূপ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়। যত সময় এবং যত অর্থেরই প্রয়োজন হউক, তাহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। গত দশ বৎসর কাল ইহাঁরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইতিমধ্যে ঐ নগরের অনেকগুলি রাজপথ লণ্ডন নগরের রাজপথের নামে অভিহিত হইয়া তত্তৎ রাজপথে আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে। বেরো নগরে অনতিদূরে একটী নদী আছে। সে নদীটী কাটিয়া উক্ত নগরের মধ্য দি প্রবাহিত করাইয়া তাহা টেম্‌স না অভিহিত করা হইবে। এই জন্য বহুল টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বেরো-নগর বাসিগণ কয়েক জন সুদক্ষ গৃহনির্ম্মাতাকে লণ্ডন নগরে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহা

ণ্ডনের প্রধান প্রধান অট্টালিকার নক্‌সা তুলিয়া লইয়া আসিলে তদনুরূপ অট্টালিকাসমূহ উক্ত নগরে নির্ম্মিত হইবে।

২। আনাম প্রদেশে প্রথা আছে যে, সম্ভ্রান্তবংশীর পুরুষগণ কখনও নখ কর্ত্তন করেন না। ইহাঁদিগের নখ পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। এত বড় নখ থাকাতে ইহারা হস্ত দ্বারা প্রায় কোন কাজই করিতে পারেন না।

৩। একজাতীয় মৎস্য দেখা যায়, ইহারা নদীতীরে মৃত্তিকার মধ্যে বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা অধিকাংশ সময় বাসায় থাকে। অল্পকাল মাত্র স্থলে বিচরণ করে। সুমাত্রা, বোর্ণিও ও যাবা দ্বীপস্থ লবণাক্ত নদীসমূহে এই জাতীয় মৎস্য দেখা যায়। উক্ত দ্বীপবাসিগণ এই মৎস্যকে 'গৌরমী' বলিয়া থাকে। গৌরমী জাতীয় স্ত্রীমৎস্য স্ব স্ব বাসায় অতি যত্নে ডিম্ব ও ছানা রক্ষা করে। ছানাগুলি বড় না হইলে তাহাদিগকে জলে বিচরণ করিতে দেয় না।

৪। ইটালী দেশে বহুপদবিশিষ্ট এক-জাতীয় ক্ষুদ্র কীট দেখা যায়। ইহারা গুবরে পোকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট। ইহাদিগের স্বভাব এই যে, যে স্থানে ইহারা বিচরণ করে, তথায় ইহাদিগের সম্মুখে কোনও পতঙ্গ বা মূষিকের ন্যায় কোনও ক্ষুদ্রাবয়ব জন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পাইলে ইহারা আপনাদিগের আহারান্বেষণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ মৃতদেহ কবর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন যে, ইহাদিগকে মূষিকের মৃতদেহ কবর দিতে তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন। অনেকগুলি কীট স্ব স্ব সমগ্র বল প্রয়োগপূর্ব্বক মূষিকের দেহ ঠেলিয়া বিশ পঁচিশ হাত দূরে লইয়া গিয়া তথায় গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ঐ দেহ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা মৃত্তিকায় আবৃত করে। যে স্থানের মৃত্তিকা কোমল, তথায় ইহারা গর্ত্ত করে। ইহাদিগের বহুসংখ্যক পদের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, তাহাদেরই সাহায্যে ইহারা মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে।

৫। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় আজকাল ভেকের দুই প্রকার ব্যবহার দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ অনেকে ভেকের মাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকগণ ভেকের শরীরে বিবিধ প্রকার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ভেক পালন করা এক্ষণে তাঁহাদের একটী ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কানাডা প্রদেশের অণ্টেরিও নামক স্থানে এক বৎসরের মধ্যে একজন ভেকপালক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য পাঁচ হাজার এবং খাদ্যের জন্য সাত হাজার ভেক বিক্রয় করিয়াছে।

৬। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এমন একটী স্থান আছে যেখানে সূচ্যগ্রভাগ বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। বিলাতের কোন স্থানে নৃত্যোৎসবে একজন মহিলা নৃত্য করিতে করিতে ভূপতিত হইয়া

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, কবরীস্থ একটী পিনের অগ্রভাগ তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্দেশের সেই স্থানে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

৭। ভীতিকর স্বপ্ন কখন কখন মনোবিকার ও উন্মাদরোগের উৎপত্তি করে। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা রোগে পীড়িতা কোন কোন রমণী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া সেই স্বপ্নের স্মৃতি দূর করিতে সক্ষম হয়েন না। তাঁহাদের মনে সেই স্বপ্নস্মৃতি গভীররূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। ক্রমে তাঁহারা সেই স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সদাই ভয়াকুলচিত্তে তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। মনের এইরূপ বিকার অবস্থা হইতে উন্মাদ রোগের উৎপত্তি হয়। অতএব দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিবে।

৮। একটী ঘোটকের সহিত একটী কুক্কুরের এরূপ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, কুক্কুরটী কুক্কুরদিগের সহবাস এককালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ঘোটকের নিকট থাকিত। ঘোটক কুক্কুরের অনুরাগ দেখিয়া স্বীয় আহার্য্য হইতে প্রত্যহ কিয়দংশ তাহাকে খাইতে দিত। মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুরটী কেবল ছোলা খাইয়া থাকিত। কুক্কুরের প্রভুভক্তি অতি গভীর, কিন্তু এই কুক্কুরটীর ঘোটকভক্তির উদয়ে তাহার প্রভুভক্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৯। পক্ষিগণ আকাশে কতদূর উচ্চে উড্ডীয়মান হইতে ভাল বা তৎসম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে বিবিধজাতীয় পক্ষী লইয়া একটী ব্যোম নয় হাজার ফুট উপরে উত্থিত হই সেখান হইতে পক্ষিগুলিকে ছাড়ি দেওয়া হইল; দেখা গেল পারাবত প সেখান হইতে দ্রুতবেগে নীচে নামি লাগিল, এবং যখন ভূমি হইতে এ হাজার ফিটের উপরে রহিল, তখন তা ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। পারা অধিক উচ্চে উড়িতে ভাল বাসে ন কিন্তু ঈগল পক্ষী যত উচ্চে উঠে, তত যেন তাহার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। ঈগ পক্ষীকে নয় হাজার ফিট্ উচ্চে সর্ব্বদা উড়িতে দেখা যায়। ব্যোমযান-আরোহি গণ কাকপক্ষীকে চারি হাজার দুই শ ফিট উচ্চে উড়িতে দেখিয়াছেন। চাত পক্ষীকে এক হাজার ফিটের উচ্চে এ উড়িতে দেখা যায় না।

১০। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে এক মহিলা আছেন; তাঁহার মস্তকের কে চারি হাত লম্বা; তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত মাত্র; অতএব তাঁহা কেশ তাঁহার শরীর অপেক্ষা অর্দ্ধ হা অধিক লম্বা। ইহাঁর এক কন্যা আছে তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর, তাঁহার কেশ এখনই প্রায় তিন হা লম্বা হইয়াছে।

১১। ডাক্তার ফরেল্ আমেরিকার একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি বলেন, বহু অনুসন্ধানের পর, তাঁহার

ধারণা হইয়াছে যে, কীট পতঙ্গদিগের মন আছে, কেননা তিনি তাহাদের নির্ব্বাচন ও বিবেচনা-শক্তির স্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। কোন কোন পতঙ্গের আশ্চর্য্য স্মরণশক্তিরও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

১২। মধ্য আসিয়ায় একজাতীয় মৎস্য দেখা যায়, তাহারা নদী বা পুষ্করিণীর তীরস্থ বৃক্ষের উপর অবলীলাক্রমে আরোহণ করিতে পারে। এই মৎস্যের শারীরিক গঠনে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়।

১৩। সচরাচর মক্ষিকা এক সেকেণ্ডে আট-হাত-পরিমিত স্থান উড়িয়া যাইতে পারে। অতি দ্রুতবেগে উড়িবার সময় মক্ষিকা এক সেকেণ্ডে ৫৬ হাত পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। ঘোড়-দৌড়ের তীব্রগামী ঘোটকের গতিও ইহা অপেক্ষা কম।

১৪। বেলজিয়ম্ প্রদেশে সারলিরয় নামক একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের একজন একদা সংকল্প করিলেন যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট চারাগাছ যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তিনি তাহার ডালপালা-গুলি এরূপভাবে সংস্থাপিত করিবেন, যেন ক্রমে উহা একটী অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দশ বৎসর যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তিনি একটী হথরন্ বৃক্ষকে অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষের আকারবিশিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শত শত লোক এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিবার জন্য উক্ত মালীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে ঐ বৃক্ষটীকে "জেনেরল হথরন্" নামে অভিহিত করিয়াছে।

১৫। ভূগোল বিবরণে এটনা নামক আগ্নেয়গিরির যে উচ্চতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সম্প্রতি অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে তাহা ঠিক্ নহে। ইহার উচ্চতা ১০ হাজার ৭ শত ৫৮ ফিট। ভূগোলে ইহার অপেক্ষা অধিক উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৬। ডেনিয়েল্ ওয়েবেষ্টার আমেরিকার একজন মহাপুরুষ। যখন তিনি যুক্ত-রাজ্যের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন একজন ধনী ব্যক্তির বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। আহারাদির পর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ ওয়েবেষ্টারের সহিত জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। উহাঁদিগের মধ্যে একজন ওয়েবে-ষ্টারকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার মনে কত চিন্তার উদয় হয়, কত বিষয় লইয়া আপনার মন ব্যস্ত থাকে, কিন্তু কোন্ চিন্তাটী আপনি গুরুতর মনে করেন, আমাদিগের জানিতে কৌতূহল হইতেছে।" ওয়েবেষ্টার পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি এমন কেহ আছেন যিনি আমার অপরিচিত?" উত্তর পাইলেন, "না, এখানে উপস্থিত সকলেই আপনার বন্ধু।" তখন ওয়েবেষ্টার্ বলিলেন, "ঈশ্বরের নিকট আমার নিজের যে দায়িত্ব বোধ, তাহাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তা।" তৎপরে প্রায় বিশ মিনিট্ কাল ঐ বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

১৭। গড়পড়তায় ইংলণ্ডবাসীদিগের আয়ু বিগত তিন শত বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড-বাসীর পরমায়ু গড়ে ১৬ বৎসর ছিল। এক্ষণে উহা ৩২ হইয়াছে।

১৮। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে পারিস নগরীর পশুশালায় একটী অজাগর সর্প আনীত হইয়া রক্ষিত হয়। উহাকে পশুশালার ক্ষুদ্র বদ্ধ আগারে প্রবিষ্ট করাইবার পর হইতেই উহা আহার পরিত্যাগ করে। উহার আগারে রক্ষকগণ উহার উপযোগী বিবিধ প্রকার আহারীয় দ্রব্য রাখিয়া দিতেন, উহা তাহার কিছুই ভক্ষণ করিত না। মেষ, ছাগ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি তাহার বাস-স্থানে রক্ষিত হইত, কিন্তু সর্পটী ঐ গুলির কিছুই স্পর্শ করিত না। ক্রমে উহার শরীর কৃশ হইতে কৃশতর হইয়া যাইতে লাগিল, গাত্রের বর্ণ প্রায় শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল। যখন উহাকে আনয়ন করা হয়, তখনও উহা ওজনে দুই মণ ছিল, ক্রমে উহার ওজন ত্রিশ সের মাত্র হইল। পরে দুই বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন কাল অনাহারে থাকিয়া উহা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সর্পটি দৈর্ঘ্যে তের হাত ছিল। সর্প যে অনেক দিন অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা এই অজাগর সর্পের বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। সর্প-তত্ত্ববিৎ একজন পণ্ডিত বলেন যে, এই অজাগর সর্প সম্ভবতঃ উহার স্বাভাবিক স্বাধীন জীবনভ্রষ্ট হইয়া আন্তরিক যাতনা ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা হেতু আহার ত্যাগ করিয়াছিল।

১৯। ইংলণ্ডের উপকূলে যে সকল ধীবর মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে, তাহাদিগের অনেকে মধ্যে মধ্যে জালের ভিতর মূল্য-বান্ দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসরে প্রাপ্ত এই প্রকার দ্রব্যসমষ্টির মূল্য প্রায় একলক্ষ টাকা হয়।

২০। সম্রাট্ এডওয়ার্ডের স্যাণ্ডরিং-হাম প্রাসাদের পার্শ্বে তাঁহার নিজের একটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। উদ্যানটী নয় শত বিঘা জমির উপর সংস্থিত। ইহার মধ্যে ৭৫ বিঘা জমির উপর শাক সবজী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলের উদ্যানে পৃথিবীর নানা স্থানের বিবিধ ফল উৎপন্ন করা হয়। পুষ্পোদ্যানে বিবিধজাতীয় গোলাপের শোভা বর্ণনাতীত। এখানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সুন্দর সুন্দর পুষ্পরাজিও উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

২১। ইয়োরোপখণ্ডে যেমন সর্ব্ব-প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সভা আছে, তেমনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি পারিস নগরে একটী অসাধারণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; তথায় ইংরাজদিগের আদব কায়দা ও রীতি নীতি শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইয়োরোপের নগরে নগরে বহুসংখ্যক হোটেল আছে। ঐ সকল হোটেলে নানা দেশ হইতে লোক আসিয়া আহার গ্রহণ করে। ইহাদিগের সহিত

কথা কহিবার জন্য হোটেলের ভৃত্যগণের ইয়োরোপের অনেকগুলি ভাষায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। হোটেলের ভৃত্যগণের শিক্ষার জন্য ইয়োরোপের প্রধান প্রধান নগরে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের ডার্টফোর্ড হিথ্ নামক নগরে বালিকাগণকে সর্ব্ব-প্রকার ক্রীড়া শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একটী বিদ্যালয় উন্মুক্ত হইয়াছে।

২২। গত শত বৎসরে ভারতে ত্রিশটীর অধিক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আশ্চর্য্য যে প্রায় প্রত্যেক দুর্ভিক্ষ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ। গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইহা প্রায় ভারতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং কোটি কোটি মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া দেশের সমূহ অনিষ্ট ও দুরবস্থা সংঘটিত করিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন দুঃসময়েও আয় ব্যয়ের হিসাবে (৪৬৭-২০০০ ১৯০১-২) শত কোটি টাকারও অধিক লাভ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারত-বর্ষ স্বর্ণপ্রসূ যথার্থ। আগামী বর্ষে নাকি ১৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

২৩। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইহা খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা, কঙ্কণ ভাষায় বিরচিত, কিন্তু রোমান অর্থাৎ ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৪। অপূর্ব্ব পদ্ধতি। নরওয়ে ও সুইডেনে বর মনোনীত কন্যাকে একখানি প্রার্থনা পুস্তক ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে একটি রাজ-হংসী দিতেই হইবে। কন্যা প্রতিদানস্বরূপ একটি (সার্ট) জামা উপহার দেন। এই জামা বরকে বিবাহের দিন পরিতে হয়। কিন্তু তাহার পর আর ব্যবহার করিতে নাই। আজীবন যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও জীবদ্দশায় তাহা আর ব্যবহার করিতে নাই। কেবল মৃত্যু হইলে সেই জামা পরাইয়া বরবেশে পুরুষকে কবরসাৎ করিতে হয়।

সুভদ্রা।*

(রৈবতকে)

(১)

তাপদগ্ধ ধরা-মাঝে তুমি পুণ্যবতি!
অবিরল প্রবাহিত পূত-মন্দাকিনী;
নাহি দিন, নাহি রাতি, অবিরামগতি,
সুস্নিগ্ধ করিছে ধরা মৃদু কল্লোলিনী।
যথা বহি যায় তথা বিকশিয়া উঠে

* সুবিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের প্রণীত "রৈবতক কাব্য" পাঠে মহীয়সী সুভদ্রার চরিত্র বিষয়ে লেখিকার মনে যে সকল ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই এই সুন্দর কবিতাহারে গ্রথিত। বা, বো, স।

নবীন পল্লবে পূর্ণ পাদপনিচয়,
শোক দুঃখ অবসাদ মোহবন্ধ টুটে,
মরুভূমি হ'য়ে যায় শ্যাম শোভাময়।
সুজলা, সুফলা ধরা আনন্দে পূরিত,
ও চরণ পরশনে হয় আচম্বিত।

(২)

প্রকৃতির উপাসিকা নিরখি প্রথম ;
ভ্রমিতে আপন মনে কাননবিতানে,
তুলিতে লতিকা-দেহ স্নেহে নিরুপম,
ঢালিতে সলিলধারা লতিকার প্রাণে।
সায়াহ্ন কাকলি শুনি আত্ম-হারা সুখে
বসিয়া বিটপি-তলে শীতল ছায়ায়,
স্নেহভরা মুখে, তার স্নেহভরা বুকে
বাসন্তী জ্যোৎস্না সম স্নেহ খেলি যায় ;
স্নেহভরা সে করুণ আঁখি কি সুন্দর,
শরৎ-পূর্ণিমা শশী হ'তে মনোহর !

(৩)

একদা দেখিনু ঘোর রৈবতক-শিরে
প্রকৃতির উপাসিকা সুস্থিরা বিজলী
ফেলিয়া কেশব পার্থ বিস্ময়ের নীরে
একাকিনী আছে বসি কানন উজলি !
উন্মত্ত ঝটিকা ক্ষুব্ধ আলোড়িছে বন,
আলোড়িছে রৈবতক-শৃঙ্গ সুবিশাল ;
সৌদামিনী খেলে লয়ে কৃষ্ণ মেঘ ঘন ;
কহে হাসি কেশবের স্নেহের মৃণাল
দশমবর্ষীয়া ভদ্রা—ঊর্দ্ধ দুনয়ন—
"অনলভুজঙ্গ দাদা ! খেলিছে কেমন ?"

(৪)

আদরে ভরিল বুক, উচ্ছ্বসিত মন,
তায় পর হেরি, ভদ্রা পবিত্র আশ্রমে
জীবন্ত-করুণা-মূর্ত্তি করে বিচরণ ;
অনাথ-অনাথাগণে আদর সম্ভ্রমে
দেখিতেছে বিধিমত মাতৃপিতৃহীনা,
নিরাশ্রয়া বালিকারে সাজা'ছে সুন্দর,
দরিদ্র আতুর জনে হয়ে অঙ্গে লীনা
বসন ভূষণে দুঃখ করিছে অন্তর।
"কেমন সুন্দর বস্ত্র,, কহে বালা এক,—
"বলয় সুভদ্রা মাতা দিয়াছেন দেখ।"

(৫)

আশ্রমে যাইলে বালা ফিরিয়া আসিবে
এরূপে সর্ব্বাঙ্গ করি আভরণহীন ;
অযাচিত দয়া বহে যথায় যাইবে,
এত বরিষণ, কিন্তু নহে ধারা ক্ষীণ।
জিজ্ঞাস, সতত দুটী প্রশান্ত উজ্জ্বল
নয়ন রহিবে চাহি—কি যে উদাসীন—
অচল তোমার পানে। সঙ্গীত তরল
কখন তুলিলা ভদ্রা ধরি করে বীণ ;
নীরব হইল বীণা। পলকবিহীন,
আত্মহারা চাহি ভদ্রা—দৃষ্টি উদাসীন।

(৬)

তার পরে, মনে পড়ে সখী সুলোচনা
ধরিয়া ভদ্রারে নিলা সত্যভামা পাশে ;
বাঁধা দুই কর, রক্ত পদ্ম অতুলনা,
সঁপিলা চোরাই চিত্র রাণীর সকাশে।
সেই মুখ শতদল ব্রীড়া-নত রহে,
কি অরুণ আভামণি হইল রঞ্জিত ;
নিরখি ভূতলপানে ধীরে ধীরে কহে—
"ছবিটি দাওনা দিদি"—অমৃত ক্ষরিত।
করুণার উৎস শুধু নহে ভদ্রা রাণী,
লাজময়ী, সুধাময়ী কিবা ছবিখানি।

(৭)

তার পর, পড়ে মনে কুঞ্জ মনোরম,

অধিষ্ঠাত্রী ভদ্রা দেবী বসিয়া যথায় ;
"কেন লুকাইয়া রাখি"—চিন্তা-নিমগন,
"লুকাইয়া দেখি কেন চাহে পুনরায়।"
বন্ধন খুলিয়া যবে চাহে আর বার
ওই পাণি-প্রসূনের সুখ-পরশন,
আনন্দ-বিহ্বল পার্থ ;—সরিয়া আবার,
অধোমুখী, পৃথ্বীমাঝে চাহে নিমজ্জন।
করুণার উৎস শুধু নহে ভদ্রা রাণী,
প্রেমময়ী, লাজময়ী কিবা ছবিখানি।

(৮)

তারপর, কিবা স্বর্গ খুলিল নয়নে,
জ্ঞানের আলোকোচ্ছ্বাস পড়িল সম্মুখে,
আঁধার-নিমগ্ন আঁখি আলো দরশনে
সহসা পূর্ণিত হল অজানিত সুখে।
সংসারনিদাঘ-তপ্ত মানবের মনে
শান্তির বরষাধারা পড়িল নামিয়া ;
প্রখর আতপপরে সন্ধ্যা আগমনে
কি শান্তিজ্যোছনা-ধারা উঠিল ভাসিয়া !
প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী, সুভদ্রা সুন্দরী !
বরিষ অজস্র ধারা দিবা বিভাবরী।

(৯)

সাধিতে কুমারীব্রত যত বালাগণ
পুষ্পবনে পুষ্পমত ছড়াইয়া পড়ে।
সকলে প্রফুল্লমুখী ; ভদ্রা নিরজন
বিষাদে বসিয়া বালা, নেত্রে ধারা ঝরে।
শুকের শাবক এক শোভিতেছে বুকে ;
ঢালিলা মুখেতে জল, ছল ছল আঁখি,
করুণার পরশনে উন্মীলিল সুখে,
আবেশে কোমল অঙ্কে ক্ষুদ্রদেহ পাখী।
গালি পাড়ি সুলোচনা কহিছে তখন,
"কুমারীর ব্রত একি !" আনন্দিত মন।

(১০)

তারপর এ অধম বর্ণিবে কেমনে
সেই ভাবময়ী ভাষা জ্ঞানের চরম !
হে পাঠিকা, খুলি গ্রন্থ বসি নিরজনে
পিও কাব্য-সুধা ত্রিদিবের সুধা সম।
প্রেমের মহিমাগান, এক মহাপ্রাণ,
নারীর পিপাসা, আর বিবাহের কথা ;
বিস্তার তাহার ক্রমে জগতপ্রমাণ।
বুঝা'য়ে দিয়াছ কিবা জ্যোৎস্নার লতা !
তোমার মুখের কথা কি মিষ্ট শীতল,
সুধাধারা সুধাকরে স্নিগ্ধ নিরমল।

(১১)

তারপর মনে পড়ে বসি একাকিনী
ফুটন্ত অশোকা সেই অশোক-কাননে ;
নীরব, প্রশান্ত মুখে ফুল্ল কমলিনী,
একটি চিন্তার রেখা পড়েনি আননে।
অর্জ্জুন, বিস্ময়ে মগ্ন—বিহ্বল অর্জ্জুন—
"অসুরতা—তবে ভদ্রা নহে কি আমার"
ভাবিলেন মনে।—"তবে এ পুণ্য কুসুম
ধরিতে নারিব কভু হৃদয়মাঝার ?"
নহে এ পার্থিব প্রেম-আবেগ চঞ্চল,
এ প্রেম, স্বর্গীয় প্রেম—স্থির নিরমল।

(১২)

তারপর, পুণ্যদৃশ্য নয়নাভিরাম,
দেখেছ কি কেহ কোথা' ? কখনও এমন !
ধন্য কবি ! ধন্য তব প্রতিভা সুঠাম,
যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় প্রাণ মন।
পুনঃ বলি চিত্রকর, ধন্য সৃষ্টি তব,
ধন্য তব চিত্রপটে বর্ণসমাবেশ,
ধন্য তব নানা রাগ, নিত্য অভিনব,
ধন্য তব তার মাঝে মত্ততা আবেশ।

সুভদ্রার চুরি করা চিত্রের ভিতরে,
বর্ণে বর্ণে নিগূঢ় প্রেমের সুধা ক্ষরে।

(১৩)

যখন ফল্গুণী ধীরে অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
হরিবে সুভদ্রা নিধি করিলা প্রকাশ,
শুনিয়া ভাসিলা ভদ্রা দুঃখের সাগরে।
বাজে যে কোমল প্রাণে শুনি দীর্ঘশ্বাস
—সে কোমল পরাণীটি নৃমুণ্ডমালিনী
কেমনে হইবে বল নিরদয়-মন ?
নারায়ণে নির্ভরিলা করুণারূপিণী,
নারায়ণ সুখস্বপ্নে হ'ল নিমগন।
অর্জ্জুন হৃদয়-হারা হইল সম্মত,
একটিও প্রাণী রণে হইবে না হত।

(১৪)

আবার সে স্বর্গদৃশ্য ! উদ্বেল উচ্ছ্বাসে
নীরবেতে ঊর্দ্ধপানে নীলাঞ্জনয়নে
চাহিয়া কহিলা ধীরে, প্রেমানন্দ-ভাষে,
প্রশান্ত ত্রিদিব-বাদ্য বাজিল ভুবনে
'ও মঙ্গল নীতিপথে হ'য়ে থাকে কভু
কণ্টক সুভদ্রা তব যদি বা কখন,
নারায়ণ ! প্রেমময় ! ক্ষমা কর প্রভু !
—তোমার মঙ্গল নীতি হউক পূরণ !
হের ওই নীলাকাশে দীপ্ত নারায়ণ,
চরণে বিলীন করি যুগল জীবন !"

(১৫)

করি দুই যোড় কর অর্জ্জুন সুভদ্রা,
জানু পাতি বসি ভদ্রা প্রীতি-প্রস্রবণ ;
কি যেন প্রীতির ধারা মদালস তন্দ্রা
তরলিত, বহি পড়ে তিতিয়া বসন।
বারিধারা দাবানলে পড়িলে যেমন,
করুণাময়ীর কথা করিল নিষ্কাম
কামনা অনলে দীপ্ত হৃদয় তেমন
অর্জ্জুনের, ধীরে পার্থ চাহিলা নির্ব্বাণ
—'ভগবান, কর পূর্ণ তব মনস্কাম,
লভিব নির্ব্বাণ—জগতের মোক্ষধাম।

(১৬)

কি দৃশ্য হৃদয়দ্রবী অতুল জগতে
'ভগবান কর পূর্ণ তব মনস্কাম'—
কি গভীর নির্ভরতা অতুল মরতে,
প্রণয়িযুগলে কিবা আত্ম-বলিদান।
নিষ্কাম অনলে দেয় সকাম প্রণয়,
কি গভীর প্রেমতত্ত্ব,—বাসনা অগ্নি
কষিত কাঞ্চন মত করিল হৃদয়,
দূরে গেল কামনার যত গন্ধ পূতি।
ধন্য দেবী সুভদ্রা গো নিষ্কাম-মূরতি,
অর্জ্জুনের গুরু—মাতা, পদে করি নতি

(১৭)

তারপর, মিলনের সে অনন্তোচ্ছ্বাসে
কহিলা সুভদ্রা দেবী কি কথা গভীর
হরষ হিল্লোল নাই, মুক্তামালা ভাসে
দুই স্রোতে কপোলেতে ;—সুদীন
কহিলা,—আমরা বল্লরী সে জগতের
—যে জগত মহাবৃক্ষ-পদ-সমাশ্রিত ;
তোমাদের তরে আমি, মোর মিলনের
নাহি অন্ত, নাহি শেষ ; সদা সম্মিলি
সেই বৃক্ষপদমূলে গাঁথা সব প্রাণ,
সে প্রেম, অনন্ত প্রেম, নাহি তার আ

(১৮)

পাইলাম বীরত্বের কিবা পরিচয়,
সুভদ্রা, বীরের বালা, নিজে বীরাঙ্গনা
সুভদ্রা-হরণ-কালে কি সুখ উদয়
হইল, খুলিল নেত্রে শোভা অতুলনা

আলুলিতা মুক্তকেশী রক্ষিছে অর্জ্জুনে
ধরি করে ধনু-চাপ বিজলি উজলা,
কাটিছে সাত্যকি-শর বসাইয়া গুণে
অনল ভুজঙ্গ শর-পূর্ণ নানা ছলা।
বীরবালা ভদ্রা, রমণীর শিরোমণি,
বীরজায়া ভদ্রা, নিজে পূর্ণ বীর্য্যখনি।

শ্রীমতী অপরাজিতা দাসী।

তিব্বত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিব্বত পর্ব্বতময় প্রদেশ, সুতরাং তথায় কর্ষণোপযোগী ভূমি অতি অল্পই আছে। শস্যক্ষেত্র কেবল উপত্যকা-সমূহেই দেখা যায়। প্রধানতঃ গোধূম যব ও ধান্য এই তিন প্রকার শস্যের চাষ হইয়া থাকে। ধান্য অপেক্ষা গোধূম তিব্বতবাসিগণের নিকট অধিক আদরণীয়, কিন্তু যবই ইহাদিগের প্রধান শস্য। যবান্নই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য।

সুপক্ব শস্য কর্ত্তন করিবার সময় তিব্বৎবাসিগণ উৎসব করে। উৎসবটি হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত নবান্ন উৎসবের অনুরূপ। নূতন শস্য প্রথমে গৃহদেবতাকে উৎসর্গীকৃত হয়, তৎপরে গৃহের স্তম্ভ-সমূহের চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত করিয়া দেওয়া হয়। শস্য কাটিবার সময় কৃষকগণ গান করে, "আগামী বৎসরে যেন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়, হে দেবতা, আমরা দরিদ্রকে শস্য দান করিব, লামাদিগকে শস্য উপঢৌকন দিব।" গৃহে শস্য সঞ্চিত হইলে, যে দিন নূতন শস্য প্রথম ব্যবহার করা হয়, সে দিন তিব্বতীয় গৃহস্থ আত্মীয়, পরিজন ও অনুচরগণকে নিমন্ত্রণ করে। এই উৎসবের সময় এক-জন লামা উপস্থিত থাকেন এবং উৎসবে যে ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই লামাই সম্পাদন করেন। হিন্দুগণের ন্যায় তিব্বতীয়গণ শুভ ও অশুভ ক্ষণ বা লগ্নের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং যে কোন উৎসব বা লৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহার জন্য শুভ কাল স্থির করিবার নিমিত্ত লামাদিগের সাহায্য লয়েন।

পশুপালন দ্বারা বহুসংখ্যক তিব্বতীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেকে ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, ও বৃষ বাণিজ্য-দ্রব্য বহন জন্য রক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নগরসমূহে বণিক্, শ্রমজীবী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী অনেক দেখা যায়। কোন কোন তিব্বতীয় বাণিজ্যার্থে চীন ও ভারতবর্ষে গমনাগমন করে।

অদ্ভুত বিবাহপ্রথার জন্য তিব্বত

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তিব্বতে বহু পুরুষের সহিত এক স্ত্রীর বিবাহ-প্রথা প্রচলিত। এই প্রথা পুরাকালে পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। কোন প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসলেখক বলেন যে, ইংলণ্ডে ঐ প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তিব্বত ব্যতীত সিংহল দ্বীপে ঐ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দ্বীপে এই প্রথার প্রতি লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে ইহা তথা হইতে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু তিব্বত-বাসিগণের মধ্যে এই প্রথার কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, তিব্বতে পূর্ব্বে এক-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ঐ প্রথার ফল স্বরূপ লোকসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, তিব্বতের ন্যায় অনুর্ব্বর ও স্বল্পশস্যোৎপাদক স্থানে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্য স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়। এই প্রথা প্রচলনের পর তিব্বতের লোকসংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয় নাই। সচরাচর একটি বালিকার সহিত এক পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা-গুলিরই বিবাহ হয়। যাহার ভ্রাতা নাই, সে অন্য সমবয়স্ক আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করে। সন্তানসন্ততিগণ পিতৃগণকে "বড় বাবা", "মেজ বাবা", "ছোট বাবা" ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে। এই বিবা[illegible] প্রথার প্রতি তিব্বতীয় স্ত্রীলোকদিগে[illegible] বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তাহা[illegible] বলে, "এরূপ বিবাহে আমাদের সুবিধ[illegible] তিন চারিজন স্বামীর অনুরাগ ও সাহা[illegible] পাওয়া প্রার্থনীয়। একটী স্বামী থাকিলে[illegible] বিধবা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে[illegible] কিন্তু তিন চারি জন স্বামী থাকিলে আম[illegible] প্রায়ই বিধবা হই না।" তিব্বতে বিধ[illegible] হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভা[illegible] বলিয়া বিবেচিত হয়। তথায় যেমন বাল[illegible] বিবাহ প্রচলিত আছে, তেমনি ভারত[illegible] বর্ষের প্রাচীন সদাচার-বিবাহের প[illegible] কন্যার পিতৃগৃহে বাস এবং দ্বিরাগমন[illegible] প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে বরপ[illegible] কন্যাকে দর্শন করিবার জন্য কন্যার বাটীতে[illegible] উপস্থিত হয় এবং কন্যা দর্শনের প[illegible] মনোনীত হইলে তাহাকে উপহার প্রদান[illegible] করে। এইরূপ উপহার প্রদানই সম্মতি[illegible] চিহ্ন। স্ত্রীলোকের বহু-স্বামি-গ্রহণ-প্রথ[illegible] প্রচলিত থাকাতে, তিব্বতে অনেক[illegible] স্ত্রীলোকের বিবাহ হয় না। অবিবাহিত[illegible] স্ত্রীলোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থ স্থানে[illegible] স্থানে কুমারী-সদন নামক বহু প্রকাণ্ড[illegible] প্রকাণ্ড গৃহ আছে। এই সকল কুমারী[illegible] তিব্বতীয় ভাষা লিখিতে পড়িতে শিক্ষা[illegible] করে এবং শিক্ষিতা হইলে তিব্বতীয় ধর্ম্ম[illegible] পুস্তকগুলির প্রতিলিপি করে। তাহা[illegible] দিগের হস্তলিখিত প্রতিলিপি বাজারে[illegible] বিক্রীত হয় এবং সাধারণ শিক্ষিত লোকে[illegible] তাহা ক্রয় করে। এতদ্ব্যতীত কুমারী[illegible]

[illegible]সদনের চতুষ্পার্শ্বে অনেক কর্ষণোপযোগী উর্ব্বর ভূমি রক্ষিত হয়; কুমারীগণ তাহা চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে।

তিব্বতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে বিবিধ প্রথা প্রচলিত আছে। একটি প্রথানুসারে মৃত্যুর পর কয়েক দিবস মৃতদেহ গৃহে রক্ষিত হয়। শয্যার সহিত তৎপরে মৃতদেহটি রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হয়। তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস যে, এইরূপে বন্ধন না করিলে মৃতদেহ উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। তিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ এইরূপে রক্ষিত হয়। শব যাহাতে বিকৃত না হয়, তজ্জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। তৎপরে পুরোহিত মৃতদেহের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে তিব্বতীয় পদ্ধতি পাঠ করেন। তিব্বতে সাধারণ লোকের মধ্যে কুক্কুর দ্বারা শব ভক্ষণ করাইবার রীতিও প্রচলিত আছে। তিব্বতের প্রত্যেক গ্রাম ও নগরে এই অদ্ভুত উপায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট মঠ আছে; কোন কোন স্থানে এই অনুষ্ঠান জন্য দুর্গবৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মমঠে বহুসংখ্যক কুক্কুর প্রতিপালিত হয়; ধর্ম্মমঠে প্রতিপালিত হওয়াতে এই সকল কুক্কুরের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস। কেবল ধনী তিব্বতবাসিগণের মৃতদেহ ভক্ষণ করাইবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুগণ শব খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরদিগকে খাইতে দেয়। কোন কোন তিব্বতবাসী কুক্কুর দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষিত করাইবার প্রথা কদর্য্য প্রথা জ্ঞান করিয়া নদ নদীর স্রোতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিয়া থাকে। আবার কোন কোন তিব্বতবাসী পর্ব্বতের উপর মৃতদেহ রাখিয়া আইসে, তথায় পশুপক্ষী কর্ত্তৃক উহা ভক্ষিত হয়। প্রিয় জনের মৃতদেহ পশুপক্ষী ভক্ষণ করিতেছে, এ দৃশ্য তাহারা কখনও দেখিতে চাহে না। তিব্বতে শব-দাহ-প্রথাও প্রচলিত আছে। পুরোহিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মৃতদেহ প্রায়ই দাহ করা হইয়া থাকে। পুরোহিতের শবদাহে তাহার উত্তরাধিকারী পুরোহিতের একমাত্র অধিকার—চিতায় অগ্নি-সংযোগে আর কাহারও অধিকার নাই। চিতার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হয়। পুরোহিতের শবদাহসময়ে নানাপ্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যতক্ষণ শবদাহ হয়, ততক্ষণ কতকগুলি লোক বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে, এবং পুরোহিতগণ সমস্বরে ধর্ম্মবচন আবৃত্তি করিতে থাকে। শ্রেষ্ঠ পুরোহিত-দিগের দেহের ভস্মাবশেষ ধাতুপাত্রে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের কোন কোন অংশে প্রথা আছে যে, মৃত ব্যক্তির বাটীর ছাদের উপর সপ্তাহ কাল একজন লামা উপবিষ্ট থাকিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করিবে। সপ্তম দিনে মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব ও কতকগুলি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তিব্বতে বহু পুরুষের সহিত এক স্ত্রীর বিবাহ-প্রথা প্রচলিত। এই প্রথা পুরাকালে পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। কোন প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসলেখক বলেন যে, ইংলণ্ডে ঐ প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তিব্বত ব্যতীত সিংহল দ্বীপে ঐ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দ্বীপে এই প্রথার প্রতি লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে ইহা তথা হইতে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু তিব্বতবাসিগণের মধ্যে এই প্রথার কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, তিব্বতে পূর্ব্বে এক-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ঐ প্রথার ফল স্বরূপ লোকসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, তিব্বতের ন্যায় অনুর্ব্বর ও স্বল্পশস্যোৎপাদক স্থানে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্য স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়। এই প্রথা প্রচলনের পর তিব্বতের লোকসংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয় নাই। সচরাচর একটি বালিকার সহিত এক পরিবারস্থ সকল ভ্রাতাগুলিরই বিবাহ হয়। যাহার ভ্রাতা নাই, সে অন্য সমবয়স্ক আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করে। সন্তানসন্ততিগণ পিতৃগণকে "বড় বাবা", "মেজ বাবা", "ছোট বাবা" ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে। এই বিবাহ-প্রথার প্রতি তিব্বতীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তাহারা বলে, "এরূপ বিবাহে আমাদের সুবিধা, তিন চারিজন স্বামীর অনুরাগ ও সাহায্য পাওয়া প্রার্থনীয়। একটী স্বামী থাকিলে বিধবা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তিন চারি জন স্বামী থাকিলে আমরা প্রায়ই বিধবা হই না।" তিব্বতে বিধবা হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তথায় যেমন বালক-বিবাহ প্রচলিত আছে, তেমনি ভারতবর্ষের প্রাচীন সদাচার-বিবাহের ন্যায় কন্যার পিতৃগৃহে বাস এবং দ্বিরাগমনও প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে বরগণ কন্যাকে দর্শন করিবার জন্য কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয় এবং কন্যা দর্শনের পর মনোনীত হইলে তাহাকে উপহার প্রদান করে। এইরূপ উপহার প্রদানই সম্মতির চিহ্ন। স্ত্রীলোকের বহু-স্বামি-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তিব্বতে অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ হয় না। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থ স্থানে স্থানে কুমারী-সদন নামক বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ আছে। এই সকল কুমারী তিব্বতীয় ভাষা লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করে এবং শিক্ষিতা হইলে তিব্বতীয় ধর্ম্মপুস্তকগুলির প্রতিলিপি করে। তাহাদিগের হস্তলিখিত প্রতিলিপি বাজারে বিক্রীত হয় এবং সাধারণ শিক্ষিত লোকে তাহা ক্রয় করে। এতদ্ব্যতীত কুমারী-

সদনের চতুষ্পার্শ্বে অনেক কর্ষণোপযোগী উর্ব্বর ভূমি রক্ষিত হয়; কুমারীগণ তাহা চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে।

তিব্বতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে বিবিধ প্রথা প্রচলিত আছে। একটি প্রথানুসারে মৃত্যুর পর কয়েক দিবস মৃতদেহ গৃহে রক্ষিত হয়। শয্যার সহিত তৎপরে মৃতদেহটি রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হয়। তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস যে, এইরূপে বন্ধন না করিলে মৃতদেহ উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। তিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ এইরূপে রক্ষিত হয়। শব যাহাতে বিকৃত না হয়, তজ্জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। তৎপরে পুরোহিত মৃতদেহের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে তিব্বতীয় পদ্ধতি পাঠ করেন। তিব্বতে সাধারণ লোকের মধ্যে কুক্কুর দ্বারা শব ভক্ষণ করাইবার রীতিও প্রচলিত আছে। তিব্বতের প্রত্যেক গ্রাম ও নগরে এই অদ্ভুত উপায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট মঠ আছে; কোন কোন স্থানে এই অনুষ্ঠান জন্য দুর্গবৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মমঠে বহুসংখ্যক কুক্কুর প্রতিপালিত হয়; ধর্ম্মমঠে প্রতিপালিত হওয়াতে এই সকল কুক্কুরের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস। কেবল ধনী তিব্বতবাসিগণের মৃতদেহ ভক্ষণ করাইবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুগণ শব খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরদিগকে খাইতে দেয়। কোন কোন তিব্বতবাসী কুক্কুর দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষিত করাইবার প্রথা কদর্য্য প্রথা জ্ঞান করিয়া নদ নদীর স্রোতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিয়া থাকে। আবার কোন কোন তিব্বতবাসী পর্ব্বতের উপর মৃতদেহ রাখিয়া আইসে, তথায় পশুপক্ষী কর্ত্তৃক উহা ভক্ষিত হয়। প্রিয় জনের মৃতদেহ পশুপক্ষী ভক্ষণ করিতেছে, এ দৃশ্য তাহারা কখনও দেখিতে চাহে না। তিব্বতে শবদাহ-প্রথাও প্রচলিত আছে। পুরোহিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মৃতদেহ প্রায়ই দাহ করা হইয়া থাকে। পুরোহিতের শবদাহে তাহার উত্তরাধিকারী পুরোহিতের একমাত্র অধিকার—চিতায় অগ্নি-সংযোগে আর কাহারও অধিকার নাই। চিতার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হয়। পুরোহিতের শবদাহসময়ে নানাপ্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যতক্ষণ শবদাহ হয়, ততক্ষণ কতকগুলি লোক বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে, এবং পুরোহিতগণ সমস্বরে ধর্ম্মবচন আবৃত্তি করিতে থাকে। শ্রেষ্ঠ পুরোহিতদিগের দেহের ভস্মাবশেষ ধাতুপাত্রে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের কোন কোন অংশে প্রথা আছে যে, মৃত ব্যক্তির বাটীর ছাদের উপর সপ্তাহ কাল একজন লামা উপবিষ্ট থাকিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিবে। সপ্তম দিনে মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব ও কতকগুলি

লামা সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে। তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইরূপ পাঠ হইয়া থাকে। এইরূপ পাঠে পরলোকে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হয়, ইহা তিব্বতীয়-গণের ধারণা। পাঠান্তে সমবেত ব্যক্তিগণ পানভোজনে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রথা হিন্দু-স্থানে প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুরূপ। অনেক পরলোকগত তিব্বতবাসীর আত্মীয়-গণ তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে বর্ষে বর্ষে এই প্রকার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধক্রিয়ায় যে ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে অনেকে মদ্যপান করিয়া থাকেন। তিব্বতবাসিগণের মধ্যে পানদোষ বিলক্ষণ প্রচলিত।

তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর মস্তকের কোন না কোন স্থান দিয়া বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, এবং যে স্থান দিয়া বহির্গত হয়, সে স্থানে কিঞ্চিৎ শোণিত-পাতের চিহ্ন থাকে। উপস্থিত লামা-গণের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি শবের মস্তকের পশ্চাৎ দিকের কেশগুলি কিয়ৎ-কাল উত্তোলন করিয়া রাখেন; কারণ আত্মার উহাই নির্গমস্থান, ইহা তাঁহা-দিগের বিশ্বাস। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য গৃহ হইতে শবকে বাহির করিবার পূর্ব্বে আত্মীয়গণ উহার পূজা করেন এবং সাত বার উহাকে প্রদক্ষিণ করেন। তিব্বতের কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, মৃত-দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় সঙ্গে যাঁহারা গমন করিবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক খণ্ড জ্বালানি কাষ্ঠ লইয়া যাইতে হইবে। এই কাষ্ঠগুলি একত্রিত করিয়া শবদাহ জন্য ব্যবহৃত হয়। শবদাহ হইবার পর শ্মশানগামী আত্মীয় বন্ধুগণ বাটী প্রত্যাগমন করিবার সময় স্থিরপদে না গিয়া দৌড়িয়া আসিয়া থাকেন। তিব্বতবাসিগণের বাটীতে অনেক ভস্মাধার দেখা যায়; এই গুলিতে মৃত আত্মীয়গণের ভস্ম রক্ষিত হয়। শব-দাহের পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণকে উপহার প্রদানের প্রথা অনেকানেক তিব্বতীয়ের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যাঁহারা সাধুপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত, তাঁহাদিগের ভস্ম ধর্ম্মমঠসমূহে রক্ষিত হয়। ভক্ত শিষ্যগণকে উক্ত ভস্মের কিঞ্চিদংশ দান করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার শুভ কামনা করিয়া তিব্বতীয়গণ যে সকল প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে একটি প্রার্থনার মর্ম্ম এইরূপ;—"আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, পরলোকে গিয়া আপনি পুনর্জ্জন্মের জন্য সুবিধাকর পথ প্রাপ্ত হউন।" গৃহে মৃত্যু ঘটিলে মৃত্যুর পর কয়েক দিবস কাল বাটীর ছাদের উপর বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে আহারীয় দ্রব্য রক্ষিত হয়, পরে তাহা পশুপক্ষীদিগকে প্রদত্ত হয়। এই প্রথার অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাঁহার আত্মাকে আহার্য্য দ্রব্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে অনিচ্ছু নহেন। শোকতপ্ত আত্মীয়গণ শোকপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ কিছুদিন অতি মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন।

যখন কোন গৃহে মৃত্যু ঘটে, তখন পরিবারস্থ সকলে যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক লামাগণকে অর্পণ করেন। লামাগণ প্রতি বৎসর এই সকল বস্ত্র নিলামে বিক্রয় করেন।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ৬৩২ খৃঃ অব্দে তৎকালীন তিব্বতাধিপতি বুদ্ধদেব এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিবার জন্য তদীয় মন্ত্রীকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনি ভারতের তৎকাল-প্রচলিত ভাষার বর্ণমালার আদর্শানুযায়ী তিব্বতীয় বর্ণ-মালার সৃষ্টি করেন। ভারতীয় বর্ণ-মালার কয়েকটী স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ ইনি ত্যাগ করেন, কেননা তাঁহার বিবেচনায় তিব্বতীয় ভাষায় ঐ গুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু ইনি ছয়টি নূতন বর্ণের সৃষ্টি করেন। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিপি-কৌশলও তিব্বতে প্রবর্ত্তিত করেন। তিব্বতীয় বর্ণমালায় এক্ষণে চারি প্রকার অক্ষরের প্রচলন হইয়াছে। এই কয়েক প্রকার অক্ষরের মধ্যে প্রথম প্রকার কেবল ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখনে, দ্বিতীয় প্রকার বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় লেখায়, তৃতীয় প্রকার গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনে এবং চতুর্থ প্রকার অক্ষর চিঠিপত্র লেখায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে প্রচলিত মুদ্রাযন্ত্রের আদর্শে গঠিত বহুসংখ্যক মুদ্রাযন্ত্র তিব্বতের নানা স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রাযন্ত্র হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধে তিব্বতীয় ভাষায় বিবিধ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তিকা তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ বিক্রয় করিবার জন্য নেপালে লইয়া আইসেন। নেপালের রাজধানী খাটামুণ্ডে তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের বহুল প্রচার দেখা যায়। খ্রীষ্টিয়ান্ মিসনারিগণ তিব্বতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল বিদেশীয়দিগের মধ্যে তিব্বত-ভাষাভিজ্ঞ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে তিব্বতীয় ভাষার একটি অভিধান প্রকাশিত হয়। উহাতে তিব্বতীয় কথার অর্থ ইংরাজীতে প্রদত্ত হইয়াছে। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বত ভ্রমণের পর হইতে তিব্বতীয় ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। উহাতেও তিব্বতীয় ভাষার অর্থ ইংরাজীতে প্রদত্ত হইবে।

প্রেতাত্মার উপাসনা বর্ব্বর ও অসভ্যতম জাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আদিমকালে এসিয়া ভূখণ্ডের নানা স্থানে প্রেতাত্মার উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকল জাতির মধ্যেই অদ্যাপি এই প্রকার উপাসনা কোন না কোন আকারে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তিব্বতীয়গণ প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন। প্রেতাত্মাগণ সর্ব্বত্রই আছে এবং সর্ব্বদা মানুষের অমঙ্গল সাধনে উন্মুখ বা ব্যাপৃত, তাঁহাদিগের

এই দৃঢ় বিশ্বাস। পুরোহিতগণ প্রেতাত্মাগণের পূজা করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন কিম্বা কোন বিশেষ স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারেন, তিব্বতীয়গণের এরূপ দৃঢ় ধারণা। রোগ, মহামারী, ঝটিকা প্রেতাত্মাগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং চেষ্টা করিলে পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পুরোহিতগণ প্রেতাত্মাগণকে এই সকল অমঙ্গল অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিতে পারেন, তিব্বতীয়গণ ইহা ধ্রুব সত্য মনে করেন। বৃক্ষই প্রেতাত্মাগণের প্রিয়তম বাসস্থান। নির্জ্জন প্রান্তর এবং অন্ধকারময় স্থানেও ইহারা বিচরণ করিতে ভালবাসে। মানুষের বাসস্থানেও তাহারা আশ্রয় লয়।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

পরাজয়।

"ও কিসের কোলাহল ?"

"তা কি তুই জানিস না ?"

"তবু আর একবার শুনি ?"

"আজ দুর্গাধিপতির পুত্র আসিতেছেন, তাই এই সমারোহ।"

"সত্য ? ওই নীচ পরদ্রব্যাপহারী—ও দুর্গাধিপতি, আর আমি কে ?"

"চুপ কর মা! লোকে শুনিলে তোকে পাগল ভাবুবে।"

"ভাবলে কি করিব ? এই চলিলাম, দেখি লোকে কাহাকে কি বলে ?" এই বলিয়া একটি মুক্তকেশী বালিকা ছুটিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজপুতানার পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে একটি গ্রামে, এক ক্ষুদ্র কুটীরে একজন বর্ষীয়সী রমণী ও বালিকার এইরূপ কথা হইতেছিল।

বালিকা কোনও দিকে না চাহিয়া সেই দুর্গাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সহসা দুর্গের সম্মুখে বাদ্যের কোলাহলে, লোকের সমারোহে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে অশ্বের হ্রেষারবে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল একজন দীর্ঘাকার সুন্দর যুবক আকুলনয়নে চাহিয়া সবলে অশ্বের রাশ টানিয়া ধরিয়াছেন। অশ্ব কোনরূপে বাগ না মানিয়া ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সকল অন্ধকার, বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। সম্মুখবর্ত্তী একজন পুরুষ অশ্বকে থামাইয়া ফেলিলেন, অশ্বের রাশ তাহার হস্তে ধরিতে দিয়া অশ্বারোহী সেই তরুণী বালিকাকে ধরণীধূলা হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে মস্তক তুলিয়া লইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বাদ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। যুবক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে বলিলেন—

"শীঘ্র বারি লইয়া আইস, বালিকা অচেতন হইয়াছে।" দুর্গ হইতে দুর্গাধিপতি পদব্রজে বাহিরে আসিয়া পুত্রকে সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ কি বিনা! কি হইয়াছে ? ও কে ?"

"আমি জানি না কে, আমার অশ্ব ইহার প্রতি ছুটিয়াছিল বলিয়া বালিকা আতঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।"

"আঘাত লাগে নাই ত ?"

"কি করিয়া জানিব ? বালিকা অচেতন। কেবল মাত্র ললাটের এক স্থলে ক্ষতচিহ্ন দেখিতেছি, শোণিত পড়িতেছে।" কিয়ৎক্ষণ মুখে সলিল সিঞ্চন করিবার পর, বালিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। সম্মুখেই একটি সুন্দর মুখ—দুইটী আকুল চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

দুর্গাধিপতি সম্মুখবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বালিকা কে ? তোমরা কেহ ইহাকে চিনিতেছ কি ?"

বহু কণ্ঠে আকুল ও স্নেহপূর্ণ স্বরে উচ্চারিত হইল—

"আমাদের পুরাতন দুর্গাধিপতির একমাত্র কন্যা তারাদেবী।" তারা দেবীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিল। সে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া উন্নত মস্তক হেলাইয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে যুবকের প্রতি ফিরিয়া কহিল—

"দেখিলে এ দুর্গ কার ? আমি কে, আর তোমরা কে ?" এই বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনায়ক রাওর চক্ষুপ্রান্ত যেন একটী বিদ্যুৎশিখা ঝলসিয়া গেল। সে চিহ্ন কি মুছিবার ? সে মুখ কি ভুলিবার ?

কুটীরে সেই বর্ষীয়সী রমণী আকুল আগ্রহে দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বর্গচ্যুত উল্কার মত ছুটিয়া তারা গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া শয়ন করিল। বর্ষীয়সী রমণী সস্নেহে তাহার অযত্নে পতিত কুন্তলজাল সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তারা, কেন গিয়াছিলে ?"

"দেখিতে গিয়াছিলাম, আমাদের সেই পুরাতন কর্ম্মচারীরা আজ এই নূতন দুর্গাধিপতির পুত্রকে কিরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। বিষণ্ণ-আননে মৃদু-কণ্ঠে রমণী বলিলেন—

"আমাদের অদৃষ্টের দোষ, দুর্গাধিপতি কি করিবেন ?" ক্রুদ্ধ কেশরিণীর ন্যায় মস্তক তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে বালিকা কহিল—

"অদৃষ্টের দোষ ? মা! তুমি কেবল অদৃষ্টের দোষ দেখিয়া আসিতেছ, স্বেচ্ছাচারী ন্যায়শূন্য রাজা, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা।" মৃদু বিষাদের হাসি হাসিয়া রমণী বলিলেন—

"সেও অদৃষ্টে করে মা!"

তারাদেবী পূর্ব্বতন দুর্গাধিপতি অনন্ত দেবের একমাত্র আদরের দুহিতা। অনন্ত দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার সকল জায়গীর জাম বর্ত্তমান সুরযমল পাইয়াছেন। সুরযমলের একমাত্র পুত্র বিনায়ক রাও সম্প্রতি রাণার সহিত যুদ্ধে গিয়া সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাই

এই সমারোহ। অনন্ত দেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার স্ত্রী ও তারাদেবী শুনিলেন যে, তাহাদের আর সে দুর্গে অধিকার নাই, তখন তাঁহারা একদা গভীর রজনীতে বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া গ্রামপ্রান্তে আসিলেন, তদবধি এই ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছেন। অনন্ত দেবের সহধর্ম্মিণী আসিবার সময় যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতেই দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

তারা শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়া, বাল্য ও কৈশোরের মিলন-স্থানে উপনীত হইয়াছে। লাবণ্য-বিকশিতা বাসন্তী লতিকার মত সে অতুলনীয়া সুন্দরী। শৈশবে সে পিতার অত্যধিক আদরে যত্নে পুত্রের মত লালিত পালিত হইয়াছিল, এই জন্য তাহার হৃদয়ের ভাব পুরুষোচিত হইয়াছিল। রাজপুতকুমারীর স্বাভাবিক গর্ব্বিত ভাব তাহার বদনে সর্ব্বদা প্রভাসিত হইত। সে যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারিত; যাহার প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিত, তাহার সহিত সদ্ভাব হইত না। সে পিতার সহিত প্রজাদের কুটীরে গিয়া স্বচক্ষে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আসিত। দুঃখীর দুঃখে তাহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। দরিদ্রের গৃহে গিয়া তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ করিত। পীড়িত ব্যক্তির গৃহে গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিত। তারাকে সকলে দুর্গাধিপতির পুত্রের মত ভক্তি সম্মান করিত। তাহার হৃদয়ে রমণীসুলভ কোমলভাব রাশি না ফুটিয়া, পুরুষের বীর্য্যবল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে যখন শুনিল দুর্গের জীর্ণসংস্কার করাইয়া নূতন দুর্গাধিপতি আসিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয়ে কে যে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিল। তাহার পিতার দুর্গ অন্যে লইল, তাহার সে আজন্ম-স্নেহের গৃহ অন্যের হইল! আহা যদি সে অনন্তদেবের কন্যা না হইয়া পুত্র হইত, তাহা হইলে—। হায় তারা! তুমি নারী, স্নেহ প্রেমই তোমার হৃদয়ের অস্ত্র, সেই মধুর শিকলে যখন তুমি শত্রুকে বাঁধিতে পার, তখন অন্য উপায় কি নারী হৃদয়োচিত?

তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। তারাদেবী মুগ্ধ প্রজাগণের মুখে দুর্গাধিপতি ও তাঁহার পুত্রের যশোগান শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছে। পিতা ও পুত্রের দরিদ্রদিগের প্রতি অসীম দয়ার কথা শুনিয়া তাহার পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পরদ্রব্যাপহারীরা দস্যুর মত আসিয়া একি বিজয়ী রাজা হইল! তাহার মনে নানা ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকিত। আবার একবার বিনায়ক রাওকে দেখিবার বাসনাও বুঝি হইত, প্রজাদের কথায় বিশ্বাস হয় না, দেখিয়া পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইত। অথবা সেই শূন্য কুমারীহৃদয়ে তাঁহার ছায়া পড়িয়াছিল, কে জানে? আর তারাদেবী মায়ের সম্মুখে সে প্রকার সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিত না।

একদা সন্ধ্যাকালে তারা দেবী দরিদ্র গ্রামবাসীদের গৃহ হইতে আপনার গৃহে ফিরিতেছিল। অতি মধুর সন্ধ্যাকাল, পার্ব্বত্য প্রদেশের সায়ংকালীন বর্ণনা ভাষায় হয় না। সেই উন্নত শৈলশ্রেণী, শৈলশ্রেণীর উপর ঘন বৃক্ষ সকল কেমন চিত্রিত ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছে! সেই শৈলের পদতলে একটি সরোবর। তাহার চারি দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ অতি মৃদুভাবে হাসিতেছে। সে দীপ্তি এত মধুর ও স্নিগ্ধ, তাহাতে লেশমাত্র তাপ নাই। সহসা সূর্য্য ডুবিয়া গেল। আকাশ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল। কে যেন সেই রঙের পর রঙ তুলি দিয়া চিত্রিত করিয়া দিল। সেই গাঢ় নীলিমার পর কি সুন্দর সোণালী ধারা ফুটিয়াছে, তুষারনিভ শুভ্র মেঘের পাশে কেমন ধূসর মেঘ ভাসিতেছে! সন্ধ্যার সমীরণে যেন কার আকুলতা কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। সেই সন্ধ্যায় তারা একাকিনী মহাবীরের সহিত দরিদ্র গ্রামবাসীদিগের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। মহাবীর নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছে। তারা একাকিনী অনন্যমনে সরোবরকূলে বসিয়া আছে। দরিদ্র গ্রামবাসীদিগের নিকট দুর্গাধিপতি ও বিনায়ক রাওয়ের গুণগান শুনিয়া তাহারও হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। সে একমনে স্বচ্ছ কাচের মত নির্ম্মল সলিলের প্রতি চাহিয়া আছে। মানসপটে বিনায়ক রাওয়ের সেই সুন্দর আনন, সেই আকুল আগ্রহপূর্ণ নয়ন জাগিয়া উঠিল। সহসা একি, এ সলিলে কাহার ছায়া? হৃদয়ের প্রতিবিম্ব কি জলরাশিতে প্রভাসিত হইল? তারা মুখ তুলিয়া বিনায়ককে দেখিল, আত্মবিস্মৃত হইয়া সম্মুখস্থ জলরাশির প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে বারিরাশির মধ্যে পড়িয়া গেল। বিনায়ক সেই মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া সন্তরণ দিয়া কূলে আনিলেন। তারা অচেতন হইয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিল। ভয়াকুলচিত্তে চারি দিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিয়া যুবক তারার সেই অবশ দেহভার লইয়া বসিয়া পড়িলেন ও সেই আর্দ্রবসনা মুক্তকেশী বালিকার মুখের দিকে আত্মবিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিলেন। তারাদেবীর অল্পে অল্পে জ্ঞান হইতেছিল, সহসা সে পদ্মকোরকের মত বিশাল নয়ন দুটি ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল—

"বিনায়ক—বিনয়" আবার চক্ষু দুটি মুদ্রিত হইল। সেই দুর্লভ গোলাপদলের মত রাঙা অধরপ্রান্তে সে কথা আসিয়া মিলাইয়া গেল, কিন্তু সেই চঞ্চলচিত্ত যুবকের হৃদয়ে সেই অর্দ্ধস্ফুট কথায় সুখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এমন সময় মহাবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে সহসা সে এই প্রকার ঘটনায় এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাহার বাক্যস্ফুরণ হইল না। বিনায়ক রাও অতি অল্প কথায় তাহাকে সব বুঝাইয়া দিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই সহসা তারার

সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান হইল, সে বিনায়ক রাওয়ের নিকট হইতে সম্ভ্রমের ও সরমের সহিত সরিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হইয়াছে, মহাবীর!" মহাবীর অতিশয় গম্ভীরকণ্ঠে বলিল "যাহা হইয়াছিল, তাহা আর স্মরণে আনিয়া কাজ নাই। তবে তোমার দোষেই তুমি জলে পড়িয়াছিলে, তাহার সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে ইনি তোমায় রক্ষা করিলেন।"

সবিস্ময়ে তারা বলিল—"আমি কেন জলে পড়িলাম?"

বিনায়ক রাও মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—

"তাহাত জানি না, আমি দূর হইতে এই সরোবরকূলে কে বসিয়া আছে দেখিলাম। নিকটে আসিয়া দেখিলাম আপনি সহসা জলে পড়িয়া গেলেন।"

মহাবীর বলিল—

"আপনাকে শত ধন্যবাদ।" তৎপর তারার প্রতি ফিরিয়া কহিল—

"তারাদেবী তুমি তোমার জীবনদাতাকে চিনিয়াছ?"

তারাদেবী আনত আননে ভূমির পানে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

তখন মহাবীর করযোড়ে বিনায়ক রাওকে কহিল "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে আসিলে তারাদেবীর জননী কত সুখী হইবেন; আপনি আসিবেন কি? তারা তুমি অনুরোধ করিয়া বল।" তারা আনত আনন ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিনায়ক রাওয়ের প্রতি চাহিল। আর কি অনুরোধের অপেক্ষা! সেই চক্ষের দৃষ্টিতে যেন বিনায়ক রাওয়ের হৃদয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ বহিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে তাহাদের সহিত অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

সুমাতার জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা।

"আমাকে একশত সুমাতা দাও, আমি ফরাসী জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করিব।"

—নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টী।

উপরে যে মহাবাক্যের অনুবাদটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইহার ভাব গভীর হইতে গভীরতর। বাস্তবিক সুমাতার জীবন অতি দায়িত্বপূর্ণ। কার্য্য-জগতের সকল কার্য্যাপেক্ষা শিশুপালন অতি গুরুতর ও কঠিন কার্য্য। জাতীয় জীবনকে গঠন ও উন্নতির পথে রক্ষা করিতে, এক একটী জীবনকে মহত্ত্বের পথে চালাইতে এবং সন্তানের সুকুমার চরিত্রে উচ্চ আদর্শ ধরিয়া দিতে মাতা যেমন সক্ষম, তেমন আর কেহই নয়। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল লোক নানা

বিষয়ে সদ্‌গুণরাশি সঞ্চয় করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জননী সাধারণ রমণী অপেক্ষা কোন না কোন গুণে শ্রেষ্ঠ।

সুমাতা নহিলে সন্তানের জীবন ভাল হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমরা একরূপ বুঝিয়াছি। সুমাতা সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং দুঃখিনী নারীর সমাজ উন্নত না হইলে পুরুষজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যে অসম্ভব, উহাও আমরা বুঝিয়াছি। এখন কি উপায়ে সুমাতা হওয়া যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

সন্তানের জীবন-গঠন যদিও সম্পূর্ণভাবে মায়ের উপরেই নির্ভর করে, তথাপি এই কয়টী উপাদান তাহাদের জীবনে প্রবলভাবে কার্য্য করে;—প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় সঙ্গ, তৃতীয় শিক্ষা, চতুর্থ সাধন।

অনেকেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, সন্তানোৎপাদনকালে মাতা পিতার মনের ভাব যেমন থাকে, অধিকাংশ স্থলে সন্তানের প্রকৃতি সেইরূপ হইয়া থাকে। ঐ সময় পিতামাতার মন যদি উচ্চ ভাবে পূর্ণ থাকে, তাহাতে কোন উন্নত আদর্শ জাগরূক থাকে, তবে সন্তানের ভাল হইবার সম্ভাবনা। বিপরীতাচরণে মন্দপ্রকৃতি হইবার সম্ভাবনা। ইহাকেই সাধারণতঃ জন্মগত গুণ বা দোষ বলা যায়। এই দোষ বা গুণ সহস্র শিক্ষাতেও দূর করা যায় না। বিজ্ঞান এই সত্য সহস্রকণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিতেছে "এই জন্ম-সময়ের ভাব হইতেই শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।" তাই আমাদের দেশের প্রবচনে আছে 'স্বভাব যায় মলে, ইল্লত যায় ধূলে।" সাধারণ লোকে বলে "ওর অমন প্রকৃতি বাপ মা হতে পেয়েছে।"

দ্বিতীয়তঃ সঙ্গ। সঙ্গদোষ শিশুজীবনে বড় শীঘ্র শীঘ্র সংক্রামিত হয়; কারণ শিশুরা বড় অনুকরণ-প্রিয় ও অতি শীঘ্র অনুকরণে সমর্থ। সুতরাং উহাদিগকে ভাল মন্দ বাছিয়া মিশিতে দিতে হইবে। সৎপ্রকৃতির বালক বালিকার সঙ্গে শিশুরা পড়ুক, খেলুক, আমোদ করুক, তাহাতে ভাল হইবে। নীচপ্রকৃতির ছেলে মেয়ে দাস দাসীর সঙ্গে মিশিলে বড় অনিষ্ট।

তৃতীয়তঃ স্কুলের শিক্ষা। উত্তম শিক্ষকের নিকটেই উত্তম শিক্ষালাভ হয়। মিথ্যাবাদী দুশ্চরিত্র শিক্ষকের শিক্ষা বালক-জীবনকে কলঙ্কিত করে। বালকগণ ঐ সকল শিক্ষককে মনে মনে ঘৃণা করে এবং উহাদের শাসন বা তিরস্কারে ভয় বা লজ্জা না হইয়া অনেক স্থলে বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হয়। যে চরিত্রকে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না, তাহার নিকট উচ্চজ্ঞান (যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে আলোক দান করিবে) লাভের আশা বৃথা। গীতার কথা "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" ক্রোধপরায়ণ মাতাপিতা যেমন ভাল নহে, ক্রোধপরায়ণ ও অমিতাচারী শিক্ষকও তদ্রূপ দোষাবহ। উহার সহস্র উপদেশেও শিশুগণ ক্রোধকে

দমন করিতে পারিবে না। তাই সম্প্রতি চীনদেশে একজন পিতৃঘাতী বালকের ফাঁশির হুকুম হওয়াতে ঐ সঙ্গে তাহার শিক্ষকেরও ফাঁশির হুকুম হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ সাধন বা অভ্যাস। শিশুকে যাহা শিখাইবে বা অভ্যাস করাইবে, সে তাই শিক্ষা করিবে। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—মানব এক হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে যাহা অভ্যাস করে, উহা তাহার সমগ্র জীবনের উপর কার্য্য করে। এক কথায় বলিতে গেলে, ঐ সময় ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি অবনতির সোপান।

শিক্ষার অর্থ জ্ঞানলাভ। পরম কারুণিক জগৎপিতা আমাদিগকে যে আত্মা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, উহাকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত করিয়া লইয়া আমাদিগকে ইহ জগৎ হইতে অবসৃত হইতে হইবে। আত্মার সাধারণতঃ চারিটী বিভাগ—জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, শক্তি। মোটামুটী এই চারিটীর সমষ্টিকে আত্মা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং একটীর উন্নতি করিলে চলিবে না। বালক বালিকাগণ যাহাতে চারিটী বিভাগেই উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজকাল শিক্ষা অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ এবং শিক্ষিত অর্থে পরীক্ষোত্তীর্ণ (পাসকরা) পুরুষ বা রমণী। বাস্তবিক শিক্ষার অর্থ তাহা নহে। আত্মার সকল বিভাগের উন্নতিই প্রকৃত শিক্ষা। বিদ্যালয়ে জ্ঞান-বৃত্তি চরিতার্থ হউক। সেখানে পাস কর, উপাধিলও। কিন্তু গৃহে অন্য বৃত্তিগুলির উন্নতির জন্য মাতাকে যত্ন করিতে হইবে। সন্তানদের ইচ্ছা যাহাতে সৎ ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য মাতাকে উৎসাহ দিতে হইবে এবং ইহাদের মনের শক্তি—প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য মাতাকেই প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন ছোট শিশু আবার প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, এ কি অযুক্তির কথা? আমার বিবেচনায় উহা অযুক্তির কথা নহে। শিশুদেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তাহারই "করিব কি করিব না" এই দুইটী বৃত্তি আছে। শিশু কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। পাপ-কর্ম্মে মতি জন্মিলে কৌশলক্রমে উহা হইতে দূরে লইয়া যাইতে হইবে। বিপরীত ভাব—পুণ্য কার্য্যের জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। সময় সময় ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইহাদিগকে চালাইতে হইবে।

যে সকল বালক বালিকা স্বভাবতঃ নিরীহ প্রকৃতি, তাহাদিগকে চালান বড় কষ্টকর নহে। সুশিক্ষা রূপ বীজ শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির জমীতেই আশু উত্তম ফল প্রদান করে। তারপর যে সকল শিশু এক হাতে মানুষ হয়, অর্থাৎ মাতা পিতা একমত হইয়া যাহাদিগকে শিক্ষা দেন এবং মাতা পিতার স্নেহ ও সহানুভূতি ব্যতীত যাহারা অপর কাহারও (দিদিমা পিসিমা প্রভৃতির) সহানুভূতি কখনই পায় নাই, তাহারা অনেক স্থলে ভাল ছেলে হইয়া থাকে। একটী ছবি বা পুতুল যদি পাঁচ জনে সাজায় বা রং দেয়, তবে উহা যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, শিশুদিগের গঠনও তেমনি এক হাতেই সুন্দর হইয়া থাকে।

যে সকল ছেলের প্রকৃতি একগুঁয়ে, অর্থাৎ যাহারা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, সম্ভবতঃ মাতা পিতার নিকট তাহারা ঐ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের চালক হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য বিশেষ বুদ্ধিকৌশলের প্রয়োজন। সময় সময় আপনাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া তাহাদের বশীভূত হইতে হয় এবং কৌশলক্রমে ধীরে ধীরে বার বার তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া উহা অভ্যাস করাইতে হয়। অনেক সময় দুরন্ত ছেলে মহৎ লোক হইয়াছে—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

আর এক কথা। দুরন্ত সন্তানকে যদি মা কিছুতেই বশীভূত করিতে না পারেন বা সৎশিক্ষা দ্বারা উহার কোনও উপকার না হয়, তথাপি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া তাঁহার নিজ জীবনের সদ্‌গুণরাশি সন্তানের সম্মুখে ধরিতে হইবে; অর্থাৎ মাতৃজীবনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ঈশ্বর-বিশ্বাস, প্রগাঢ় সত্যানুরাগ, অপক্ষপাতিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সেবানুরাগ, নিঃস্বার্থভাবে জগতের প্রতি প্রেম, পরিবারের উন্নতিতে যত্ন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রমশীলতা, সর্ব্বোপরি সন্তানকে ভাল করিবার জন্য প্রাণগত ইচ্ছা, নিঃস্বার্থ প্রেম ও একান্ত প্রার্থনা তাহাকে দেখাইতে হইবে। যে সন্তান মাতৃজীবনে এই সকল সদ্‌গুণ দেখিতে পায়, তাহার ভাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সাধ্বী মণিকা (সেণ্ট অগষ্টিনের মাতা) ঐ উপায়েই পাপী সন্তানকে ঋষি করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনা ও ন্যায়পরায়ণতা অধিক শিক্ষণীয়।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মা আছেন, যাঁহারা সন্তানের ন্যায় অন্যায় সকল কার্য্যকেই ভাল চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অন্যে সন্তানের দোষ দেখাইলে বিরক্ত হন। এমন কি যদি একজনের সন্তানের দোষে আর একজনের ভয়ানক ক্ষতি হয়, তাহা হইলেও নিজ সন্তানের দোষ লঘু করিয়া যাহার ক্ষতি হইল তাহাকেই জনসমাজে হেয় করিয়া থাকেন। ইহাতে অপরের যে ক্ষতি হইল তাহা অপেক্ষা নিজের ক্ষতি অধিক হয়, এটা চিন্তা করা উচিত। যে জননী ন্যায়ের অবমাননা করেন, সন্তানগণ তাহাকে কখনই শ্রদ্ধা করে না।

যে বিষয় এই প্রবন্ধে বলা হইল, উহা আমার পক্ষে একান্তই অনধিকার-চর্চ্চা; তথাপি উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের উচ্চতা দেখিয়াও যেমন ক্ষুদ্র বালুকাকণা চুপ করিয়া

থাকে না, তাহার ন্যায় অন্যান্য অণুকণার সহিত মিলিত হইয়া স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্য-দানে ব্যগ্র হয়, তেমনি আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াও আমাদের সমাজের অধোগতি দেখিয়া নিজে যাহা প্রতীকারের উপায় দেখিতেছি, তাহাই লিখিতেছি। আশা করি, ভগ্নীগণ সত্যের অনুরোধে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। সর্ব্ব-শেষে দয়াময়ের চরণে প্রার্থনা, তিনি সুমাতা হইবার উপযুক্ত শক্তি আমা-দিগকে দিউন।

সুশীলা বালা সিংহ।

কাব্যবোধ।

(৪৭৯ সংখ্যা—৮৯ পৃষ্ঠার পর)

ছন্দপ্রকরণ।

পয়ারের অন্যান্য উদাহরণ।

১। অষ্টম বর্ণের পর যতি অর্থাৎ প্রথম পদাংশ অষ্টবর্ণ এবং উত্তর পদাংশ ছয় বর্ণ বিশিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত নিয়ম-গুলি অনুসরণ করিয়া বর্ণবিন্যাস করিতে হয়। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুইবর্ণ-বিশিষ্ট হইলে, বাকি ছয় বর্ণ দুই বর্ণের ৩টি শব্দ অথবা একটী দুইবর্ণ ও অপরটি চারিবর্ণ বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় এবং উত্তর পদাংশ দুই বর্ণের তিনটি শব্দ কিম্বা একটী দুই বর্ণের ও অপরটি চারি বর্ণের অথবা দুইটি তিন বর্ণের শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, যথা—

ক। প্রথম ও উত্তর পদাংশ সমস্তই দুই দুই বর্ণবিশিষ্ট শব্দ; যথা, "মাতৃযত্নে দেহরক্ষা, আত্মা পিতা হৈতে।"

খ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই, দ্বিতীয় শব্দ দুই ও তৃতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশ তিনটি দুই বর্ণের শব্দ বিশিষ্ট হইবে; যথা, "জন্মে ধন্যা জন্মভূমি যশে পূর্ণ দেশ।"

গ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং শেষ শব্দ দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে তিনটি দুই বর্ণের শব্দ; যথা, "চির প্রজ্বলিত দীপ দীপ্তি পুণ্যময়।"

ঘ। প্রথম পদাংশে দুই বর্ণের চারিটি শব্দ এবং উত্তর পদাংশে প্রথম দুই বর্ণের ও অপরটি চারি বর্ণের শব্দ; যথা—"রাজ-বাটী আজ যেন, নিজ নিকেতন।"

ঙ। প্রথম পদাংশে দুই বর্ণের চারিটি শব্দ এবং উত্তর পদাংশের প্রথম শব্দটি চারি বর্ণের ও দ্বিতীয়টি দুই বর্ণের; যথা—

"ঘন রণ-ডঙ্কা বাজে ভয়ঙ্কর রবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরে দূত জাগাইছে সবে।"

প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের ও তৃতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশের প্রথম শব্দটি দুই বর্ণের ও শেষ শব্দটি চারি বর্ণের; যথা—

"সিদ্ধপীঠ হরিদ্বার মুনি-মনোহর।"

ছ। প্রথম পদাংশে দুই বর্ণের চারিটি শব্দ ও উত্তর পদাংশে তিন বর্ণের দুইটি শব্দ; যথা—

"ঘোষে ঘন ঘোর নাদে কামান ভীষণ
অসি টাঙ্গি ভল্য শল্য সাঙ্গিন-ঘর্ষণ।"

জ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দটি দুই বর্ণের, তৃতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে প্রথম শব্দটি চারি বর্ণের ও শেষ শব্দটি দুই বর্ণের; যথা—

"রবিদীপ্ত সুপবিত্র পুণ্যময় স্থান।"

ঝ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ দুই বর্ণের ও তৃতীয় শব্দটি চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে দুইটি শব্দই তিন বর্ণের; যথা—

"আজি হেন ভগ্নোদ্যম কিসের কারণ?"

ঞ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের ও তৃতীয় শব্দটি দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে একটি দুই বর্ণের ও অপরটি চারি বর্ণের; যথা—

"নমি পরবর্ত্তী যজ্ঞে বালা উত্তরিল।"

ট। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং তৃতীয় শব্দটি দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশের প্রথম শব্দ চারি বর্ণের ও শেষ শব্দ দুই বর্ণের; যথা—"রম্য হর্ম্ম্যাবলী কিবা রমণীয় স্থান।"

ঠ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের ও তৃতীয় শব্দটি দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশের দুইটি শব্দ তিন বর্ণের; যথা—

"কোন্ ইন্দ্রজালে বদ্ধ আছেন সকলে?"

প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের এবং উত্তর দুইটি শব্দই তিন বর্ণের হইলে সুশ্রাব্য হয় না, সুতরাং তাহা পরিত্যাজ্য।"

"বহে প্রবল ঝটিকা ঘোর ভয়ঙ্কর।"

"প্রবল ঝটিকা বহে ঘোর ভয়ঙ্কর" হওয়াই উচিত।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গগত কবি হেমচন্দ্র।

অল্প দিন হইল, কবিবর হেমচন্দ্র ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার স্পর্শে জন্মভূমি জীবন সার্থক মনে করিয়াছিলেন, যাঁহার গৌরবে ভারতমাতা সতত গৌরবান্বিতা ছিলেন, যাঁহার প্রতিভায় সমগ্র ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাঁহাকে হারাইয়া আজ সমস্ত ভারত শোকসলিলে নিমগ্ন! কিন্তু আজ সকলেরই ধৈর্য্য ধরা উচিত, কারণ হেমচন্দ্র মরেন নাই। এমন কবিকে মৃত্যু কখনই হরিয়া লইতে পারে না, কবি গাইয়াছেন:—

"সত্যই কবি কি মরে,
বোঝে না আবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন।"

সত্য সত্যই কবি মরেন না, বিদেশের কার্য্য শেষ করিয়া স্বদেশে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে গমন করেন মাত্র। যতদিন "বৃত্র-সংহার" "ভারত-সঙ্গীত" "কবিতাবলী" জীবিত থাকিবে, ততদিন কবি হেমও জীবিত থাকিবেন। তাঁহার জন্য যখনই কষ্ট হইবে, তখনই তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিব। সেই স্বদেশ-হিতৈষী উন্নতচেতা বৃদ্ধ কবি হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত—

"কে দেয় বিলাতি লিলি নলিনীতে উপমা"

প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিব। কবি তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর জলন্ত-শক্তির অমর চিহ্ন যথেষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন। বৃত্র-সংহারের কোদণ্ড-টঙ্কার এখনও সকলের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যতদিন ঐন্দ্রিলার দর্প, ইন্দুর করুণা, শচীর বিলাপ মানবমনকে দ্রবীভূত করিবে, ততদিন কবি জীবিতই থাকিবেন।

কবির জন্য কেহ কাঁদিও না। বাসবের দুর্দ্দান্ত কোদণ্ড-ধ্বনি এখনও তোমাদের কর্ণে বাজিতেছে। দধিচির আত্মত্যাগে এখনও তোমরা বিমোহিত। ভারত-সঙ্গীতের উদ্দীপনায় এখনও তোমাদের প্রাণ তেজোময়। কবিতাবলীর ওজস্বী ও কোমল কবিতাগুলি এখনও তোমাদের কণ্ঠস্থ। তার পর আর কান্না কেন? তবে কথা এই যে, এমন মধুর—এমন সুন্দর জিনিষ আর আমরা পাইব না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, কবি আমাদের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অফুরন্ত অমৃত। আমরা সেই অমৃতপানে পরিতৃপ্ত। রাজার পাইলে লোক সন্দেশের জন্য কাঁদে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ পাইলে আর দুঃখ থাকে না। আমাদের জন্য কবি রাজার না রাখিয়া সন্দেশই রাখিয়া গিয়াছেন। আমরাও সে মিষ্ট রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত আছি তবে কাঁদিব কেন? বরং ভগবানের নিকট সতত সরলচিত্তে প্রার্থনা করিব, তাঁহার আত্মা যেন অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে।

কবিবর হেমচন্দ্র সাহিত্যসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু যে জীবনে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সেই প্রতিভাময় কবি চক্ষের জ্যোতি হারাইয়া বহুদিন অন্ধকারে বাস করিয়া গিয়াছেন। সেই অবস্থাতে তাঁহার মনের ভাব যে কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার "চিন্তবিকাশে" অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই অবস্থার কথা স্মরণ হইলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয় বটে, কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ হইবেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে কবি হেমচন্দ্র শুধু কবি হেমচন্দ্র ছিলেন না, সাধু হেমচন্দ্রও হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনা হইতেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবানের করুণাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। তাই তিনি পরীক্ষা করিয়া ভক্তকে গ্রহণ করিলেন। লোকের বিশ্বাস সাধুই সুখে থাকে, পাপীই দুঃখ পায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে যত ধার্ম্মিক, তাহাকে তত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কারণ যিনি যত দুঃখ পাইবেন, তিনি ভগবান্‌কে তত স্মরণ করিবেন। দুঃখেই ভগবানের কথা মনে হয়, সুখে নহে। যিনি যত দুঃখ পাইবেন, তিনি তত নিরহঙ্কার হইবেন। বিবেক দুঃখীকেই উপদেশ দেয়, সুখীর নিকটেও যায় না। অতএব ভগবান্ দুঃখীকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। ভগবান্ সাধুকেই দুঃখ দেন, দুঃখের উপর দুঃখ দেন এবং পরীক্ষা করিতে থাকেন। সুখ পাইলে সাধু যদি তাঁহাকে বিস্মৃত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সাধুকে একটুকু সুখ দিতেও কুণ্ঠিত হন। অতএব যাঁহার দুঃখে দুঃখে জীবন যায়, তাঁহাকেই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত মনে করা উচিত।

বিপদ মানবের পরম বন্ধু। কত নাস্তিক পাষণ্ডকেও কোন না কোন বিপদে পড়িয়া সাধু হইতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে চির-সুখী অথবা অর্থী কখনও স্বর্গলাভ বা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। সুখের সঙ্গে সঙ্গেই মান অভিমান দর্প আইসে এবং ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতে হয়। সুখের সঙ্গে সঙ্গে যে কত দোষ আইসে, তাহা তলাইয়া বুঝুন না বুঝুন, জানেন সকলেই। ধনী মৃত্যুসময়ে হয়ত বিশেষ কোন কষ্ট পায় না; কারণ ইহ কালের পাপ সম্পূর্ণ-ভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখে। এ জন্মের পাপ পরলোকে সাত জন্ম ভোগ করিতে হইবে। সাধু মৃত্যুসময়েও কষ্ট ভোগ করেন, কারণ সাধু ধার্ম্মিককে ভগবান্ নিজের নিকট লইবেন; কিন্তু পৃথিবীবাসজনিত পাপ তখনও প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদের শরীরে রহিয়া যায়, অতএব পুণ্যময় বিধাতা সেই পাপরূপ মলা যন্ত্রণারূপ অনলে দগ্ধ করিয়া শোধন করেন; পরে তাঁহাদের পবিত্র আত্মা তাঁহার পবিত্র সকাশে লইয়া যান।

কবিবর হেমচন্দ্রকেও ভগবান্ সেই-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহার জন্য আর দুঃখ করিব না—অশ্রু ফেলিব না।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

নব্য বঙ্গমহিলা।

অনেক চেষ্টায় অনেক যত্নে বামা-হিতৈষী মহাশয়গণ এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্টক্রমে ইতি-মধ্যে অনেকের মনে একটা নিরাশার ভাব দেখা যাইতেছে। অনেকে বলেন "লেখা পড়া শিখিয়া নব্য মহিলাদিগের কিছু উপকার হইলেও ইঁহারা যে প্রাচীনাদিগের সদ্‌গুণরাশি হারাইতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে বঙ্গমহিলাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই।—কেন? তাহাও বলিতেছি।

মানবজীবনে অনেক ত্রুটি আছে। মানবজীবন অপূর্ণ বলিয়াই এই সকল ত্রুটি লক্ষিত হয়; যে জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত, সে জীবনকে দেবজীবন বলাই সঙ্গত। যাহা হউক এই অপূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াই লোকের মনুষ্যত্ব-লাভের উপায়। সেই জন্য আমাদের চরিত্রে যে সকল দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা আছে, সেই গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা উন্মূলন করা আমাদের প্রথম কার্য্য; আর দোষের স্থানে গুণকে প্রতিষ্ঠিত করা দ্বিতীয় কার্য্য। মনে করুন একজন অতীব কোপন-স্বভাব; নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোনও কথা শুনিলেই একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠেন; এ স্থলে নিজের এই ত্রুটি বুঝিয়া, ক্রুদ্ধ প্রকৃতিকে সংযমন করা তাঁহার প্রথম কার্য্য; আর সেই ক্রোধের স্থানে প্রীতিভাবকে সন্নিবেশিত করা তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য। এই দুই কার্য্য করিতে পারিলেই তিনি সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন।

কিন্তু এ কথা লেখা যতটা সহজ, কার্য্যে পরিণত করা ততটা সহজ নহে। নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারা অনেক স্থলে বড় কঠিন; সেই জন্য জীবনপথে একজন সমালোচক আবশ্যক। এই হিসাবেই বলিয়াছি যাঁহারা নব্য বঙ্গমহিলাদিগের ত্রুটির উল্লেখ করেন, তাঁহারা প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্। বঙ্গমহিলাগণ এক একবার নিজ নিজ জীবন আলোচনা করিয়া প্রকৃতিগত দোষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই উক্ত মহাশয়দিগের সদিচ্ছা পূর্ণ হইবে।

আমরা দেখিতেছি সত্য সত্যই প্রাচীনা মহিলাদিগের অপেক্ষা নব্য মহিলাদিগের বেশ, ভূষা, সামাজিক রীতি নীতি সুরুচি-সম্পন্ন হইলেও, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি কতক দূর চরিতার্থ হইলেও, অদ্যাপি কতকগুলি বিষয়ে নব্য বঙ্গমহিলাগণ প্রাচীনাদিগের বড়ই নিম্নতলে রহিয়াছেন। সেকালের শ্রমশীলতা, সেকালের গৃহকর্ম্মনিপুণতা, সেকালের আতিথেয়তা, সেকালের ধর্ম্ম-প্রাণতা এবং সেকালের ভক্তিভাব, আজিকার দিনে বঙ্গ-গৃহে বড়ই দুর্লভ হইয়াছে। একালের সুরুচিযুক্ত, সপ্রতিভ মহিলাদিগের মধ্যে সেই সকল জিনিস যতদিন না পাওয়া যাইবে, ততদিন তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, তাঁহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিবে, তাঁহারাও "অর্দ্ধ মাত্রার মনুষ্য" রহিবেন।

আমরা যে সকল সদ্‌গুণের কথা বলিলাম, কেবল লেখাপড়া হইতে সে সকল গুণের বিকাশ হইতে পারে না, বোধ হয় এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহার জন্য শিক্ষা ও অভ্যাস আবশ্যক।

কিন্তু এ শিক্ষা দিবে কে? কে কি মনে করিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস পুরুষেরাই স্ত্রীসমাজের পরিচালক। তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে গঠন করিতেছেন, স্ত্রীজাতি সেই ভাবেই গঠিত হইতেছে। স্বতন্ত্র দেশের কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত খুঁজিয়া দেখ, পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত কোনও দিন নারী-জীবন পরিচালিত হয় নাই। এইজন্য অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন পুরুষেরা জ্ঞানানুশীলন অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ভক্তি-অনুশীলন করিতেন, রমণীরা তখন জ্ঞানশূন্যা হইয়াই ভক্তিস্রোতে ডুবিতেন। পুরুষেরা যখন হাঁটুর উপরে কাপড় পরিয়া, মুক্ত-পদে, কাঠ চেলা, গরুর জাব দেওয়া, বেড়া বাঁধা, হাট বাজার হইতে মাছ তরকারী বহিয়া আনা, কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য স্বহস্তে করিতেন, তখন স্ত্রীলোকেরাও গৃহকর্ম্মে যার পর নাই শ্রমশীলতার পরিচয় দিতেন। যখন গৃহস্থ পুরুষ "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" ও "সর্ব্বদেবময়োতিথিঃ" ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন, তখনই গৃহিণী এবং অন্তঃপুরবাসিনীরা অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; নিজেরা অভুক্তা থাকিয়াও অতিথিকে সুখাদ্য বস্তু আহার করাইতেন। সেই পুরাকালে ব্রত নিয়ম, তীর্থপর্য্যটন, দেবতার পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষগণ যেরূপ একাগ্রচিত্ত ছিলেন, গৃহলক্ষ্মীগণও সেইরূপ আত্মোৎসর্গ করিতেন। সেই জন্য বলিতেছি, পুরুষেরাই সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ, তাঁহাদের আদর্শে, তাঁহাদের শিক্ষায় স্ত্রীজাতি চিরদিনই পরিচালিত হইতেছে। প্রাচীনা মহিলাগণ যে সকল সদ্‌গুণ ও সদ্ভাবে অভ্যস্তা ছিলেন, পুরুষজাতিই তাহার প্রবর্ত্তক।

এখন আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, যদি বামাহিতার্থী মহাশয়েরা প্রাচীনা মহিলাদিগের সদ্‌গুণ ও সদ্ভাবসমূহ নব্যা মহিলাদিগের মধ্যে বিকাশিত করিতে চাহেন, তবে মহিলাদিগের শিক্ষক ও সহায় স্বরূপ পুরুষগণই তাঁহাদিগের মধ্যে সেইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে এবং সেইরূপ শিক্ষা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা এক প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, অন্য প্রকার শিক্ষা দিবেন, অথচ স্ত্রীলোকেরা তৃতীয় প্রকারে গঠিতা হইবে, ইহা আশা করা বোধ হয় সঙ্গত নহে। যে প্রাচীনা মহিলাদিগের জন্য তাঁহারা আক্ষেপ করিতেছেন, আজিকার দিনে ঠিক সেই প্রাচীনা মহিলাদের আবির্ভাবে যে বঙ্গবাসী প্রকৃত পরিতৃপ্ত হইবেন না, তাহাও স্থির নিশ্চয়। আজিকার—ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিতেছি না, সাধারণের কথাই আলোচ্য—আজিকার এই বিদেশী জ্ঞানালোক প্রাপ্ত, রুচিমান্, অলস, আশু-সুখ-পরায়ণ, চাকরি-অনুসন্ধিৎসু, বায়রণ-জয়দেব-আবৃত্তিকারী, সুকুমার যুবকগণের গৃহে, গোময়-লেপনকারিণী, বর্ণজ্ঞান-শূন্যা, কুসংস্কার-পরায়ণা, কলহপ্রিয়া রমণীদিগের আবির্ভাব হইলে তাঁহারা কি প্রকৃত সুখী হইতে পারেন? অথবা আজিকার এই টেরি-ফিরাণো, ছড়ি ঘড়ী, চসমাওয়ালা, কালেজের উচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত যুবকের বাম পার্শ্বে, আমাদের

প্রপিতামহীর সময়ের সেই ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তৈলনিষিক্ত কেশদামে চূড়া-বাঁধা, প্রশস্ত সিন্দূরে সীমন্ত ও ললাট আলো করা, উল্‌কিতে মুখ নাসিকা বিচিত্রিতা, বড় বড় মাদলীমালা গলায় পরা, বাউটী পৈঁছে বাঁকমল প্রভৃতি ভূষণ-ধারিণী, একহাত পাড়্‌ওয়ালা রাঙা পেড়ে শাড়ীতে জানুর উপরিভাগ আচ্ছাদন-কারিণী, পূর্ণচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ নথে চন্দ্রানন-শোভিনী একজন "তিলক-মণি" নাম্নী সুন্দরী স্থান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, সেই নব যুবক বাঙ্গালী জন্মে সহস্র ধিক্কার দিয়া এক লম্ফে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করেন!—আমরা এতটা সাহস করিয়া লিখিতেছি বলিয়া কে আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাই বা কি জানি?

বস্তুতঃ এক বৃক্ষের ত্বক্ অপর বৃক্ষে যোড়া দেওয়ার চেষ্টা যেমন দুরূহ, সেই-রূপ এক সময়ের লোককে অন্য সময়ে প্রচলন করাও দুরূহ। পরিবর্ত্তন জগতের অখণ্ডনীয় নিয়ম। তবে সত্য যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, সদ্ভাব সদ্‌গুণ সকলও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়, যুগে যুগে অক্ষয়। বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত বঙ্গমহিলাদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি, তাঁহাদের জাতীয় সদ্ভাব এবং সদ্‌গুণসমূহ বিকাশ করিতে পারিলে, প্রাচীনা মহিলাদিগের মত তাঁহারা শ্রমশীলা, ভক্তিমতী, সেবাপরায়ণা ও সহিষ্ণু হইলে, তাঁহাদের সংসারের এবং নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। এই মহতী সাধনাই এদেশে বিশেষ আবশ্যক। বামাহিতার্থিগণ সেই বিষয়ে চেষ্টা করুন।

লেখিকা
শ্রীমা—

নবীন ভারতী।

(৬)

এক পর্ব্বতে এক মহারণ্য, তাহাতে অনেক ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য নানা লোক নানা উপায় করিতেছে, কিন্তু সব বিফল হইতেছে। কেহ লাঠি সোঁটা লইয়া বনের নানা দিকে আঘাত করিতে লাগিল—২।১টা জন্তু মরিল, অন্য-গুলি আরও ভয়ঙ্কর হইয়া আসিয়া আক্রমণকারীকে বধ করিল। কেহ কেহ অস্ত্র ও গোলাগুলি লইয়া জন্তু শিকার করিতে লাগিল—কয়টা মারিবে এবং কতক্ষণ বৃহদরণ্যে যুঝিবে? তাহাদেরও দশা সেইরূপ হইল। বন যে ভয়ঙ্কর, সেই ভয়ঙ্কর রহিল। দৈবযোগে একদিন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" পর্ব্বতে কেমন করিয়া আগুন ধরিল—ক্রমে চারি দিক্ দাবানলে বেড়িল, উত্তপ্ত পর্ব্বত হইতে হিংস্র জন্তু

সকল প্রাণভয়ে চারি দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তখন অরণ্য সকল দেখিতে দেখিতে দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল এবং সেই অনলে জন্তু সকলও নিঃশেষিত হইল। পর্ব্বত পরিষ্কার হইয়া সুগম ও নিরাপদ স্থান হইল।

আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে দুর্গম বিষয়-চিন্তা অরণ্যমধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অনেক হিংস্র জন্তুর বাস। সাধক আত্মশক্তিতে ইহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রয়াসী হয়। এক রিপুকে দমন করে, অন্য রিপু প্রবল হয়, সংগ্রাম করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, রিপু দমন—ইন্দ্রিয়জয় হয় না। কিন্তু যখন ঈশ্বরকৃপায় হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যানল ধরে, তখন আর কিছুই করিতে হয় না, সমুদায় দুশ্চিন্তা দগ্ধ হয় এবং সকল বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আগুনে হৃদয়কে উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে পারিলে আর কোনও রিপু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সাধক নিরাপদে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়।

(৭)

এক ধনী অনেক ভূসম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি আপনার এক উদ্যানে এক মালী নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন "দেখ বাপু! আমার এই উদ্যানটী তোমার জিম্মায় দিলাম। ইহার আলী আটন বজায় রাখিয়া ভূমি উৎকৃষ্টরূপে কর্ষণ করিয়া যত উৎকৃষ্ট ফুল ও ফল উৎপন্ন করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে এবং যে কিছু ফুল ফল হয়, তাহা আমার নিকট উপস্থিত করিবে, তোমার ভরণ-পোষণ ও উপযুক্ত পুরস্কার দানের ভার আমার উপর। মালিটী বড় বিশ্বাসী। আপনার সুখ ও আরামের প্রতি কিছু দৃষ্টি না করিয়া প্রাণপণে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত হইল। তাহার যত্ন ও পরিশ্রমে উদ্যানটী স্বর্ণক্ষেত্রের মত হইল—পুষ্পবৃক্ষ সকল দিন দিন ফুল দেয়, প্রত্যেক ঋতুর ফলফলকর তরু সকল হইতে উৎপন্ন হয়। মালী নিজে তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া প্রতিদিন ফুল ফল মাথায় করিয়া প্রভুর দ্বারে উপস্থিত হয়। প্রভু মালীর ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট। সে যে সকল ফুল ফল আনে, তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাছিয়া তাহাকে দেন। কেবল তাহা নহে। তাঁহার অনেক উদ্যান হইতে অনেক ফুল ফল আইসে, মালী যাহা কখনও দেখে নাই তাহা হইতেও ভাল ভাল ফুল ফল তাহাকে দেন। মালী মনিবের অন্নে প্রতিপালিত হয়, আবার আশাতীত পুরস্কার লাভ করিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সে আরও বিশ্বাসী হইয়া প্রভুর উদ্যানের পাট করে এবং তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া আপনিও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। প্রভু এইরূপ বিশ্বাসী ভৃত্যকে অবশেষে আপনার গৃহে আনিয়া আপনার রত্ন-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ করিলেন এবং, যত অর্থ তাহার প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করিতে অনুমতি দিলেন।

ঈশ্বর যাহাকে যে সম্পত্তি দিয়াছেন, সে বিশ্বাসী হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিলে এবং তাহার সুফল তাঁহাকে অর্পণ করিলে তিনি তাহাকে এইরূপে পুরস্কৃত ও সুখী করিয়া থাকেন।

দয়ানন্দ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিছুদিন চেতন মঠে অবস্থিতির পর দয়ানন্দ বারাণসীতে গমন করেন। তথায় প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বারাণসীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা দয়ানন্দের ধর্ম্ম-পিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে নর্ম্মদা-তীরবাসী পরমানন্দ পরমহংসের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। দয়ানন্দ পরমহংস দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদান্তসার ও বেদান্ত-পরিভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি প্রকৃতই সন্ন্যাসী হন। তাঁহার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম হইল।

ইহার পর তিনি ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দের নিকট যোগাভ্যাসের জন্য গমন করেন। ইহাঁর নিকট কিছুদিন শিক্ষার পর তিনি যোগের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার জন্য আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে দুইজন যোগীর নিকট গমন করিয়া যোগের গূঢ় রহস্য পরিজ্ঞাত হন। যোগের আর কোনও নূতন উপায় আছে কি না, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে গমন করেন। এখান হইতে তিনি ১৮৫৫ অব্দে হরিদ্বারের যোগী সন্ন্যাসিগণের মহামেলায় যোগদান করেন।

হরিদ্বার হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দয়ানন্দ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মহাত্মাদিগের অনুসন্ধান করিতে থাকেন।

দয়ানন্দ ক্রমে ক্রমে সংসারের সমুদয় ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জীবনধারণের জন্য খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন, এই জন্য প্রথম প্রথম দুগ্ধ ও অন্ন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি অন্নও পরিত্যাগ করেন, কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত দয়ানন্দ হিন্দুর অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ অবিশ্বাস্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। বেদচতুষ্টয় ও উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ ছিল না।

দয়ানন্দ যে শুদ্ধ বক্তৃতাদি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা নহে; কয়েকখানি গ্রন্থরচনায় তাঁহার শেষ

জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দী ভাষায় বেদের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অর্দ্ধাংশ অনুবাদ করিবার পর কালগ্রাসে পতিত হন। "ঋক্‌বেদাদিভাষ্য-ভূমিকা" নামক তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার উপদেশের সার সংকলিত হইয়াছে। "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

১৮৮৩ অব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে দয়ানন্দ আজমীরে জীবনলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়া যোধপুরের মহারাজা তাঁহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকদিগের বিশ্বাস, তাঁহার সভাসদ পণ্ডিতেরা ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত একপ্রকার বিষ-প্রয়োগে দয়ানন্দের প্রাণবিনাশ করেন। যাহা হউক মহা সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চারি মণ চন্দনকাষ্ঠ, চারি মণ ঘৃত ও দুই সের কর্পূর তাঁহার চিতায় প্রদান করা হয়। যখন তাঁহার দেহ চিতার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার শিষ্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিতেছিলেন।

দয়ানন্দ আপন ইচ্ছামত হিন্দু শাস্ত্রের অর্থ করিতেন। তাঁহার মত-বিরোধী-দিগকে তিনি মূর্খ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্যকারগণ তাঁহার নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি বেদকে অপৌরুষেয় ও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতেন। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয়ই বেদপাঠে অবগত হওয়া যায়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে আর্য্য-সমাজ নামে যে সকল ধর্ম্মসমাজ আছে, দয়ানন্দ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারই ঐ সকল সমাজের উদ্দেশ্য। শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

ঈশ্বরের নামাবলী।

শ।

শক্ত, শক্তি, শক্তিদাতা, শক্তিমান্, শক্তিশালী, শক্তিরূপী, শঙ্কর, শঙ্কাহীন শঙ্কু, শঠ-দমন, শতকোটিনামা, শত্রুঞ্জয়, শত্রুপালক, শত্রুহীন, শব্দপ্রমাণ, শব্দশক্তি, শব্দহীন, শব্দাতীত, শম্ভু, শরণ, শরণং শরণানাং, শরণাগত-পালক, শরণাগত-বৎসল, শরণী, শরণ্য, শরেণ্যং, শর্ম্মদ, শশি-কান্ত, শশিভূষণ, শস্যফলদাতা।

শাতনভয়নিবারণ, শান্ত, শান্তচেতা, শান্তাত্মা, শান্তি, শারদা, শালীন, শাশ্বত, শাসক, শাস্তা, শাস্তিদাতা, শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র-সিদ্ধ, শাস্ত্রাতীত।

শিক্ষক, শিক্ষণীয়, শিক্ষয়িতা, শিক্ষা-দীক্ষাগুরু, শিথিলতাহীন, শিরঃ, শিরো-মণি, শিরোরত্ন, শিল্পকার, শিল্পিক, শিল্পী, শিল্পীশ, শিব, শিবকর, শিবঙ্কর, শিবগতি, শিবতর, শিবদ, শিষ্ট, শিষ্টি-কর্ত্তা।

শীঘ্রকর্ম্মা, শীঘ্রগ, শীঘ্রদৃষ্টি, শীতকর, শীতি, শীতল, শীতলকারী, শীর্ষস্থানীয়।

শুক্র, শুক্রকর্ম্মা, শুচাপহ, শুচি, শুচিকারী, শুদ্ধ, শুদ্ধকর্ম্মা, শুদ্ধদৃষ্টি, শুদ্ধধী, শুদ্ধস্বভাব, শুদ্ধিকারী, শুভ, শুভকর, শুভদ, শুভদাতা, শুভ্র, শুভ্রসত্যস্বরূপ, শুশ্রূ।

শূদ্রার্য্যসমদর্শী, শূন্যাদিমধ্যান্ত, শূরশ্রেষ্ঠ, শৃঙ্খলভঞ্জন, শৃঙ্খলাবাচী, শৃঙ্খলারক্ষক, শেষ, শেষাক্ষর, শেষগতি, শৈথিল্যহীন, শৈলেন্দ্ররাজ, শোকহর, শোকনাশন, শোকনোদন, শোকমুক্ত, শোকহারী, শোকাপনুদ, শোকাপহন্তা, শোধক, শোভন, শোভনীয়, শোভাকর, শোভাময়, শৌভ, শৌরি, শ্রবণহীন, শ্রয়ণ, শ্রবণ-মঙ্গল।

শ্রদ্ধাদাতা, শ্রদ্ধেয়, শ্রান্তিহীন।

শ্রী, শ্রীকান্ত, শ্রীদ, শ্রীধর, শ্রীনাথ, শ্রীপতি, শ্রীনিবাস, শ্রীবাস, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ, শ্রীহরি, শ্রুতবান্, শ্রুতি-বিষয়, শ্রুতিসিদ্ধ, শ্রুতিসুখ, শ্রেয়ঃ, শ্রেয়স্কর, শ্রেয়োদাতা, শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠগুণ, শ্রেষ্ঠাশ্রম-সেবিত, শ্রোতব্য, শ্রোতা, শ্রোত্রস্থ শ্রোত্রং, শ্লক্ষ্ণ, শ্লীল, শ্লেষক, শ্বশ্রেয়স, শ্বপাকতারণ।

বন্যনারী-সঙ্গীত।

ছোট নাগপুরের বন্যনারীদিগের সম্বন্ধে আমরা একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাইয়াছি, এবার স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না। বন্যনারীদিগের একটী সঙ্গীতমাত্র এবার দেওয়া গেল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন এ প্রদেশে বড়ই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সে সময় দলে দলে বন্যনারীগণ শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বাড়ী বাড়ী নিম্নলিখিত শোকপূর্ণ দুর্ভিক্ষ-সঙ্গীত গাইয়া ভিক্ষা লইত। ইহাদিগের স্বর মধুর এবং সঙ্গীতে বিশেষ পটুতা আছে।

দুর্ভিক্ষ-সঙ্গীত।

মড়ুয়া সড়িয়ে গেল্‌ব,
জোঁধারি(১) দাহাই(২) গেল,
(আরে) মকেয়া রাখ্‌লে বড়ি মান হো।
হায় উধো!(৩) অবপৎ রাখু ভগবান্।
শাগ্ পাত্‌কে পোষল জান,
(আরে) বয়েল বেচ্‌কে দেলু মান,
(আরে) ভইও নহি মানথহি(৪) দিওয়ান হো।(৫)
হায় উধো! আব পথ(৬) রাখু ভগবান্।

অর্থাৎ মেড়ুয়া পচিয়া গেল (বন্যা ও অতিবৃষ্টিহেতু), জনেরা বন্যার স্রোতে ও বৃষ্টির জলে ভাসিয়া গেল; ওরে মকাই (নষ্ট না হওয়ায়) আমাদের বড় মান রাখিয়াছে; হায় বিধি! এ যাত্রা ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা কর। শাক, পাতার দ্বারা পালিত এ জীবন, ওরে বয়েল (বলদ) বিক্রয় করে ইজ্জত দিলাম, তথাপিও

(১) জনেরা—মোকাই বিশেষ; (২) ভাসিয়া যাওয়া।

(৩) বিধি; (৪) মানে না; (৫) tax Collector; (৬) যাত্রা; পন্থা।

ট্যাক্সের দারোগা (tax collector) মানে না। হায় বিধি! এ যাত্রা রক্ষা কর ভগবান্।

শুনিতে পাই যখন জননীগণ শিশুদিগকে বুকে করিয়া সমস্বরে এই মর্ম্মবিদারক সঙ্গীত করিত, তখন সকলের চক্ষু দিয়া অজস্রধারে জল বহির্গত হইত। তৎকালীন ডেপুটী কমিসনার তাহাদের এই মর্ম্মভেদী সঙ্গীতে অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে স্বয়ং টাক্স দিয়া কাহারও বা টাক্স মাপ করিয়া গরিবদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশ হইতে চট্টগ্রাম জেলাকে ছিন্ন করিয়া আসাম প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইবে এবং উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যপ্রদেশভুক্ত করা হইবে। মধ্যপ্রদেশকে একটি নূতন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

২। ভারতের অনেক স্থানে এ বৎসর অনাবৃষ্টি। আর ইংলণ্ডে এরূপ অতিবৃষ্টি হইয়াছে যে লোকে কখনও সেরূপ দেখে নাই।

৩। ইংলণ্ডেশ্বর ও রুসিয়েশ্বর দেন্মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে আসিয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন। দেন্মার্ক আমাদের রাজার শ্বশুরবাড়ী। তত্রত্য বর্ত্তমান রাজা ক্রিশ্চিয়ান রাজদ্বয়ের আতিথ্য করিবেন।

৪। ফ্রান্সদেশের এক ব্যক্তি ২টী পোষা সিংহ লইয়া বেলুনে কতকদূর উঠেন। সিংহদ্বয় ধড়ফড় করাতে বেলুন নামাইয়া লন। কিন্তু সিংহ দুটি নামিয়াই দম আটকাইয়া মরিয়া যায়।

৫। আবগারী বিভাগে গতবর্ষে ১,৫৭৮০,৭২৯ টাকা আয় হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭,৬২,৪১২ টাকা বাড়িয়াছে। গাঁজাতেই প্রায় ২ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ইহার অপেক্ষা দেশের অধোগতির প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

৬। রুষ ও জাপানের মধ্যে যে গোলযোগ হইয়াছে, জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহা মিটাইবার জন্য সেণ্ট পিটার্সবর্গে তাঁহাদের মন্তব্য সহ পত্র পাঠাইয়াছেন এবং তথায় রুষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

৭। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী অনরেবল সি ডবলিউ ম্যাকফার্সন অনরেবল সি ডবলিউ বোল্‌টনের স্থানে মূকবধির বিদ্যালয়ের-কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন ঘোষ

এ বৎসরের মান্দ্রাজ কন্‌গ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন।

১০। ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ১১১৭ জন লোক কার্য্যক্ষেত্রে সাহায্য পাইতেছে।

১১। মাসিডোনিয়াতে একদল নারী-যোদ্ধা তুরস্কের বিরুদ্ধে রণরঙ্গে মাতিয়াছেন। ইভনেভ তাহাদের পরিচালিকা।

১২। গত ২৯এ আগষ্ট বোম্বাই নগরে মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি-কল্পে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

১৩। বোম্বাইবাসী গোবর্দ্ধন দাস ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় শ্রীরামপুরের কটন মিল ক্রয় করিয়াছেন।

১৪। বড়লাট সেপ্টেম্বরের শেষে কুমাউন শৈলে ভ্রমণ করিবেন। পরে অক্টোবর মাসে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা প্রভৃতি রাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসিবেন।

বামারচনা।

জননী।

জননীগো!
বেঁচে আছি আমি যাই বেঁচে আছ তুমি,
নতুবা সে কোন্ দিন,
মৃত্তিকায় হতো লীন,
এ দেহ জীবন প্রাণ হতো সমভূমি।১
প্রসূতি আমার তুমি, তব সুতা আমি,
আপন শোণিত দিয়ে,
সৃজিলে এ জীব-হিয়ে,
বহিলে গো গুরুভার সদা দিবা যামী॥২
ছিল না শরীরে বল আকাঙ্ক্ষা পরাণে,
হাত পা অসাড় ছিল,
চক্ষু কর্ণ না ফুটিল,
পেয়েছি সকলি তব স্তন-সুধা-পানে॥৩
তোমার করুণা রসে বিকাশিল কায়া।
স্নেহ প্রেম সুখ আশা,
জ্ঞান বুদ্ধি শত তৃষা,
একে একে উপজিল যত স্নেহ মায়া।৪
তোমার সাধের ফুল পরাইলে মাথে।
সেই সে সুবাস পেয়ে,
স্বরগ আনন্দ লয়ে,
সংসারে ফেলিনু পদ কত আশা সাথে॥৫
তোমার গৌরবরশ্মি উজলি নয়নে
দেখাইল এ ধরণী
কেবল সুখের খনি,
পূরাল মনের সাধ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে॥৬
প্রভাতে উদিল রবি রঞ্জিয়া গগন।
ঊষার বিমল হাস,
লয়ে নব অভিলাষ,
জাগায় সুষুপ্ত প্রাণে ভবিষ্য স্বপন॥৭
ফুটিল কাননে ফুল কত সুশোভন!
ছুটিল সুগন্ধভার,
সুমন্দ হিল্লোল তার,
মাতাল অন্তর প্রাণ না যায় বর্ণন॥৮
ভাবিতাম এ সুখের নাহি অবসান!

না বুঝি সৃষ্টির খেলা,
এ ভব সৌন্দর্য্য মেলা
চির দিন সমভাবে রবে বর্ত্তমান॥৯
জানি না সংসারে আছে কত ইন্দ্রজাল।
সকলি কৃত্রিম ছায়া,
মোহ ফাঁদ—বলে মায়া,
স্বার্থ-বিষভরা ধরা কপট জঞ্জাল॥১০
তুমি মা সারল্যময়ী এ ভব-ভবনে।
পাইয়া তোমার শিক্ষা,
তব স্নেহে পেয়ে দীক্ষা,
সেই পুণ্য চিত্রখানি জাগে আঁখি মনে।১১
আত্মপর ভেদাভেদ নাহি ব্যবধান।
দয়াবতী তুমি সতী
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
কোমল কমলদামে গড়া হৃদিখান।১২
স্নেহ মন্দাকিনী খেলে ও হৃদি স্বরগে।
শীতলিতে তপ্ত প্রাণ,
অযাচিতে কর দান,
তুমি গো অশ্রান্ত চির হেমন্ত সুভগে॥১৩
তাই আমি আছি বেঁচে তুমি আছ বলে।
এখনও দাঁড়ায়ে থাকি,
ধরাপরে পদ রাখি,
এখনও রয়েছে মাথা তব ছায়াতলে॥১৪
ধরার বন্ধুর পথ বাধে গো চরণে।
তুমি মা আঁখির দৃষ্টি,
দুর্ব্বলের ভর যষ্টি,
দ'লে যাই কাঁটা খোঁচা ও নাম স্মরণে।১৫
জনক গেছেন চলে রেখে তব কোলে!
তুমি মাগো জনয়িত্রী,
শান্তিময়ী শুভদাত্রী,
নিশ্বাস শোণিতাধারে তব দয়া খেলে॥১৬
পূরায়েছ সাধ আশা যেখানে যা মিলে।
দিয়াছ অশেষ দান,
সোণা রূপা মূল্যবান,
সাজালে মনের সাধে নব ঊষাকালে॥১৭
ক্রীড়ার পুতুল সম ভাই বোন দিলে।
জীবনের সংস্কার,
উদ্বাহ সুখের সার,
জীবনে নবীন যুগ পতিপ্রেম পেলে॥১৮
হাত ধরে লয়ে গেলে বীণাপাণি-দ্বারে।
জানি না কপাল-দোষে,
বিদ্যাদেবী রন রোষে,
একটি কটাক্ষ পাতে চাহে না গো
ফিরে॥১৯
তাই ত পূরে না আশ—মিটে নাই ক্ষুধা।
এখনও অক্লান্ত হয়ে,
সেই বর চেয়ে চেয়ে,
পান করি নিত্য নিত্য আকাঙ্ক্ষার
সুধা।২০
সারিয়াছ একে একে কর্ত্তব্যের কাজ।
যেখানে যা শোভা পায়,
দিয়াছ মা পায় পায়,
তবু গো অতৃপ্তি কেন পরাণের মাঝ?২১
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ পথ সকলি দেখালে,
আবার বলি গো আজ,
চাহিতে নাহিক লাজ,
আমিত আতুর দীন এ জগতীতলে॥২২
অবোধ অজ্ঞান আমি বাসনার দাস।
সতত কামনা জাগে
মরণের আগে ভাগে,
ও চরণ সুধা দানে মিটাবে পিয়াস॥২৩
যে দিন করালকাল শিয়রেতে আসি

দাঁড়াবে ভীষণ বেশে
বিকট বদনে হেসে,
তুমি মা থেকো গো কাছে সর্ব্বভয়-
নাশি ॥২৪

ঐ পদ-রজ মাখি শীতল ধরণী বুকে
ঘুমাইব চির-ঘুমে,
শান্তির আশ্রয়ভূমে,
লভিয়া আশীষ তব কাটাইব চির-সুখে ॥২৫

শ্রীনি—

জ্যোৎস্নার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ কামনা।

তব আশীর্ব্বাদী এই পবিত্র প্রসূন,
সোহাগে যতনে স্নেহে লয়েছি হৃদয়ে।
দয়াময় এ প্রার্থনা করি নিশিদিন,
তোমারি ছায়ায় উঠে বিকশিত হয়ে।
ধরায় জানায় সর্ব্বে পরশ বারতা,
প্রাণেতে জাগায়ে দেয় পরশ তোমার।
শূন্য প্রেমে পূর্ণ হোক তব পবিত্রতা,
সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাক সর্ব্বাঙ্গে উহার।

পৃথিবীর পাপ-ম্লান ছায়াটি আসিয়া,
কখন না করে স্পর্শ অমূল্য হৃদয়,
যে ভাবে দিয়াছ ওরে ধরাতে আনিয়া,
সেই ভাবে পরীক্ষায় হোক সর্ব্বজয়।
চির-কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ আজি মোর প্রাণ,
তোমারেই সমর্পিনু তোমার এ দান।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সে কথা তুলনা!

১

গেছে ফুরাইয়ে গেছে সেই একদিন।
স্বপনের মত সব হয়েছে বিলীন।
ভুলেছি সে সব তার, সে কথা তুলনা আর,
দিও না হৃদয়ে ব্যথা আনি তার চিন,
ফুরায়েছে সেই সব সুখময় দিন।

২

ভাবিলে সে সব কথা—থাকে না ক প্রাণ,
স্বপনের মত হ'য়ে গেছে অবসান।
সে কথা কি ভোলা যায়, সবিত হৃদয়ে হায়!
রহিয়াছে স্তরে স্তরে আঁকা সে সকল।
ভুলেছি কি? মিছে কথা সুধু সে কেবল!

৩

মনে করি ভুলে গেছি থাকি নানা কাজে,
কিন্তু সে সদাই মোর হৃদয়ে বিরাজে।
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে, সে মোর মরমতলে,
ঘুমালেও সদা তারে দেখি গো স্বপনে,
কখন কি ভোলা যায় হৃদয়ের ধ'নে?

৪

ভুলে গেছি মনে ক'রে—থাকি এই ভুলে,
দিও না হৃদয়ে ব্যথা আর তাহা তুলে।
পুনঃ গো সে কথা তুলে, দিও না অনল
জ্বেলে
অভাগীর ভাঙ্গা বুকে সহিবে না আর,

কিছু নাই এ হৃদয়ে সুধু ছাই সার।

৫

গেছে যাহা ফুরাইয়ে ফিরিবে না আর।
দিও না যাতনা তুলে সে কথা আবার।
হ'য়েছে যা মোর হোক, আমারি পরাণে
রোক
তোমরা দিও না ব্যথা তুলে তা আবার।
বেশ আছি ভুলে গেছি সে কথা তাহার!

৬

কি হবে সে কথা তুলে তুলোনা ক ফের,
যা হবার হ'য়ে গেছে ফল করমের।
সে কথা কহিয়ে ফিরে, কেন গো
জ্বালাবে মোরে,
কি সুখ লভিবে আমি পাইলে যাতনা?
তাই বলি বার বার সে কথা তুল না।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী,
ফরিদপুর।

আত্ম-সমর্পণ।

আমি মুখে বলি সদা ভালবাসি তোমা,
কার্য্যেতে করি গো আন।
তাই সাধুতার ভাব বাহিরে দেখায়ে
করি যে কতই ভান॥
ভবে লোক-আঁখি হতে প্রতারণা জাল
লুকাই যতন করে।
হায়! তোমার নিকটে কেমনে লুকা'ব
যা আছে হৃদয় ভরে॥
আঁধারে, আলোকে তোমার নয়ন,
জ্বলিছে মণির মত।
তুমি নির্জ্জনে বসিয়া দেখিতেছ সদা
মম আচরণ যত॥
আমি হেলা করি হায়! করেছি ক্ষেপণ
এই জীবনের বেলা।
এবে জীবন সন্ধ্যায় ছাড়ি গেছে সবে,
কাঁদিছি তাই একেলা॥

শুনি অধম নারকী তোমার নিকটে
নিরাশ হয় না কভু।
যদি কাতরেতে ডাকে হৃদি মন খুলে
"দয়াময় দীন-প্রভু"॥
হায়! মিথ্যা কপটতা বিষম কণ্টক,
বিঁধিয়া হে নাথ কত।
মম অমূল্য জীবন কুসুম ভেদিয়া
করিছে শতেক ক্ষত॥
(আজি) ব্যথা-ভরা বুক, নয়নের জল
লইয়া তোমার পাশে,
অপরাধী সম রয়েছি দাঁড়ায়ে
দারুণ লজ্জা ও ত্রাসে॥
আর সত্যেরে ঢাকিয়া মিথ্যা আবরণে
করিব না কোন কাজ,
করি আত্মসমর্পণ—ও পদ কমলে।
নিশ্চিন্ত হইনু আজ॥

শ্রীরাজলক্ষ্মী ঘোষ, মাধপুর।

মর্ম্মগাথা।

(১)

নিরাশা-জড়িত মম অশান্ত জীবন
খুঁজিয়াছে বহুদিন ব্যথিত হৃদয়ে,
সংসার মরুর মাঝে শান্তি নিকেতন।
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ দেখেছে সভয়ে—
মর্ম্মভেদী অন্ধকার মহা ভয়ঙ্কর!!
বিস্তারি বিরাট পক্ষ ঘৃণা অপমানে,
আবরিতে আসে মোর হৃদয়-কন্দর :
ব্যাকুলে ডাকিনু প্রভু! সজলনয়নে।
আশার আশ্বাসে পূর্ণ,—অমৃত ঝঙ্কারে—
বিতরি অনাথে তাঁর অভয় চরণ ;
কহিলেন "দেখ বৎস! মহা অন্ধকারে—
বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, তব শান্তি নিকেতন।"

(২)

অধীর পরাণ মম সংসার গহনে,
সুখের মোহন মন্ত্রে হইতে দীক্ষিত
হইল উৎসর্গীকৃত আশা-প্ররোচনে,
সম্মুখে দেখিল কিন্তু হইয়া বিস্মিত—
আশার নিকুঞ্জে তার ঘন কুজ্ঝটিকা,
প্রলয়ের মহাস্রোতে করেছে প্লাবিত
ব্যাপিয়া জীবন-ক্ষেত্র মহা বিভীষিকা!!
বিষম বিষাদে ভারে আবরিয়া চিত্ত।
কাতর ব্যথিত প্রাণ, নিরাশা তিমিরে,
মহিমার দীপ্তালোকে মহা সমুজ্জ্বল—
অভয় সঙ্গীত কার শুনিয়া সুধীরে,—
সস্মিতে সানন্দে আহা মুছি অশ্রুজল।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

স্মৃতি।

কি গভীর বেদনায় হৃদয় দহিছে হায়!
প্রকাশে নীরব ভাষা যেন প্রাণে কি
পিপাসা!
অব্যক্ত সে ভাব গূঢ় কল্পনিতে হই মূঢ়,
যেন কারে প্রাণ চায়, খুজিয়াও নাহি পায়।
পাই পাই ধরি তারে ধরিতে সরিয়া পড়ে।
প্রাণে প্রাণে দেখা হয়, আবেশে বিহ্বলময়।
আনন্দে শিহরে প্রাণ, সচকিতে হয় আন,
চির-পরিচিত সেই কিছুতেই ভুল নেই।
সেই প্রীতি প্রাণচোরা সে প্রেমে চিত
বিভোরা।

সে প্রিয় না হবে যদি দাস্য সখ্য মধুরাদি
পঞ্চভাবে কেন প্রাণ স্ফুরিছে ধরিতে তান?
মোহন মাধুরী সেই এই সেই সেই এই।
স্বরগে মরতে দেখা দিতেছ, দিও হে সখা!
জীবনে মরণে—হাত ধরে থাক সাথে সাথে।
যদি পুনঃ জন্ম লই, জন্মি যেন নারী হই।
পুনঃ সে পাইয়া সখে! ঘুচাইব মনো দুঃখে।
না হয় জনম যদি যথা তথা নিরবধি
মুক্তি বা স্বর্গের পথে থেক সখে! সাথে
সাথে।

শ্রীঅম্বিকা সেন।

Registered No. C. 134

No. 483. November, 1903.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৩ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩১০ ; নবেম্বর, ১৯০৩। } ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৩
২। রচনা-রীতি ১৯৪
৩। দাহ না সমাধি ?... ... ১৯৬
৪। সাধুবচনসংগ্রহ (পদ্য) ... ১৯৮
৫। ঐতিহাসিক উপন্যাস ... ২০০
৬। ভাই ফোঁটা ২০৩
৭। ধর্ম্ম-রাজ্য (পদ্য) ... ২০৮
৮। সংসার-লীলা (পদ্য) ... ২০৮
৯। বন্য নারী ২১০
১০। অপরাজিতা (পদ্য) ... ২১৩
১১। গ্রাম্য পাশ্চাত্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ২১৫
১২। ঈশ্বরের নামাবলী ... ২১৮
১৩। নূতন সংবাদ ২১৯
১৪। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ২২০
১৫। বামারচনা—আহ্বান ... ২২১
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ... ২২২
ভাইদ্বিতীয়া ২২৩
কাঙ্গালের আবাহন ... ২২৩
একটী নবজাত শিশুর
জন্মোপলক্ষে ... ২২৪

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-পক্ষেই
বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়।

বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ ইহাতে আরাম হয়, অথচ ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন যাহার আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-অপরিষ্কারে, ধাতুদৌর্ব্বল্যে, অগ্নিমান্দ্যে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, সর্দ্দি-কাশিতে, হাত-পা-চক্ষুজ্বালায়, মাথা-ধরায় ও ঘোরায়, ঠাণ্ডা-লাগায়, রাত্রি-জাগায়, পথ-চলায়, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা তাহার মহৌষধ।

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর, অমাবস্যা-পূর্ণিমার বাতজ্বর, বিষমজ্বর, ঘুষঘুষেজ্বর, দৌকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা মহৌষধ। বিজয়া বটিকা আজ সর্ব্বত্র আদৃতা, ইংরাজ নরনারীও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১॥৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

সতর্কতা! বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। গ্রাহকগণ সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া যায় না।

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭৯নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 483. November, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৩ সংখ্যা। কার্ত্তিক, ১৩১০; নবেম্বর, ১৯০৩। ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মন্ত্রিসভা-পরিবর্ত্তন— চেম্বার্লেন-প্রমুখ স্বাধীন বাণিজ্যের বিরোধী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিসভার (Cabinet) নূতন সভ্য হইয়াছেন:—

ব্রডরিক—ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী; অষ্টিন চেম্বার্লেন—ধনাধ্যক্ষ (Chancellor of the Exchequer); আলফ্রেড লিটল্‌টন—ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী; আর্গোল্ড ফষ্টার—সামরিক সেক্রেটারী; গ্রেহাম মরে—স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী এবং লর্ড ষ্টান্‌লী—পোষ্টমাষ্টার-জেনারল।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড কুর্জন কয়েকটি সহচরসহ গত ২৫এ সেপ্টেম্বর ভুবাউন ভ্রমণে গিয়াছেন। তিনি শীঘ্র পারস্যোপসাগর দর্শনে যাইবেন।

তুরস্কের বিপদ্—ইহার নানা রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, এদিকে রুসিয়া প্রভৃতি ইহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। সুলতান খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্ট সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মাসিডোনিয়ার সংস্কার-সাধনার্থ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার সভ্য একজন মুসলমান, ৪ জন খৃষ্টান এবং সভাপতি হিলমী পাসা।

দেশীয় চিফ্ জষ্টিস্—কলিকাতা হাইকোর্টে স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রথম প্রতিনিধি চিফ্ জষ্টিস নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার চার্লস আর্গোল্ড হোয়াইট বিদায় লইলে সার সাব্রামেনিয়া আয়ার তাঁহার স্থানে কার্য্য করিবেন।

রাজা রামমোহন রায় উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

রায়ের স্বর্গারোহণ স্মরণার্থ কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সিটী কলেজে যে সভা হয়, তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল ভূপেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছেন।

উদার-চিন্তাশীলদের সম্মিলন—গত ১লা হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমষ্টার্ডেম নগরে এই সভা হয়। বিখ্যাত ওলন্দাজ পণ্ডিত ডাক্তার উর্ট সভাপতির কার্য্য করেন। ভি, আর, সিন্ধ ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। সকল দেশের উদার-ধর্ম্মমতাবলম্বীদের প্রতিনিধি সকল উপস্থিত ছিলেন। কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

লর্ড সালিসবরীর উইল—তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকার অধিক। ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কন্যা লেডী সোয়েণ্ডোলেনকে লক্ষাধিক টাকা দিয়াছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তির অর্দ্ধ তাঁহার পুত্রগণ ও কয়েকটী বন্ধু। তাঁহার পত্নীর এ টাকা ছাড়া আরও অনেক নগদ টাকা ও ভূসম্পত্তি আছে।

বীরাঙ্গনা—ইংলণ্ডের অনতিদূরবর্ত্তী সিলী দ্বীপের সমুদ্রতীরে আলফ্রেড জেঙ্কিন্স নামে এক সাহেবের নৌকাডুবী হয়। ঐ দ্বীপের অধ্যক্ষের কুমারী ডেরিয়েন স্মিথ নাম্নী দুই কন্যা এক নৌকায় ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে তুলিয়া অর্দ্ধ মাইল পথ কাঁধে দড়ী করিয়া টানিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন।

রচনা-রীতি।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা-রীতি, নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ; যথা বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটী। এই কয়েকটি নামই কয়েকটি দেশের নাম হইতে উৎপন্ন। বিদর্ভ (বেরার), লাট (গুজরাট) ; গৌড় এবং পাঞ্চাল দেশ যে এক সময়ে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তাহা এই শ্রেণী বিভাগ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতি প্রচলিত ছিল তাহা নয় ; তবে কোন অজ্ঞাত কারণে বিভিন্ন রচনা-রীতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামে আখ্যা পাইয়াছে, এই মাত্র।

যে রচনায় কঠোর শব্দের যোজনা নাই এবং পড়িবামাত্রই যাহার অর্থবোধ হয়, সেই মাধুর্য্য এবং প্রসাদগুণযুক্ত রচনা বৈদর্ভী বলিয়া আখ্যাত। প্রাচীনকালের কালিদাসের রচনা এই বৈদর্ভী রীতির আদর্শ দৃষ্টান্ত। পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া যাঁহারা সরল ও সুবোধ্য পদ্ধতি পরিহার করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, সেকালে একালে বৈদর্ভী রীতিই শ্রেষ্ঠ

রীতি বলিয়া আদৃত। ভাবা যখন ভাব প্রকাশের জন্য, তখন সাহিত্যরচনার সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া, কদাচ কেহ কৃতী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত কবিতা বৈদর্ভী রীতির দৃষ্টান্ত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গলা কবিতায় সর্ব্বত্র বৈদর্ভী রীতি অবলম্বিত দেখিতে পাই।

শব্দাড়ম্বরপূর্ণ, সমাসবহুল রচনারীতি গৌড়ী আখ্যা পাইয়াছে। বীর-রসাদির রচনায় এই রীতি প্রশংসিত। শব্দের ঘটা থাকিলেই যে শ্রুতিকঠোরতা জন্মিবে, অথবা সমাস-যোজনা থাকিলেই যে অর্থ বুঝিবার পক্ষে ক্লেশ হইবে, তাহা নহে। ওজোগুণের সহিত প্রসাদ গুণের বিরোধ নাই ; এবং দুঃশ্রবত্ব একটী দোষ বলিয়া সকল রচনাতেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। সুকবি ভবভূতির রচনায় মাধুর্য্যাদি গুণ যথেষ্ট আছে ; কিন্তু তিনি প্রয়োজনমতে অনেক গৌড়ী রচনাও করিয়াছেন। একালের মেঘনাদবধ হইতে গৌড়ী রচনার অনেক দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যায়।

পাঞ্চালী রচনা বৈদর্ভী এবং গৌড়ী রীতির মিশ্রণ। বাণভট্টাদির রচনার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা এই উল্লেখমাত্রেই পাঞ্চালী রীতি কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। কবি হেমচন্দ্র কিয়ৎ পরিমাণে পাঞ্চালী রীতির অনুবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার ওজোগুণসম্পন্ন রচনা শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহাতে মাধুর্য্যের অভাব ছিল না।

গৌড়ী ডম্বর-বন্ধা স্যাৎ, বৈদর্ভী ললিত-
ক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেন, লাটী তু মৃদুভিঃ
পদৈঃ।

কেবল মৃদুল পদের সমাবেশই যে লাটী রীতির বিশেষত্ব, তাহা নহে। নিরর্থক "লতাকুঞ্জং গুঞ্জন্" লিখিলে সেটা কোন রীতির অন্তর্ভুক্ত হয় না, কেবল কুরীতির সৃষ্টি হয়। ভাবের উৎকর্ষ আছে বলিয়াই কবি রবীন্দ্র নাথের "তব নন্দন-গন্ধমোদিত" প্রভৃতি এত মিষ্ট। আদি, করুণ এবং শান্তরসপ্রধান রচনা ভিন্ন লাটী রীতি অবলম্বিত হইতে পারে না। বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে, এই রীতি অবলম্বন করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

রচনায় মাধুর্য্যের সমাবেশ অতি কঠিন হইলেও, নূতন লেখকেরা উহার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বালকেরা সর্ব্বদাই শর্করাপ্রিয়। মাধুর্য্যের সৃষ্টির প্রয়াসে উপহাসাস্পদ না হইয়া বরং যদি গ্রাম্যতা, দুঃশ্রবত্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সরল সুযোধ্য রচনা করিবার জন্য উদ্যোগ করা যায়, তাহা হইলে অধিক ফলবত্তার সম্ভাবনা।

দাহ না সমাধি ?

মরণ অনিবার্য্য। জন্ম হইলেই মৃত্যু, জগতের ইহা অখণ্ডনীয় নিয়ম। মনুষ্য-জীবনে কিন্তু দেখা যায় যে, মৃত্যু-নিয়ম অখণ্ডনীয় হইলেও মৃত্যুকে কেহ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে না, এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে সচরাচর লোকে দুঃখ-সাগরে ভাসমান হয়। যখন আমাদের কোন আত্মীয় কিম্বা প্রিয়জনকে রোগে শোকে অভিভূত, বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, জীবনের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত দেখি, তখন আমাদের কখন কখন মনে হয় বটে যে,যত শীঘ্র তিনি জীবনলীলা সংবরণ করেন, ততই ভাল ; কিন্তু সে ভাল তাঁর পক্ষে ; আমাদের যাহারা বাঁচিয়া থাকি, তাহাদের পক্ষে নয়। তাহা না হইলে বৃদ্ধ পিতা মাতার বা অন্য কোন আত্মীয়ের দুঃখময় জীবনের অবসান হইলে আমরা চক্ষুর জল ফেলি কেন? অনেক সময় শোকে অধীর হই কেন ?

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কোনও নিয়মের অধীন নয়। যদি ইহা অগ্র পশ্চাৎ নিয়মের বশবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে মানবজীবনের কষ্টের কতক লাঘব হইত। অমুক আগে আসিয়াছে, অতএব পশ্চাদাগত সকলের আগে উহার চলিয়া যাওয়া উচিত, মৃত্যু-রাজ্যে এ নিয়ম খাটে না। এ নিয়ম যদি খাটিত, তাহা হইলে বিষাদপূর্ণ মানব-জীবনের বিষাদপূর্ণতার কিঞ্চিৎ উপশম হইত। আমরা অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র নর, ভগবানের রাজ্য যে সকল নিয়ম দ্বারা চালিত, তাহার অধিকাংশই অবগত নহি ; কাজে কাজেই তাঁহার শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করা—তাঁহার নিয়মাবলীর উপর মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই,অভাগিনী মাতা সন্তান হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন, শিশু সন্তান পিতা মাতা হারাইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইতেছে, তখন কি আমাদের অন্তঃকরণে স্বতঃই এই ভাব উদিত হয় না যে, হয়ত অকাল মৃত্যু না থাকিলে—হয়ত মরণের সময় অসময় থাকিলে জীবনভার কিঞ্চিৎ কম অসহনীয় মনে হইত, জীবন-মরুতে একটা বেশী মরুদ্বীপ (ওয়েসিস) থাকিত।

মৃত্যু দেখিলেই সচরাচর লোকের কষ্ট হয়। কোন একজন অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের মৃত্যুসংবাদ পাইলেও বুকটা 'ধড়াস' করিয়া উঠে ; আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই। কিন্তু আমাদের প্রথা এই যে, অশীতিপর বৃদ্ধই মৃত্যুমুখে পতিত হউন, কিম্বা সুকুমার শিশুই মাতার ক্রোড় হইতে চলিয়া যাউক, মৃত দেহ পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে হইবে। জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধের দেহ, রমণীয় শিশুর দেহ এবং কমলপ্রতিমা যুবতীর দেহ, সকল দেহেরই পরিণাম এক। মৃত্যুর পর সকলকেই

ছাই হইতে হইবে, হিন্দু সমাজের এই সাধারণ নিয়ম। জানি এ প্রথা অনেকটা চিরাগত। পুরাবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন জগতে মিশরবাসীদের মধ্যে শব-রক্ষার প্রথা ছিল ; ইহুদীদের মধ্যে ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত কবরে মৃতদেহ স্থাপিত হইত, চীনদিগের মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ; কিন্তু গ্রীক, রোমক ও হিন্দুদের মধ্যে দাহ করার প্রথাই প্রবল ছিল বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ হইতে শব-দাহ প্রথা উঠিয়া যায়। খ্রীষ্টানেরা মানবদেহের পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মের জন্মস্থান ইহুদিয়াতে সাধারণতঃ কবরের প্রথা প্রচলিত ছিল ; কাজে কাজেই খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট-জগতে দাহের প্রথা উঠিয়া গিয়া কবরের প্রথাই ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয়।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থান পায় নাই। যে কারণে খৃষ্টানদের মধ্যে কবরের প্রথা চলিত হয়, অনেকটা সেই কারণেই মুসলমানদের মধ্যেও ঐ প্রথা চলিত হয় ; কিন্তু মুসলমানেরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের রাজা থাকিলেও মুসলমান-ধর্ম্ম কখনও হিন্দু-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সেই জন্য ভারতে (অবশ্য হিন্দুদের মধ্যে) সেই প্রাচীন দাহপ্রথা প্রবল রহিয়াছে।

দাহপ্রথা যে বৈজ্ঞানিক এবং সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, তাহা এখন সভ্য জগতে স্বীকৃত হইয়াছে। যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে জীবিত লোকেরই ক্রমে স্থানাভাব হইবে ; অনেক দেশে এখনই তাহা হইয়াছে ; এ অবস্থায় মৃতের সমাধির জন্য স্থান নষ্ট করা উচিত কিনা তাহা আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। আর এক কথা—সমাহিত মৃতদেহ ক্রমে পচিতে থাকে এবং ভূমি ও জল কলুষিত করে। ইহা ত সাধারণ নিয়ম ; কোন সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ সমাহিত হইলে যে উহা কতদূর অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে, তাহা বলা যায় না। এই সব কারণে ইউরোপে অনেক বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিক কেন, অনেক অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমান্ লোকও দাহপ্রথার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রথা যাহাই হউক না, বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, দাহপ্রথা অনেক সময় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়। যাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইল, তাহার বাহ্যিক চিহ্ন জগৎ হইতে লোপ পাইল। যে শ্মশানে তাহাকে দাহ করা হইল, সেই শ্মশানে দাহ-কৃত অন্য সকল লোকের ভস্মের সঙ্গে তার ভস্ম মিশিয়া গেল। যখন শোকের জ্বালায় প্রাণ ছটফট করে, তখন মনে হয় মৃত প্রিয়জনের দেহ যেখানে আছে, সেইখানে গিয়া একটু কাঁদিয়া আসি। কিন্তু যাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার দেহের ত চিহ্ন-মাত্র নাই। যে স্থানে তার চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই স্থানে তার পর কত শত

জনের চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছে। তার চিতা ভস্মের সঙ্গে কত লোকের চিতাভস্ম মিশ্রিত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার দেহ যদি ভস্মসাৎ না হইয়া সমাহিত হইত, যদি সমাধিক্ষেত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে তার শরীর নিহিত আছে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেইখানে গিয়া তার কবরের উপর অশ্রু বর্ষণ করিতে পারিলে যেন শোকদগ্ধ প্রাণে একটু শান্তি আসিত বোধ হয়।

রোমকদের এবং অন্য কোন কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে এক সুন্দর প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন মৃত ব্যক্তির দেহ ভস্মীভূত হইলে পর অনেক সময় আত্মীয়-গণ তাহার চিতাভস্ম একত্র করিয়া এক পাত্রে রক্ষা করিতেন এবং ঐ পাত্র কোন পবিত্র স্থানে স্থাপিত হইত। এই পদ্ধতিতে সমাধির যে সব দোষ তাহা পরিহার করা হইত, অথচ প্রিয়জনের দেহাবশেষ সযত্নে রক্ষিত হইত। কোন স্থান পরি-ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলে এরূপ অবস্থায় ভস্মপাত্রটী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কালনায় বর্দ্ধমানের রাজাদিগের চিতাভস্মের উপর নির্ম্মিত সমাধিমন্দির অনেকে দেখিয়াছেন। সকলে যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় এরূপ মন্দির বৃথা জাঁকজমক ও হৃদয়হীন আড়ম্বরের চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়। অনেকের পক্ষে পবিত্র ভাবে স্থাপিত ভস্ম-পাত্রই যথেষ্ট, ইহার অধিক তাঁহারা আর কিছু চান না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা অনেকের নিকট পাগলামি মনে হইতে পারে; অনেকে হয় ত উহা বৃথা বা অন্যায় মোহ বলিবেন; কিন্তু যাঁহারা ভাল বাসিয়াছেন ও হারাইয়াছেন এরূপ অনেকের হৃদয়ে আমার বাক্য প্রতিধ্বনিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

সমাধি যে অবৈজ্ঞানিক ও বহু-অনিষ্ট-কর, তাহা জানি; কিন্তু মানব-হৃদয় সর্ব্বদা বিজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে চাহে না এবং মানবসমাজ সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান-পরিচালিত হইলে যে বড় সুখের হইবে, তাহাও মনে হয় না। যাহা হউক মস্তিষ্কের দিক্ হইতে দেখিলে দাহপ্রথা প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে ও হৃদয়ের দিক্ হইতে সমাধিপদ্ধতি চিরকালই ভাল বলিয়া মনে হইবে।

সাধুবচনসংগ্রহ।

অপরাধ পাইলেই করিলে দণ্ডন,
তবে আর ক্ষমাগুণে কিবা প্রয়োজন? ৫৬
নিকৃষ্টে বসাও যদি সমান আসনে,
রাখিবে সে তাহে তার দাবি প্রাণপণে। ৫৭

কুক্কুরে করাও যদি ঘৃতান্ন আহার,
পাতের প্রসাদে হবে অরুচি তাহার। ৫৮
যে করে নির্ভর আপনার সাধুতায়,
পৃথিবী হইলে শত্রু পায় না সে ভয়। ৫৯
কর্ত্তব্যেতে একবার যে পেয়েছে রস,
তার কাছে তুচ্ছ কথা ধন মান যশঃ। ৬০
ডুবিয়াছে যেই জন তাত্ত্বিক চিন্তায়,
আর কি সে ছাড়ি তাহা ভাসিবারে চায়। ৬১
বাহিরে কালির দাগ ধুইলেই যায়,
অন্তরের কালি থাকে বজ্রলেপ প্রায়। ৬২
কুজনের মিষ্ট কথা বড়িষের টোপ,
শুনিলেই সর্ব্বনাশ ধন প্রাণ লোপ। ৬৩
মুখে মধু বুকে ছুরী বন্ধুটী তোমার,
বাঁচিলে তাহার হাতে কৃপা বিধাতার। ৬৪
জনমে স্বার্থের লাগি বন্ধুতা যেখানে,
ঘুচিলে সে স্বার্থ রহে বন্ধুতা কেমনে? ৬৫
যাহারে করিয়া সেতু হলে নদী পার,
এখন সে সেতু রাখি কাজ কি তোমার? ৬৬
যত দিন রুগ্ন ছিলে বৈদ্য ভাল ছিল,
আরোগ্যের সঙ্গে তার দোষ বাহিরিল। ৬৭
জুটিত না অন্ন যবে, পান্তা ছিল মিষ্ট,
এখন খাইতে হয় দুধ ভাতে কষ্ট। ৬৮
ওরে কাচ, ছিলে তুমি রাজার মুকুটে,
মণি বলে পরিচিত তাই ছিলে বটে? ৬৯
যত দিন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিলে চোর,
ভয় ভক্তি পূজা কেবা না করিত তোর? ৭০
ব্রাহ্মণের ঘরে ছিলা নারায়ণ শিলা,
চণ্ডালের হাতে পড়ি পাথর হইলা। ৭১
নরমুণ্ডে সিংহাসন গঠিত যাহার,
বলিতে হইবে তারে ধর্ম্ম অবতার। ৭২
ডুব দিয়া জল খাও কর একাদশী,
লোকেতে বলিবে তুমি আছ উপবাসী। ৭৩
সহজে পরের বাড়ী চোর ধরা যায়,
আপনার ঘরে চোর ধরা বড় দায়। ৭৪
বাহিরের অস্ত্রাঘাত ফিরাবে সাহসে,
পেটের ভিতরে ছুরী সামালিবে কিসে? ৭৫
যতক্ষণ মানবের কণ্ঠে বহে শ্বাস।
আশার আশ্বাসবাণী সে করে বিশ্বাস ৭৬
ধনে, জনে, যশোমানে অন্ততঃ জীবনে,
না থাকিলে ভালবাসা কে বাঁচিত প্রাণে? ৭৭
কর্ম্মে সুখ কর্ম্মে দুঃখ স্বরগ নরক,
কর্ম্মযোগে হলে সিদ্ধ তবেত সাধক। ৭৮
গ্রহ তারা তরু লতা অনিল অনল,
নীরবে কর্ত্তব্যপথে চলিছে সকল। ৭৯
ছুরী কাঁচি যত খাটে তত ভাল রয়,
নিষ্কর্ম্মে মরিচা ধরে অকর্ম্মণ্য হয়। ৮০
কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ যোগ সবার উপরে,
নিষ্কাম হইয়া যদি পার খাটিবারে। ৮১
কালক্ষয়, বলক্ষয়, জীবনের ক্ষয়,
বুদ্ধি বিবেচনা ক্ষয় দুশ্চিন্তায় হয়। ৮২
সাহস, উৎসাহ, আয়ু, আনন্দ নির্ম্মল,
বলবুদ্ধি, এ সকল সুচিন্তার ফল। ৮৩
কি হেতু মলিন মুখ উৎসাহবিহীন,
রবে না দুঃখের দশা আসিছে সুদিন। ৮৪
জলে যদি পড়িয়াছ; কি ভাবিছ আর,
বাহুতে থাকিতে বল ছেড় না সাঁতার। ৮৫
চল, চল, পথ নহে বিশ্রামের স্থান,
ভ্রমণ হইলে শেষ জুড়াইবে প্রাণ। ৮৬
মরিচ বেগুণ ফলে মাস দুই পরে,
তাল নারিকেল ফলে যুগযুগান্তরে। ৮৭
যার যেই অনুষ্ঠান সেইরূপ ফল।
রোপিলে তেঁতুল গাছ, ফলে না শ্রীফল। ৮৮

…লি ভাবিতেছ যাহা,
…পৌরুষের পুরস্কার তাহা। ৮৯
দন্ত নাই, দৃষ্টি নাই, দেহে নাই বল,
বিলাসের নামে বৃদ্ধ তথাপি পাগল। ৯০

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

(৪৮১-৮২ সংখ্যা—১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

(৩)

সেই অবধি তারা দেবীর সহিত বিনায়ক রাওয়ের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। কথনও প্রভাতে তারা আপনার গৃহ-প্রান্তের কুসুম কাননে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত থাকিত, তথন হয়ত বিনায়ক সেই পথে যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া দুটি কথা কহিয়া যাইতেন। কথনও সন্ধ্যায় শৈল-তলে দুই জনেই ভ্রমণে যাইতেন, সহসা কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইত। তারা দেবী অতি সাবধানে দুটি একটি কথা কহিত, যেন সে সবলে হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিত। সেই গর্ব্বিত মুখের ভাবে কোমলতার কি মধুর শ্রী ফুটিয়া উঠিতে-ছিল! সহসা যেন বালিকা বয়স তাহাকে ত্যাগ করিয়া কিশোরের মধুর স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে অধিক কথা না কহিলেও বিনায়কের তৃষিত দৃষ্টির তলে চক্ষু অবনত করিয়া থাকিত, সহসা কারণে অকারণে কপোলে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিত। যদি কথনও উভয়ের দৃষ্টির সহিত উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইত, তাহা হইলে উভয়ে সেই গভীর অসীম প্রণয়ের কিনারা পাইত না। উভয়ের ভাব উভয়ের নিকট আর গোপন নাই। তারা সেই কঠিন হৃদয়ে প্রণয়-দেবতার মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছে। প্রস্তরের অঙ্কিত চিত্র কি কথনো মুছিবার? আর বিনায়ক, তিনিত প্রথম দর্শনেই তাঁহার হৃদয় মন সমস্ত সেই বালিকার চরণে সমর্পণ করিয়াছেন।

একদা মধ্যাহ্নে তারা ও তাহার জননীতে কথা হইতেছিল। তারা দেবীর জননী বলিলেন—

"তারা, এথন যে বড় আর বিনায়ক রাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ নাই"

সবিস্ময়ে তারা দেবী বলিল—

"কে বলিল মা?"

"কেন যে দিন তিনি রণবিজয়ী হইয়া এথানে আসিয়াছিলেন, সে দিনের সমারোহ দেখিয়া তোমার কি প্রকার ভাবান্তর হইয়াছিল, মনে আছে কি?"

আনতআননে তারা দেবী বলিল—

"সে দিনের কথা আর বলিও না মা! আমার নিজের উপর ঘৃণা জন্মে। শুনিয়াছ ত এ দেশের সকল লোক বিনায়ক রাও ও তাঁহার পিতার দয়ালুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের যশোগান করিতেছে। আমিত দরিদ্র প্রজাদিগের গৃহে গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিয়াছি, তাহারা বলে এমন দয়া তাহারা জীবনে কথনো পায় নাই। এথন বুঝিয়াছি ঈশ্বর যাহা করেন, সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন।"

"অবশ্য এ একপ্রকার ভাল হইয়াছে, তোমার পিতার অবর্ত্তমানে এ সকলকে আমরা দুইজনে কি দেখিতে পারিতাম? তুমি কি শুনিয়াছ যে, রাণী আমায় মাসিক প্রদান করিতে চান।"

"ছি ছি! আমরা তাহা কেন লইব? আমাদের এই দরিদ্রতাই ভাল। অনন্ত দেবের স্ত্রী কন্যা কি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর-প্রত্যাশী হইবে?"

"আমার আর ভাবনা কি? তোমায় সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

"আমি কথনো বিবাহ করিব না।"

মৃদু হাসিয়া জননী বলিলেন—

"কথনো করিবে না, কোনও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ?"

তারা দেবী তীব্র স্বরে কহিল—

"মা"

সেই মত মৃদু হাসিয়া জননী বলিলেন—

"আমার কাছে কি তোমার মনের ভাব গোপন রাখিতে পারিবে? আমি এত দিনে তোমার মুখের পরিবর্ত্তনে—তোমার সকল ভাবের পরিবর্ত্তনে সব কি লক্ষ্য করি নাই? ঈশ্বরের নিকট আমারও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, তোমার মনোনীত ব্যক্তিকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া রাজপুত ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিও।

তারা দেবী নিতান্ত অপরাধী শিশুর মত দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বক্ষে মুথ লুকাইল।

জননী সস্নেহ দৃষ্টিতে কন্যার প্রতি চাহিয়া তাহার সেই ঘন আলুলায়িত কুন্তল ললাট ও নয়ন হইতে সরাইয়া কহিলেন—

"কল্য প্রভাতে সূর্য্যমলের স্ত্রী মায়া দেবী কুমারী ব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। এ দেশের সকল কুমারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তোমাকেও বলিয়া পাঠাইয়া-ছেন।

উঠিয়া বসিয়া তারা দেবী বলিলেন—

'না মা, আমি আর সে গৃহে যাইতে পারিব না। আমাদের আজন্মের সেই স্নেহের প্রাসাদে আমি কোন্ মুথে ভিথারিণীর বেশে যাইব?"

"ভিথারিণীর বেশে কেন যাইবে? তুমি সেই প্রাসাদের রাণী ছিলে, তুমিই রাণী হইবে।"

কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণনয়নে তারা বলিল—"না মা! আমি যাইব না।"

জননী সহাস্যে বলিলেন—

"আমি শুনিয়াছি এই কুমারীব্রতের নামে মায়াদেবী ভাবী পুত্রবধূ মনোনীত করিবেন। কারণ, শুনিয়াছি বিনায়ক রাও নিজে গোপনে কন্যা দেখিয়া মনোনীত না করিলে বিবাহ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।"

ওমা আমি সত্য সত্যই কি ভিথারিণী যে সেই লোভে যাইব?"

"তুমি কিছুতেই যাইবে না আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু স্বয়ং সূর্য্যমল আসিয়া আমায় অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।"

"সে কি? এ দুর্গাধিপতি কি তোমার পরিচিত?"

"হাঁ সূর্য্যমল আমার রাখী ভাই।"

"এত দিন আমায় বল নাই কেন?"

"আমার আর এ অবস্থার পরিচয় দিবার আবশ্যক ছিল না। তবে তিনি কি প্রকারে সন্ধান লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তোমায় পুত্রবধূরূপে বরণ করেন—

তারা দেবী ছুটিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

প্রভাতে সেই দুর্গপ্রাসাদে মহা সমারোহ। গৃহপ্রাঙ্গণ কুসুমমাল্যে ও আম্রশাখায় সুসজ্জিত হইয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে সারি সারি কুমারীগণ আসিতেছে—কেহ বসিতেছে, কেহ বা ভ্রমণ করিতেছে। দুর্গাধিপতির সহধর্ম্মিণী পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া হীরকালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। কুমারীগণ একে একে প্রায় সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল, গৃহপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত বসনে, উজ্জ্বল অলঙ্কারে, কুসুমগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। সহসা এই সামান্য শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া মূর্ত্তিমতী শ্রীরূপিণী এ বালিকা কে? মায়াদেবী অনিমেষলোচনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন; সহসা দৃষ্টি দূরে পড়িল, বিনায়ক রাও লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া জননীকে ডাকিতেছেন। এক হস্তে মাঙ্গলিক ঘট ও অন্য হস্তে পুষ্পমালা ধরিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিলে বিনায়ক রাও কহিলেন—

"মা এই তিনি।" সস্নেহে একমাত্র পুত্রের প্রতি চাহিয়া মায়াদেবী বলিলেন "কে?"

"তারাদেবী, অনন্তদেবের কন্যা—আমায় আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না মা।" লজ্জায় বিনায়ক মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

"ঈশ্বর তোমাদিগকে অনন্ত সুখে সুখী করুন" এই বলিয়া হস্তস্থিত মঙ্গল ঘট ও পুষ্পমাল্য আপনার পুত্রের মস্তক স্পর্শ করাইয়া পুনরায় মায়াদেবী ফিরিয়া আসিলেন—আসিয়া সেই আনতমুখী তারাদেবীকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন ঃ—

"এস মা লক্ষ্মী, তোমার পাদস্পর্শে আমার গৃহ শ্রীসম্পন্ন হউক।" সর্ব্ব প্রথমে তাহাকে বরণ করিয়া সমাদর করিলেন। সরমে তারাদেবী আর মুখ উঠাইতে পারিলেন না।

কুমারী-ব্রত সমাপন হইয়া গেল। কুমারীগণ নববস্ত্রে, নব অলঙ্কারে, পুষ্পমাল্য, সিন্দূরবিন্দু ও চন্দনে ভূষিত হইয়া, সেই দুর্গপ্রাসাদের চারি দিকে নক্ষত্রমালার মত ছড়াইয়া পড়িয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের উচ্চ হাস্যরবে, অলঙ্কার-ধ্বনিতে প্রাসাদ সজীব হইয়া উঠিল।

এ সময় তারাদেবী কোথায়?

সে ধীরে ধীরে কুমারী বরণের পর বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, প্রাসাদের উদ্যানে প্রবেশ করিল। এই তাহার কত যতনের দ্রব্য, কত পুষ্পফলে বিভূষিত, বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কূজিত, শ্যাম শষ্পরাজিতে সজ্জিত, সেই নয়নাভিরাম উদ্যান। সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, স্বচ্ছ কাচের মত নীল জলরাশি মৃদুসমীরণস্পর্শে থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। সযত্নে পালিত মৎস্যদল সরোবরের কূলে কূলে সোপানের নিকট বিচরণ করিতেছে। সরোবরের দুই পার্শ্বে শানবাঁধান অতি পুরাতন দুইটি পুষ্পিত বকুল বৃক্ষ। তারাদেবী সজলচক্ষে চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘন ছায়াবৃত বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল, একমনে জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিল, সহসা স্মৃতিমথিত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া রুদ্ধ অশ্রুজল উথলিয়া পড়িল, তখন সেই সুকোমল দুইটি করে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া আকুল আবেগে তারা কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে আসিয়া তাহার সেই আলুলায়িত পুষ্পমাল্যভূষিত কুন্তলে কর স্পর্শ করায় চমকিত হইয়া তারা ফিরিয়া চাহিল? সম্মুখে বিনায়ক, তাহার দৃষ্টি নত হইল। সেই শিশির-সিক্ত কমলের মত আননের আরক্তিম আভায় কি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল! মন্ত্রমুগ্ধের মত বিনায়ক তারাদেবীর দুইটি হস্ত আপনার হস্তে ধারণ করিয়া সেই গভীর প্রণয়পূর্ণ নয়নে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—

"তারা—তারাদেবী।"

তখনো তারার নয়নাশ্রু শুষ্ক হয় নাই, সে সেই কণ্ঠস্বরে চকিতে ফিরিয়া চাহিল। উভয়ের নয়নের দৃষ্টি মিলিত হইল। উভয়ে কি সে দৃষ্টিতে প্রণয়ের কূল পাইলেন?

তাহার পর আর কি? দুইটি উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণী শৈলবক্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া সহসা এক বনপথে মিলিত হইয়া গেল। দুইটি হৃদয় বীণাযন্ত্রে একই মধুর রাগিণী বাজিতেছিল, দুইটি সুর মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল।

অসার ধরণী মাঝে সবি হবে লয়,
শুধু পুণ্যভরা এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ভাই ফোঁটা।

অভিধানে ফোঁটা শব্দটীর তত সমাদর নাই। এক ফোঁটা জল—এক ফোঁটা চিনি বলিতে জল ও চিনির অতি সামান্য পরিমাণকে জ্ঞাপন করে মাত্র। আকৃতি

ক্ষুদ্র হইলেই যে ক্ষমতাও ক্ষুদ্র হইবে, তাহা নহে। পদ্মপলাশলোচন যতই প্রশস্ত হউক না কেন, তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ফোঁটাটী সমস্ত দর্শন কার্য্য নিষ্পন্ন করে; নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও সে অনন্তের দৃশ্য প্রদর্শন করে। তেমনি রসাস্বাদন-লোলুপ রসনা আপনার লম্বমান আকৃতির জন্য জগতে যতই বিড়ম্বিত হউক না কেন, তাহার রসাস্বাদন-শক্তি কিন্তু তদগ্রভাগস্থ ক্ষুদ্র স্নায়ুবিন্দু বা ফোঁটার মধ্যে লুক্কায়িত। বাঁশী, বেহালা, বীণা, সেতারা প্রভৃতি মধুর যন্ত্রগুলি কেবল ঝন্ ঝনা শব্দে পর্য্যবসিত হয়, যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি-সজ্ঘাত ফোঁটার মত ঘাটে ঘাটে না পড়ে। এই ফোঁটার শক্তি কম নয়। কালী কলম লইয়া কিছু লিখিতে বসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ সুমোহন বেশ ভূষাতে পরিশোভিত হইয়াও যেন মনের অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাছে আসিয়া চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং অনতিপ্রশস্ত কপালখানি বাড়াইয়া দিয়া আধ আধ স্ফুট বা অস্ফুট স্বরে বলে 'একটী ফোঁটা।' কেউবা অতি কষ্টে তিলফুল-জিনি-নাসা কুঞ্চিত করিয়া অনুনাসিক স্বরে বলে "ফোঁ—তা।" হংসপুচ্ছাগ্রভাগ বা লৌহবিনির্ম্মিত লেখনী সংযোগে কাল বা লাল রঙ্গের কালীর একটী ফোঁটা ললাটপ্রান্তে ধারণপূর্ব্বক, দন্তপাতি বিকাশিত করিয়া মনের আনন্দে পুনরায় ভাঙ্গা খেলা পাতিয়া লয়।

তিথি নক্ষত্র সংযোগে এই ফোঁটার মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সপ্তমী অষ্টমীত প্রতি মাসে প্রতি পক্ষে আসিতছে যাইতেছে, কিন্তু শরতের শুক্ল অষ্টমীর মাহাত্ম্যের সহিত কি তাহার তুলনা হয়? এই শরৎ কেবল নিজে হাসে, নিজে খেলে, তাহা নয়; ইহার আশ্রিত ধরণী-বক্ষবিহারী শোকতাপগ্রস্ত নরনারীকেও হাসাইয়া খেলাইয়া শান্ত দান্ত দেবভাবাক্রান্ত করিয়া তোলে।

ভগবানের বিধানে যম মহাশয় আমাদের ধর্ম্মরাজ! তাঁহার বিচারে বা অবিচারে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। সুখ-সমৃদ্ধি আমোদ আহ্লাদের মধ্যে যখনই মনে হয় "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর," তখনই সাপের মাথায় ধূলি-পড়া পড়ে, মানুষগুলি যেন জীবন্তে মরিয়া যায়। সেতারের সপ্তমে চড়ান ঝিলের তারটা হঠাৎ যেন ঝনাৎ করিয়া ছিঁড়িয়া কুঞ্চিত হইয়া যায়। যমের কি ভীষণ প্রতাপ !!! নাহি বা হবে কেন? ইনিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুরই পরে বা তাঁহাদের উপরে। সংহার ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম নাই। তাই কাণা যেমন শোনে ভাল, বধির যেমন দেখে ভাল, তেমনি সাত না পাঁচ না—একটী শক্তি পাইয়া তাহার প্রতাপ কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা বলিতেছিলাম, এই যম রাজার বিক্রম কম নয়; অগণ্য সৈন্য সামন্ত অশ্ব-গজ অস্ত্র শস্ত্র পরিবেষ্টিত পৃথিবীর রাজগণ সীমান্ত বা সীমাগ্র সংগ্রামে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু

যম-কিঙ্করের হাত এড়াইবার সাধ্য কাহারো নাই। এখানে শ্বেত কৃষ্ণের একই পরিণতি!! বঙ্গনারীগণের এক নাম অবলা, কিন্তু বঙ্গের হিন্দুর স্ত্রী-দেবতাদিগের নাম শক্তি। এই অবলা ললনার চরিত্রে দেবশক্তি বা মাহাত্ম্যও বিরল নহে। শরতের শুক্ল পৌর্ণমাসী স্নিগ্ধ জোৎস্নালোকে আপনার বিভব বিকাশিত করিয়া ধরণীকে পুনরায় কৃষ্ণ পক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন করিল। শুভ্র রজতপ্রভাবিনিন্দিত শারদীয় জ্যোৎস্না-মাখান ধরণী-অঙ্গ নির্জীব হইয়া পড়িল। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, কাজেই অমানিশারও অবসান হইল, আবার চাঁদিনীর হাসি ফুটিল। আঁধারের পর আলোকের—মৃত্যুর পর জীবনের এই নব উদ্গমের প্রারম্ভকালে অবলাকুল যেন মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথি এই শক্তি সঞ্চারের শুভক্ষণ। এই শুভক্ষণে ভ্রাতৃবৎসলা বঙ্গবালাগণ স্বীয় স্বীয় ভ্রাতার জীবনের আঁধার ঘুচাইবার জন্য—তাহাকে যমের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য,—যমের রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া ভ্রাতৃপ্রেমের মহাশক্তি বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত। বঙ্গ রমণীগণ অসূর্য্যম্পশ্যা। তাঁহাদের হৃদয় মনের সুস্নিগ্ধতা বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পর্য্যন্ত কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। শরীরে সূর্য্যের প্রখর কিরণও সহ্য হয় না, নিরন্তর গৃহাভ্যন্তরে আলম্বিত কেশদাম ও বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া কোণের বধূ কোন মতে দিনপাত করেন। এই স্নিগ্ধতা কমনীয়তা বা রমণী-সুলভ-ভীরুতা ভ্রাতৃ-স্নেহ-বিগলিত হইয়া মহাসিন্ধুর প্রবল তরঙ্গের মত শক্তি লাভ করতঃ মৃত্যুর কঠিন পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে উদ্যত! সম্বল, ভ্রাতৃপ্রেম—অস্ত্র, বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির একটী ফোঁটা, ঘৃত-কর্জ্জল-চন্দন-চর্চ্চিত সুমোহন-সুস্নিগ্ধ-সুরভি-সঞ্জাত সুর-নর-বাঞ্ছিত একটী ফোঁটা। বাঙ্গালার ভাগ্যে ব্যবহারের দোষে, ভ্রাতৃ-প্রেম বলিতে ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার প্রেমের কথা বড় একটা বুঝায় না। ইহার একটা প্রধান কারণ এই ভগ্নীগণ পিতা মাতার স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য, কেউ বা গৌরী, কেউ বা রোহিণীরূপে, অপরিণত বয়সেই পতির হস্তে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ প্রদত্ত হন। ভ্রাতৃগণ কেহ বা তাঁহাদের গৃহান্তর গমনের পর, কেহ বা তাঁহার অল্পকাল পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিবার অবসর কোথায়? জন্মিলেও বা অনুভবের শক্তি তখন কোথায়? ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দের উচ্ছেদ ঘটে বলিয়াই বুঝি সংবৎসর কাল অন্তর এই সহাস্য শুক্ল দ্বিতীয়া দিনে নারী-প্রেমের বিভিন্ন উৎস, অর্থাৎ পতিভক্তি, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতি শত প্রেমধারাকে একমাত্র ভ্রাতৃপ্রেমে কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিশেষ দিনে পতির সোহাগ মনে উঠে না, সন্তানের কোমল আহ্বান কানে পশে না, সংসারের আর দশ রকমের

আসক্তিতে প্রাণ বান্ধে না; কোথায় প্রাণের ভাই সুখে নিদ্রা যাইতেছেন প্রাণ কেবল তাহাই দেখে, তাহাই ভাবে এবং তাহারই জন্য লালায়িত হয়।

রজনীর অন্ধকার বিমুক্ত হইতে না হইতে, তরুণ অরুণ হাসি প্রকাশিত হইতে না হইতে ভ্রাতৃবৎসলা হিন্দুমহিলাগণ আপন মনে হাসিতে হাসিতে ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত! সম্বৎসরের সাধনলব্ধ স্বর্গের শুভাশীর্ব্বাদের ভাণ্ড, আপনার শঙ্খ-বলয় কঙ্কণনামক-আভরণভূষিত, সুবর্ণ-বর্ণ-বিনিন্দিত সুগোল সুঠাম হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক, মৃদু মন্দ পদবিক্ষেপে অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভ্রাতৃপার্শ্বে উপনীত! কেন? ভাইয়ের কপালে দিবেন একটী ফোঁটা। এই আশঙ্কার মূলে দৈব শক্তি আছে! না হইলে এত স্পর্দ্ধা এত দম্ভ এত গর্ব্ব শমনের সঙ্গে খাটে কি? দক্ষিণ হস্তে ভ্রাতার মুখে এক গণ্ডূষ চরু বা অমৃত প্রদান, আর বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি সহযোগে ললাট-প্রান্তে একটী ফোঁটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান গর্ব্বিতস্বরে বলিতেছেন—

"ভাইয়ের কপালে দিয়ে ফোঁটা
যমের দুয়ারে দিলেম কাঁটা।"

যমের সাধ্য কি যে ভ্রাতৃস্নেহোন্মুক্ত সতী সাবিত্রীর কোমলকরস্পৃষ্ট ভ্রাতৃ-অঙ্গ স্পর্শ করে! এই স্থলে পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ, ভগিনীর অবরুদ্ধ স্নেহের ক্ষণিক সঞ্চারের নিকট পরাভূত। সরলা অবলাগণকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরুষেরা কিনা সতত সংগ্রাম-রত, তাই তাহাদের প্রতি প্রকৃতির এই ভ্রাতৃ-উপহার অক্ষয় কবজ! বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতাপ্রিয় রমণীগণ অন্তঃপুরাবদ্ধকারী ভ্রাতৃগণকে তেমন স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে না পারেন, কিন্তু যে সময়ের ঘটনা উপলক্ষে এই স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই সময়ের চক্ষে ইহার গভীরতা দৃষ্টি কর। হতভাগ্য সেই পুরুষ—সংসার-সংগ্রামে, নিঃস্বার্থ সরলহৃদয়া ভগিনীর স্নেহাশীর্ব্বাদ যাহার শ্রান্ত মস্তকে বর্ষিত না হয়। ভ্রাতার উষ্ণ ললাটের ঘর্ম্মরাশি বিমুক্ত করিয়া স্নেহশীলা ভগিনীগণ শুভক্ষণে এই যে ঘৃত কর্জ্জল চন্দন-চর্চ্চিত একটী ফোঁটা দেন, সকল ভাইয়ে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন কি?

প্রকৃতি পুরুষ বা নারী নরের মধ্যে বিধাতা একটী নিগূঢ় যোগের প্রণালী সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। মাতৃস্নেহ এই যোগের আরম্ভ, ভগিনীর সরল সৌহার্দ্দে ইহার পুষ্টি বা বিকাশ, এবং ভার্য্যার সোহাগ-সম্ভার-বিমিশ্রিত সপ্রেম সম্মিলনের মধ্যে ইহার তুষ্টি বা পরিণতি। আমরা এই সুবিস্তৃত যোগাবর্ত্তের মধ্যমাংশে অর্থাৎ ভগিনীর অনবরুদ্ধ নির্ম্মল-সরল-সঙ্কোচ-বিহীন ভালবাসা হইতে নানা কারণে বঞ্চিত। তাই নিরবলম্ব নাতিদীর্ঘ এই মধ্য পথ অতিক্রম-ক্লেশে আমাদের দুর্ব্বল দেহ, প্রাণ মন, সমস্তই চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠে, এবং অকালে শেষ প্রান্ত দাম্পত্য প্রেমের গভীর আবর্ত্তে

পড়িয়া আত্মসংযম ও পত্নীতে পবিত্র প্রীতি সংস্থাপন করিতে সকল সময় সমর্থ হই না। বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান উল্লঙ্ঘন নিবন্ধন আমাদের হৃদয়জাত প্রেম পরমেশ্বরের পবিত্র চরণাঞ্জলীর যোগ্য হয় না।

আজ কাল পুরুষেরা সকলেই কেবল রূপে নহে, গুণগরিমাতেও উন্নত ভার্য্যা আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু মনঃকল্পিত তেমন "আদর্শ কনে" আদর্শ জননী না থাকিলে জন্মিবে কিরূপে?

তাই অনেকের হুঁস হইয়াছে এবং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "ভাল মা চাই অগ্রে।" আমরা কি এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি, "ভাল ভগ্নী চাই মধ্যে?" সুমাতার শোণিত-সঞ্জাতা কন্যাকে, সংসারের আব হাওয়াতে শক্ত সুদৃঢ় হইবার অবকাশ না দিয়া কাঁচা তরুতকে লতাটীর মত তাঁহাকে অপরিজ্ঞাত আব হাওয়ার মধ্যে একটী অপরিচিত বৃক্ষবৎ পুরুষের কণ্ঠে বান্ধিয়া দিলে আমাদের এই শুভাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম। আমরা একটা নূতন কথা পাড়িয়া প্রাচীন পরিবার-বন্ধনের বনিয়াদ ভাঙ্গিতে বলিতেছি না,—পারিবারিক বনিয়াদের অপরিহার্য্য ইষ্টক-খণ্ড ভগিনীকে—অসময়ে আবর্জ্জনার মত তুলিয়া না দিয়া স্বস্থানে, উপযুক্ত কাল সাহায্যে রক্ষা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ইহাতে তাহাদের ভাল স্ত্রী হইবার এবং স্বামী হইবেন যাঁহারা তাঁহাদেরও সংযম শিক্ষা করিবার অবসর হইতে পারিবে।

"মায়ের পেটের ভাই
কোথা গেলে পাই।"

এই সুললিত প্রেমগাঁথা আমাদের গৃহের ভগিনীদিগেরই উক্তি। কাল-সহকারে এই গান আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু পরমেশ্বরের আনন্দনিকেতন এই সংসারাবাসে আমাদের কন্যাগণ সুকোমল কণ্ঠে নবীনরাগে এই গান শুনাইয়া আমাদের বাল্যস্মৃতি জাগাইয়া তোলে এবং সেই মঙ্গলময় বিধাতা এই নশ্বর সংসারের শোক-তাপ-পরিপূর্ণ নানা কর্ত্তব্য-ভার-প্রপীড়িত শ্রান্ত মস্তকে সোহাগপূর্ণ বাল্যসৌহার্দ্দের সুস্নিগ্ধ আনন্দধারা বর্ষণ করেন।

আমরা নূতন সভ্যতার উদ্দাম তাড়নায় ভগিনীর হস্তস্পৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র ঘৃত-চন্দন-চর্চ্চিত এই কালীর ফোঁটাটী তুলিয়া দিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের কপালের কালি ঘুচিবে কি?

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভ অনুষ্ঠানে ভগিনী-প্রীতির এই চরম দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মথমোহন দাস।

ধর্ম্মরাজ্য।

এ নহে কল্পনা রাজ্য, করিব হৃদয়,
সকলি প্রকৃত হেথা মিথ্যা কিছু নয়;
এ রাজ্য উন্মুক্ত সদা চির অনাবৃত,
জানে না গোপন স্থান বিজন নিভৃত!
কুটিল কপটাচারী মানব-অন্তর
কলুষ-গোপনে যত্ন করে নিরন্তর।
করিব কল্পনারাজ্যে প্রাসাদ সুন্দর—
তরুলতা গিরিহ্রদ আছে মনোহর;
আছে নদী উপবন, শ্যামল শোভন,
আছে সুধা মন্দাকিনী, নন্দন কানন;
থাক দূরে পড়ে থাক্ কবির কল্পনা,
তার্কিকের তর্কযুক্তি অসার জল্পনা।
শাশ্বত সুখের রাজ্য, উৎস করুণার—
এ রাজ্যে উপমা নাই, উপমেয় আর।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংসার-লীলা।

"বদন্ত শাস্ত্রাণি যজন্ত দেবান্ কুর্ব্বন্ত কর্ম্মাণি ভজন্ত দেবতাঃ।
আত্মৈকবোধেন বিনাপি মুক্তিঃ ন সিধ্যতি ব্রহ্ম শতান্তরেঽপি॥"

প্রস্তাবনা।

(নদীবক্ষে মায়া ও মোহ, সন্তরণ করিতে করিতে সঙ্গীত করণ)

উভয়ে। চন্দ্রমাশালিনী, মধুর যামিনী,
মরি! কি মধুর হাঁসিছে হায়!
সুনীল আকাশে, চাঁদ তারা ভাসে,
হাসি হাসি ঐ জগত হাসায়!
মৃদুলগামিনী, মধুরনাদিনী,
নাচি নাচি ঐ তটিনী যায়!
মানস মথিতে ফুলবাস সাথে,
মৃদু মৃদু বহে মলয় বায়!

মায়া। আয়লো সাঁতারি, সোহাগেরে ধরি,
বুকে বুকে বুক পাতিয়া আয়;
ধরি আয় তান, জুড়াই পরাণ,
ভাসি ভাসি পুনঃ, ভাসিয়ে যাই।

মোহ। আবেশে বিভোরে, স্বপনের ঘোরে,
আয় আয় আয়, সবে ভুলাই,
যাই ভেসে ভেসে, জীবনের দেশে,
শান্তি শান্তি বলি, শান্তি জাগাই।

মায়া। হাসিয়ে হাসিয়ে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে,
(আয়) ঢেউয়ে ঢেউয়ে সবে নাচাই,
উছলি উছলি, ছোট ঢেউগুলি,
ধীরে ধীরে তীরে পড়ুক ভাই!

মোহ। অলসে, অবশে, সুখ তন্দ্রাবেশে,
প্রাণে প্রাণে প্রাণ আয় মিশাই,
যাই-যাই-যাই, যাই ভেসে যাই—
ভেসে ভেসে আয় সবে ভাসাই।

উভয়ে। চলোলো স্বজনি, ভাসায়ে অবনী,
প্রেমে প্রেমে মিশি প্রেম মাখাই,
জাগিয়ে জাগিয়ে, ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আয় আয় সবে ঘুম পাড়াই।

(প্রস্থান)

১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য।

মানসপদ্মে, বীণাহস্তে প্রজ্ঞাদেবী আসীনা।

প্রজ্ঞা। (বীণাবাদন ও সঙ্গীতকরণ)
অসার সংসার শুধু মোহের স্বপন,
রঙ্গালয়ে অভিনয় হয়রে যেমন।
এক আসে এক যায়, সব ছায়াবাজী প্রায়,
হেঁসে কেঁদে হায়, হায়, কাটায় জীবন!
পিতামাতা সুত দারা,
অশান্তি-কারণ তারা,
ভুলায়ে ভুলায়ে শুধু করায় রোদন।
যৌবন, সম্পদ, মান,
যশঃ, ভোগ, অভিমান
এ সব কদিন তরে? ধূলির সমান।

(সঙ্গীতকরণে বিরত হইয়া)

হায়! হায়! ভ্রান্ত জীব চাহে না জানিতে,
কি করিতে আসিয়াছে এই অবনীতে,
শুধু ক্ষণিকের সুখে হইয়া উন্মত্ত,
ভুলে যায় ভোলা জীব আপনার তত্ত্ব।
যথা কাল মেঘ ঢাকি চন্দ্রমার ভাতি,
রজনীরে করে হায়! ঘোর তমোময়,
অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন মানব তেমতি
পথহারা যথা তথা ঘুরিয়া বেড়ায়!
আপনি আপনা বাঁধে মায়ার শৃঙ্খলে!
আপনা আপনি যায় অজ্ঞান আঁধারে;
আপন মরণ-পথে যায় নিজে চলে,
আপনিই ডোবে শোক দুঃখ পারাবারে।
হস্ত আছে তবু কেন পারে না ছিঁড়িতে
মায়ার শিকল? পদ আছে তবু কেন
হায়! জ্ঞানালোকে কভু পারে না যাইতে?
বুদ্ধি আছে তবু কেন থাকে জড় হেন?
বৃথা মান অভিমান দূরে পরিহরি,
যদি জীবকুল হায়! প্রসন্ন মানসে
ঢেলে দেয় অঙ্গ, সবে মিত্র জ্ঞান করি,
অনন্ত বিশ্বের চির মঙ্গল উদ্দেশে!
তা হলে কি হেন তাপে জ্বলে বিশ্ববাসী?
চারি দিকে উঠে এত করুণ ক্রন্দন?
ভাইবোন মিলি থাকে সুখে দুখে মিশি!
আনন্দ-প্রবাহে সবে করে সন্তরণ!
হায়, সুখী দুঃখী জনে কোলে বসাইয়া
যতনে মুছায়ে দেয় নয়ন-সলিল।
মধুর বচনে তারে ধীরে আশ্বাসিয়া,
মনের অশান্তি তাপ নাশে তিল তিল!
অজ্ঞান মানব স্বর্গপথ নাহি ধরে,
দ্বেষ হিংসা ক্রোধ লোভ মনে স্থান দিয়া,
পরের রোদনে কর্ণপাত নাহি করে,
দুঃখম্লান মুখ পানে দেখে না চাহিয়া!
ধনী যারা বর্ত্তমানে বিভুর কৃপায়,
অহঙ্কারে মত্ত তারা বারণের মত,
নিষ্ঠুর কপটী অতি পাষাণহৃদয়,
অনিত্য সম্পদে সুখে মোহিত সতত।
হায়! সুধা ফেলি জীব শর্করায় মাতে!
ধন জন—স্বর্গসুখ, ভাবে সদা মনে,
রোপয় কণ্টক পথে আপনার হাতে,
কাচ পেয়ে ফেলে দেয় অমূল্য রতনে।

(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া)

যদি হায়! ভ্রান্ত জীব ক্ষণেকের তরে,
মনঃ প্রাণ এক করি ডাকেরে আমায়,
তাহ'লে কি সহে জ্বালা বাহিরে অন্তরে,
দিবানিশি পাপে মজি এত দুখ পায়?

(চিন্তা করিয়া)

যাই—পারি না ভাবিতে আর মানবের তরে,

ভেবেই বা হইবে কি ? কেহতো ভাবে না !
সুখ দুখ নাহি বুঝে আছে কূপে পড়ে,
মায়াবিনী-মায়া খেলা বুঝিতে পারে না।
(গান করিতে করিতে প্রজ্ঞাদেবীর অন্তর্দ্ধান)
কে আছেরে জেগে এই অসীম ধরায় ?
প্রভাতের শুকতারা কে দেখিতে পায় !
উষার অরুণ আলো, কে দেখিতে বাসে ভালো ?
বিহঙ্গ সুস্বর মরি ! কে শুনিতে চায় ?
পান তরে শান্তিসুধা, কার প্রাণে জাগে ক্ষুধা ?
বিনাশিতে মৃত্যু-শোক কার সাধ যায় ?
(ক্রমশঃ)

বন্য নারী।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুর। সাঁওতাল পরগণা ও গয়া পার হইলেই উক্ত প্রদেশ। এই প্রদেশ কয়েক জেলায় বিভক্ত, তন্মধ্যে লোহারডাগা, মানভূম, হাজারীবাগ, সিংহভূম ও পেলামৌ এই কয়েকটীই বিখ্যাত। প্রত্যেক জেলা এক একটী ডিপুটী কমিশনর দ্বারা শাসিত। লোহারডাগার হেড্ কোয়ার্টার রাঁচি, মানভূমের—পুরুলিয়া, হাজারীবাগের—হাজারীবাগ, সিংহভূমের—চাইবাসা ও পেলামৌর—ডেল্টানগঞ্জ। এই শেষোক্ত পেলামৌ এবং ডেল্টানগঞ্জের বন্যনারীদের বিষয় আমি বামাবোধিনী পত্রিকার গ্রাহিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য আলোচনা করিব। গ্রাহিকাদিগের চিত্তবিনোদন হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রথমতঃ পেলামৌ সম্বন্ধে পাঠিকাদিগকে কিঞ্চিৎ আভাস দান করিয়া পরে উদ্দেশ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। পেলামৌ পূর্ব্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৮৩০ অথবা ৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা চূড়ামণ রায় ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। তদবধি ইহা ইংরাজাধিপত্যে অবস্থিত। ডেল্টনগঞ্জের পার্শ্বে প্রবাহিত কোয়েল নদীর অপর পার্শ্বে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্ন রাজপ্রাসাদ হইতে অন্যূন একাদশ ক্রোশ দূরে চূড়ামণ রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দুর্গটী গভীর অরণ্যের মধ্যে। ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির উপদ্রব জন্য তথায় যাইতে হইলে রীতিমত লোকবল ও অস্ত্রবল আবশ্যক। দুর্গটী দেখিবার সামগ্রী, সন্দেহ নাই—ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে উক্ত দুর্গের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া সুখী হইব।

পেলামৌ জেলায় ঢেবো, খেরওয়ার, পুরহিয়া, বিরজিয়া, কোরওয়া, কিসন, আগাটিয়া, ধানুক, কোয়েরি, ওরাওণ, কাহার, ভুঁইয়া, ধাঙ্গড় এই কয়েক প্রকার

জাতিই আদিমনিবাসী। স্থানটী পর্ব্বতময়। স্থানীয় লোক অতিশয় দরিদ্র। নরনারী উভয়েই অত্যন্ত সরল, সত্যপ্রিয় ও স্থূলবুদ্ধি। শেষোক্ত দোষটী শিক্ষার অভাবের ফল বলিয়াই মনে করিতে হইবে, কারণ সাধারণ নারী যেরূপ স্থূলবুদ্ধি, শিক্ষিতারা সেরূপ নহে। অত্রত্য সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ধাত্রী (midwife) একটী সামান্য কোল-কন্যা। মূর্খ, সরলপ্রকৃতি ও সভ্যতালোকবিহীন সম্প্রদায়ের ভিতর খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আধিপত্য, সুতরাং এই বন্য জীবদিগের ভিতরেও কতিপয় ইংরাজ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া অনেক নরনারীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন ও উহাদিগকে যথাসাধ্য নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন। উক্ত ধাত্রীও ইহাঁদের সাহায্যে শিক্ষিতা হইয়াছেন। সেই কোল-নারী বঙ্গভাষায় ও ইংরাজি ভাষায় বেশ কথা কহিতে পারেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মিকা ধরণের। কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে, এ রমণী পেলামৌর বন্যনারীদিগের মধ্যে একজন। ইনি কাপড়ে নানাপ্রকার পুষ্প, লতিকা ইত্যাদি তুলিতে পারেন, উলের কার্য্যে, সিলাই কার্য্যে সুদক্ষা। ইনি একটী নেপালী যুবককে বিবাহ করিয়াছেন।

অত্রত্য লোক সকল এতই দরিদ্র যে, তাহারা কদাচিৎ ভাত খাইতে পায়। সাধারণতঃ ঘাস, পাতা, মূল, ফল, ফুল এই সমুদায়ই খাইয়া থাকে। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে মধুপ (মৌয়া) বৃক্ষের ফল ও ফুল যখন ঝরিয়া পড়ে, বন্যনারীরা তখন ঐ সকল কুড়াইতে ব্যস্ত হয় এবং উহাই উহাদের সম্বৎসরের খাদ্যের সম্বল। স্ত্রীলোকেরা শিশু পুত্রকন্যাদিগকে অহিফেন সেবন করাইয়া কার্য্যে বহির্গত হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গেল, শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করে অথবা বিরক্ত করিয়া মাতাপিতার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়, সেই আশঙ্কায় তাহাদিগকে অহিফেন সেবন করাইয়া মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখে।

এই সকল বন্য নরনারীদিগের বিবাহপ্রথা অত্যন্ত খারাপ। কোন বন্ধন নাই, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণে মনান্তর উপস্থিত হইলে উভয়ে উভয়কে ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে এবং এই জন্যই বোধ হয় সন্তানদিগের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ বড়ই কম। পশ্চাৎ এতৎসম্বন্ধে একটী লোমহর্ষণ দৃষ্টান্ত দিব।

এখানে একটি চিরপ্রচলিত প্রবাদ যে, "প্রত্যেক তিন বৎসরান্তর ভীষণ কলেরার আক্রমণে অসংখ্য নরনারী বিনষ্ট হয়।" এই প্রবাদ একবারে মিথ্যা নহে। ১৯০০ সনের মেডিকেল রিপোর্টপাঠে জানা যায়, উক্ত বৎসর কলেরায় অনেক লোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখানকার নরনারী কলেরাকে অতিশয় ভয় করে। কলেরা আরম্ভ হইলে বাজার হাট

এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। মনুষ্যের চলাচল বন্ধ হয়। সন্ধ্যা হইলে আর মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখাই যায় না। আর কোন প্রকার মড়ক বা ব্যাধি এ স্থানে নাই। স্থানটী বড় স্বাস্থ্যকর, সুতরাং একমাত্র কলেরায় এত ভয়। প্রবাদ অনুসারে১৯০৩ অর্থাৎ এই বৎসরটা কলেরার বৎসর। বিগত বৈশাখ হইতে কলেরা আবির্ভূত হয়, ক্রমশঃ জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে অত্যন্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। চারি দিক্ হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনে ছাইয়া পড়িল। অত্রত্য সিভিল সার্জ্জন অনেক চেষ্টাতেও মড়ক নিবারণ হইতেছে না দেখিয়া কারণ নির্দ্ধারণার্থ স্বয়ং প্রাতে ও বৈকালে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ নগর পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্তের কতক দোষ—কতক কতক অন্য কারণও এই দুর্ঘটনার মূল জানিতে পারিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। দরিদ্রনর-নারী ক্ষুধায় কাতর হইয়া শুষ্কপ্রায় কোয়েল নদীর অপরিষ্কার ও বালুকাময় জলপান ও কদর্য্য ছাতু, ছোলা ইত্যাদি খাদ্য ভক্ষণ করে। তদুপরি কুসংস্কার—ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইলে বা ইংরাজি ঔষধ সেবন করিলে অমঙ্গল হইবে। এই আশঙ্কায় সংবাদ গোপন করে, সুতরাং নীরবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ধনী যাহারা তাহারা পাঁঠা, মুরগী, শূকর ইত্যাদি জন্তু দেবদেবীর নিকট উৎসর্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া রোগ নিবারণের চেষ্টা করে, তথাপি হাঁসপাতালে যাইবে না। অত্রত্য হিন্দু-মুসলমান সকলেই কুক্কুট বা শূকর খায়।

একদিন সিবিল সার্জ্জন মহোদয় বিকালে পরিভ্রমণে বাহির হইয়া একটী ডোবার ধারে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালককে শয়ান দেখিতে পান। চতুর্দ্দিকে মক্ষিকা ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে, বমি ও বিষ্ঠায় স্থানটী পরিপূর্ণ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন এ ব্যক্তি কলেরা-গ্রস্ত। বালকটী সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ পুলিশ ষ্টেশনে সংবাদ দিয়া উক্ত বালককে তদবস্থায় হাঁসপাতালে উঠাইয়া লইয়া আসেন। কিঞ্চিৎ পরে জ্ঞান হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে কে? কোথায় বাড়ী ইত্যাদি। উত্তরে বলিল "বাবু! আমি জাতিতে দুসাদ, বাড়ী এখানেই কুঁড়ে, আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান, পিতা ৩ দিন হইল একটী গ্রামে গরু কিনিতে গিয়াছেন। মাতা গৃহেই আছেন। আমি ঘাস বিক্রয়ার্থে সকালে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিবার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া গেল। কয়েক বার বমি দাস্ত হইল। পিপাসায় কাতর হইয়া উক্ত ডোবা হইতে জল পান করিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তারপর আর জানি না।" ডাক্তার সাহেব বালকের মাতার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন—মাতা বলিয়া পাঠাইল "বাজারে কলেরা হইয়াছে, আমি উহার নিকটে যাইব না; তোমরা সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা করাও; ভাল হইলে দিয়া যাইও।" পুত্র এই নিদারুণ সংবাদে কতদূর মর্ম্মাহত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে রাত্রি ১১টার সময় হতভাগা সন্তানের প্রাণ পাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে উড়িয়া গেল। প্রাতে সংবাদ দেওয়া হইল তাহার পুত্র চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে, এক্ষণে লইয়া গিয়া পুঁতিয়া ফেল। উত্তরে সে পাষাণী বলিল "কলেরার মড়া আমি ছুঁইব না, ছুঁইলে আমাকেও মরিতে হইবে। তোমরা ডোম দিয়া পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেল।" হায়! মাতৃস্নেহ! এ মা নারী, না পিশাচী?

বন্যদিগের আহার্য্য সামগ্রীর তালিকা নিম্নে দিলাম—শামা, কোদো, সিঞ্জরী, গোদলী, মেড়ুয়া, মকাই। এ সকলের মধ্যে মকাই (ভুট্টা) উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না—ফল, মূল, পাতা, সেবী (এক প্রকার শিকড়), সবাই (সবুয়া বৃক্ষের ফল), বরেইনি (বৃক্ষের মূল) ছুরা কান্দা, আমের আঁটির চূর্ণ, মহুয়া, পুষ্প, পিয়ার, পিঠার, কেওন্দ, পাপবোটা, গুল্লর (ডুমুর), জঙ্গলী কুলের আঁটি চূর্ণ করিয়া তাহার রুটী, কনোদ, ডিঠোরা। উক্ত সামগ্রী সকল খাইয়াই নারী ও শিশুদিগের কোন প্রকারে কষ্টে দিনপাত হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রভূষণ দত্ত।

অপরাজিতা।

১

বসন্তের সন্ধ্যানিল সুগন্ধি-লহরে
গাইছে মধুর গীতি সুনীল অম্বরে;
উঠিছে সে গীতধ্বনি ব্যাপিয়া ভুবন,
ফুটিছে তারকাগুচ্ছ রজনী-রঞ্জন।
উদ্যানে উপমাহীন বায়ু-আন্দোলিত
কেলি করে ফুলকুল মধু-বিমণ্ডিত।
বিনোদ মাধুরীভরা সুলতা-বিতানে
ললনা-ললাম ছায়া বিমুক্ত পরাণে
খেলিছে, ভাসিছে বিশ্ব অমৃত অর্ণবে,
প্রকৃতির যজ্ঞে জীব মত্ত সুখোৎসবে।
মালা-গাঁথা গ্রাম মাঝে এমন সময়ে
স্বভবনে সুখচন্দ্র ভাবে ভবময়ে।
সর্ব্বসুলক্ষণযুতা সুখের ভাণ্ডার
গৃহমধ্যে গৃহশোভা গৃহিণী তাহার
শান্তি নামে, প্রকৃতই শান্তিস্বরূপিণী—
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে গৃহে সুগৃহিণী।
শান্তি প্রদানিছে দীপ প্রতি ঘরে ঘরে,
বিদ্যুৎ প্রকাশ যেন সুধাকর করে।
অনন্তর নিত্যকর্ম্ম করি সমাধান,
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সীতারাম,
হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া সরোবর-জলে
জপ হেতু বসিলেক তুলসীর তলে।
বাহিরেতে সুখচন্দ্র করেন বিশ্রাম,
অন্তঃপুরে বসি শান্তি করে শ্যামা নাম।
শ্রীমতী অপরাজিতা একমাত্র সুতা
আছেন শ্বশুরালয়ে রূপগুণযুতা।
নাহি আর সে সংসারে অন্য পরিবার,

তাই সন্ধ্যাকালে যেন শূন্য গৃহদ্বার।

২

কে তুমি গো মনোরমে! এই সন্ধ্যাকালে
চলিতেছ মুক্তপথে তাম্বুল কপোলে,
চরণে অলক্তরাগ, নয়নে কজ্জল
গম্ভীর বদনশশী, চরণ চঞ্চল,
কপালে চন্দনবিন্দু, সীমন্তে সিন্দুর,
শান্তিরসে পরিপূর্ণ মানস মধুর।
লুটিত বসনাঞ্চল এলো থেলো বেশে
কে তুমি যুবতী বল যাও কোন্ দেশে?
কে তুমি গো? তুমি কি গো শান্তির দুহিতা,
তুমি কি অপরাজিতা চির-সুচরিতা?
শ্বশুরের নিকটেতে পেয়ে অপমান
আসিতেছ তেজস্বিনী পিতৃ-সন্নিধান।
মালাগাঁথা গ্রাম দেবি! ওই দেখা যায়,
যাও আলো করি দিক্ মহিমাছটায়।
ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর নাহি ভীতি ভয়,
অচিরে উঠিল আসি পিতার আলয়।
বাহিরের বারাণ্ডায় জনক তাহার
উপবিষ্ট আছে যেন পুণ্য অবতার।
সন্ধ্যাকালে একাকিনী হেরি দুহিতায়
হইলেন সুখচন্দ্র হতজ্ঞান প্রায়।
আনন্দ, বিস্ময়, ভয় একত্র হইয়া
রাখিল তাঁহাকে যেন নির্ব্বাক্ করিয়া।
অপূর্ব্ব মহিমাময়ী রমণী রতন,
জনকের মনোভাব বুঝিয়া তখন,
পিতার পবিত্র পদ বন্দনা করিল,
অনন্তর যোড় হাতে বলিতে লাগিল
"কেন পিতঃ! হইয়াছ এত উতরোল,
স্থির হও স্থির হও শুন মোর বোল।
অন্তঃপুরে যাই চল জননী সদনে,
নিবেদিব আত্মকথা সরোজ চরণে।

৩

শান্তি উপবিষ্ট ছিল তুলসীর তলে,
অপরা নমিল তাঁর চরণকমলে।
অপরার সঙ্গে সঙ্গে সুখচন্দ্র এসে,
দাঁড়াইয়া রহিলেন বিস্ময় উল্লাসে,
স্বামীর বিস্ময় আর দুহিতার মুখ
নিরখি শান্তির যেন দমে গেল বুক।
আস্তে ব্যস্তে করি জপ তপ সমাপন
করিলেন দুহিতার বদন চুম্বন।
তখন অপরাজিতা প্রফুল্ল বদনে,
বলিল সকল পিতৃ-মাতৃ-সন্নিধানে,
"শ্বশুর আমাকে আজ অসতী বলিয়া
আপনার গৃহ হতে দিলা তাড়াইয়া।
অবলা জাতির হয় কেবল সম্বল—
স্বামীর চরণ আর পিতৃ-পদতল।
সেই স্বামিগৃহ হতে হয়ে বহিষ্কৃতা
আসিয়াছে তোমার চরণে আজ পিতা।"
শুনি দুহিতার মুখে হেন কুসংবাদ
তাহাদের বক্ষে যেন হ'ল বজ্রাঘাত।
নিদারুণ অপমানে হয়ে আত্মহারা
সোহাগ-মিশ্রিত ক্রোধে বলিল তাহারা,—
"এমন কুৎসিত বাণী কিরূপে স্বমুখে
শুনাইলি বল আজ অচঞ্চল বুকে?"
অপরা তাঁদের মুখে এ কথা শুনিয়া
বলিল গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাসিয়া।
"কে করিতে পারে বল কার অপমান,
দুঃখেতেও দুঃখ নাই চিন্তা কর রাম।
শ্যামরূপ সাধনায় যার হৃদি ভরা,
হরনামে যে মহাত্মা হয় আত্মহারা।
সে কেন অধীর হবে তুচ্ছ কথা নিয়ে,
সুখে দুঃখে স্থির রবে তাঁহাকে স্মরিয়ে।"
দুহিতার মুখে শুনি জ্ঞানের বচন
সুখ শান্তি কিছু সুস্থ হইল তখন।
হরিষ বিষাদে করি রজনী প্রভাত
শান্তি সুখ প্রভাতেতে পাঠালো সংবাদ
কন্যার শ্বশুরালয়ে, করিয়া বিনয়
লিখিল আসিবে বৈবাহিক মহাশয়।
বেয়াই পাইয়া বেয়াইর সে লিখন
বেয়াইর গৃহে আসি দিল দরশন।
সম্ভ্রমে অপরাজিতা শ্বশুরের পায়
প্রণাম করিল আসি, শ্বশুর তাহায়
বলিল, "রে দুষ্টা, তুই কেন অকারণ
আমার পবিত্র অঙ্গ করিলি স্পর্শন?
সুখচন্দ্র তাহা শুনি বলিল সরোষে
এমন অন্যায় বল কেমন সাহসে
বৈবাহিক তুমি মম, শুদ্ধ দুহিতায়?
হবে সদ্য বজ্রাঘাত তোমার মাথায়।"
অপরার শ্বশুরের নাম জনার্দ্দন,
সক্রোধে বলিল কত কর্ক্কশ বচন।
ওই যে প্রফুল্লমুখী তোমার দুহিতা,
তুমি জান তারে সতী সাধ্বী পতিব্রতা।
তাহা নয়, কন্যা তব কুলকলঙ্কিনী,
বর্জ এতাদৃশা কন্যা শুন মম বাণী।
সুখচন্দ্র বলিলেন ওরে নরাধম!
ভুলিলে ভবেশ প্রাণারাম প্রিয়তম।
মিথ্যা কথা বলিতেছ সবার গোচরে?
মিথ্যা সম পাপ আর নাহি এ সংসারে।

(ক্রমশঃ)

গ্রাম্য পাশ্চাত্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আমার বন্ধুটি আরও কতকগুলি কবর ঐরূপে সজ্জিত করিতে দেখিয়াছেন। ফুল গাছের চাষ না করিয়া কেবল ফুল ছড়াইয়া দিলে তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। তার পর হলি, রোজমেরী, ও অন্যান্য চিরহরিৎ লতাবৃক্ষ রোপণ করা হয়। কোন কোন কবরের উপর এগুলি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, যে তাহা সমাধি-স্তম্ভটি এককালে ঢাকিয়া ফেলে।

পূর্ব্বে এই গ্রাম্য অনুষ্ঠান-আয়োজনে কিছু কিছু প্রকৃত কবিত্বব্যঞ্জক শোকময়ী কল্পনাপরায়ণতা ছিল। জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা বুঝাইবার জন্য গোলাপকে কমলের সঙ্গে জড়িত করা হইত। ইভা-লিন্ সাহেব বলেন, এই রসগন্ধময় ফুল অসংখ্য কণ্টকযুক্ত ডালের উপর ফুটিয়া কমলের সঙ্গে জড়িত হইলে চঞ্চল, ছায়াময়, আগ্রহশীল ও স্বল্পস্থায়ী জীবনের সহিত তুলনীয় হয়। কারণ উভয়েই যদিও ক্ষণকালের জন্য অতুল শোভা বিকীর্ণ করে, তথাপি উহারা কণ্টকহীন ও পরি-বর্ত্তনশূন্য নহে। ফুল ও বাঁধিবার ফিতার

বর্ণ, মৃত ব্যক্তির জীবনের ঘটনার অথবা গুণাবলীর অনুযায়ী কিংবা শোককারী ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী হইত। "করিডনের মৃত্যুসূচক ঘণ্টাধ্বনি" (Corydon's Doleful Knell) নামক একটি পুরাতন কবিতায়, একজন প্রেমিক কি কি বস্তু দিয়া তাঁহার মৃতা প্রিয়তমাকে সাজাইবেন, তাই বাছিতেছেন—

নানা বরণের কুসুম আনিয়া,
শিল্প প্রকৃতির মিলন-বলে
গাঁথিব একটী মোহন মালিকা,
দিব উপহার প্রণয়-ছলে।
নানা বরণের ফিতা আনি বাছি
দিব তার সনে জড়ায়ে কিবা,
হরিদ্রা অসিত বিশেষতঃ মিশি
ঢালিয়ে করিবে উজল বিভা।
অতুল কুসুমে করিব শোভিত
স্মৃতির অমূল্য পাষাণ বেদীকে,
সজীব শ্যামল সতত রাখিব
বরিষার মত অশ্রু-জলসেকে।

শুনিয়াছি, কুমারীদিগের কবরের উপর সাদা গোলাপ রোপিত হয়। নিষ্কলঙ্ক সাধুজীবন বুঝাইবার জন্য মালাগুলি সাদা অর্থাৎ দাগহীন ফিতা দ্বারা বাঁধা হয়। সময় সময় মৃতার আত্মীয়গণের শোক-প্রকাশার্থ কৃষ্ণবর্ণ ফিতাও ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্যে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য লাল গোলাপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মোটের উপর, প্রেমিকাদিগেরই কবরে গোলাপকে পছন্দ করা হয়। এভিলীন বলেন, কেবলই যে তাঁহার সময়ে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা নহে, সারে প্রদেশে তাঁহার বাসবাটীর নিকটে এক স্থানে "অবিবাহিতা কিশোরীরা বৎসরান্তে তথায় আসিয়া তাহাদের মৃত ভালবাসার পাত্রের সমাধিস্থানের উপর গোলাপকুঞ্জ রচনা করিত।" ক্যামডেন (Camden) ব্রিটানীয়া (Brittania) নামক পুস্তকে বলেন "অতি পুরাকাল হইতে এখানে সমাধিস্থানের উপর গোলাপ বৃক্ষ রোপণের প্রাণালী দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ কৌমারাবস্থায় বিফল-প্রণয় প্রেমিকপ্রেমিকাদিগের কবরের উপরেই ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সুতরাং এই ধর্ম্মমন্দিরোদ্যানটি এইরূপ অনেকগুলি সমাধিতে পূর্ণ।

মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় অসুখী হইয়া থাকিলে কোন প্রকার শোকোদ্দীপক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা, হউ ও সাইপ্রেস বৃক্ষ। যেখানে পুষ্প ছড়ান হয়, সেখানে কোনও অসুখকর বর্ণের পুষ্প ছড়ান হয় না। টমাস ষ্টান্‌লী সাহেবের কবিতা-গুচ্ছে এইরূপ একটি চরণ পাই:—

তবুও ছড়াও—
ভয়ার্হ কবর পরে যা এনেছ মোর তরে—
পরিত্যক্ত সাইপ্রেস, বিষাদিত ইউ;
কুসুম কোমলতর জন্মিতে না পারে,
বাড়িতে, অসুখী এই ধরণী-মাঝারে।

"কুমারীর বিয়োগান্ত (The Maid's Tragedy) নামক পুস্তকে একটি ক্ষুদ্র করুণ গীতি দৃষ্ট হয়। ইহাতেও হতাশ প্রেমিকার সমাধি সাজাইবার ইচ্ছা একই রূপে প্রকাশিত হয়।

শব-শকটেতে মোর একটি মালিকা রাখ!
ভয়াবহ 'ইউ' বিনির্ম্মিত;
কুমারী 'উইলো' বহ! সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহ,
বল, আমি মরেছি নিশ্চিত।
বিফল পিরীতি মোর; কিন্তু আমি সদা স্থির—
জীবনের প্রারম্ভ হইতে;
প্রোথিত দেহের পরে বিরাজ মৃত্তিকা-রাশি,
লঘুভাবে রহ চারি ভিতে।

বস্তুতঃ মরণের শোকরাশি মনকে পবিত্র ও উন্নত করে। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে যে উচ্চচিন্তা ও সৌন্দর্য্য-পরায়ণতা দেখিতে পাই, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একই কারণে সুগন্ধি গুল্মপুঞ্জ ও পুষ্পরাশি নিয়োগের পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। সমাধিস্থানের ভীষণতার লাঘব, ধ্বংসশীল মানবজাতির ঘৃণা অবমাননা উপেক্ষা করা, এবং প্রকৃতির ক্রোড়স্থিত কোমল ও সুন্দরতম দ্রব্যের সহিত মৃতের স্মৃতি জড়িত করা, এই কয়টি উদ্দেশ্য এই পুষ্পবর্ষণ প্রণালীতে লক্ষিত হয়। ধূলার সহিত ধূলারাশি মিশাইয়া যাইবার পূর্ব্বে কবরের নিম্নে এরূপ এক বীভৎস অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে কল্পনা ক্লিষ্ট হয়। কিন্তু, আমরা তখন পর্য্যন্ত সুখবিজড়িত স্মৃতির সহিত তাহার পূর্ণ বয়সের চিরাকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্যরাশি চিন্তা করিতে চাহি। লেয়ার্টিস (Lairtes) তাহার অনূঢ়া ভগ্নী সম্বন্ধে বলেন, তাহাকে কবরে প্রোথিত কর এবং—

অকলঙ্ক ফুল্ল দেহ হতে কিবা
বায়োলেট উঠিবে ফুটিয়া!

হেরিক (Herrick), তাঁহার "জেপ্‌থার মরণ গীতি" (Dirge of Jeptha) নামক কবিতায়, এমন কবিত্বপূর্ণ চিন্তা ও কল্পনার সৌরভোচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিয়াছেন, যে মৃতব্যক্তিও জীবিতের একনিষ্ঠতায় ও চিন্তাপরায়ণতায় কতক শান্তি লাভ করিতে পারে।

ঘুমাও শান্তিতে তব সুগন্ধি শয্যায়;
অতুল ত্রিদিবে নত কর এ ধরায়;
সুবাস ফুটুক হেথা ফুটুক কুসুম,
ধূপ ধূনা ধূম;
বাম (balm) ও কেশিয়া গন্ধ কর বিতরণ,
কৌমার সমাধি ছাড়ি ভুলাতে ভুবন।
* * * *
লাজুক কুমারীগণ নিত্য নিত্য আসি,
করুক সমাধিপূর্ণ কুসুমের রাশি;
অনূঢ়া বালিকা আসি বিয়োগবিধুরা,
উগ্রগন্ধা মসলা মধুরা—
পোড়াক বেদীর পরে, ধীরে চলে যাক;
কবরে খিলান নীচে ঘুমাইতে থাক।

সমসাময়িক কিংবা এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপনপ্রিয় অনেক পুরাতন কবির কবিতাগুচ্ছের আরও সারসংকলনে আমাদের প্রবন্ধের কলেবরপুষ্টি করিতে পারিতাম, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ফেলিয়াছি। তবুও সেক্ষপিয়র হইতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাতেও এই পুষ্পোৎসর্গের অর্থগত তারতম্য এবং এককালে কবির ভাষার ইন্দ্রজাল ও সজীব বর্ণনাক্ষমতার অদ্বিতীয়তা লক্ষিত হইবে।

সুন্দর কুসুম নিয়া,
নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ফিডিলি! তোমার
সমাধির বিমর্ষতা করিবলো দূর;
তব মুখনিঃসৃত ম্লান গোলাপেতে কভু
হবে না বঞ্চিত শিরানিভ নীল হার বেলে;
ইগ্লেন্টিন পাতাতেও! বলিতে কি যাহা
তব নিশ্বাসের চেয়ে নহে মিষ্টতর।

বহুব্যয়সাধ্য শিল্পনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভাপেক্ষা প্রকৃতির গর্ভজাত ক্ষিপ্র অথচ অযত্নসম্ভূত উপহারে যেন নিশ্চিতই কি এক অধিকতর হৃদ্য ভাব আছে। অনুরাগতপ্ত হৃদয়ে হস্ত পুষ্পনিক্ষেপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, যেন অশ্রু গড়াইয়া আসিয়া কবরের উপর পতিত হয়, যেন স্নেহ তরলিত হইয়া ওসিয়রকে তৃণগুচ্ছের সহিত বাঁধিয়া দেয়। করুণা সুন্দরী বাটালীর কারুকার্য্যের দীর্ঘ কালব্যাপী পরিশ্রমের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং খোদকের লিপিচাতুর্য্যের গর্ব্বপূর্ণ শীতল ভাবের মধ্যে নিজেও শীতল হইয়া যায়।

শ্রীঅপরাজিতা।

ঈশ্বরের নামাবলী।

ষ

ষড়ঙ্গজিৎ, ষড়ঙ্গসিদ্ধ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ষণ্ডদলন, ষিড়্গশাসন, ষোড়শোপচারপূজিত।

স

সংঘটক, সংজ্ঞা, সংপূরণ, সংবন্ধা, সংযোগ, সংযোজক, সংরক্ষক, সংহারকর্ত্তা সংশয়বিরহিত, সংশোধক, সংশুদ্ধ, সংসারস্থিতিবন্ধহেতু, সংসারাতীত, সংসারী, সংসিদ্ধিবিধাতা, সংস্কারক, সংস্থাপক, সংস্থিতিকারণ, সংহারক, সকলগুণনিধান, সকলবিঘ্নহরণ, সকলসুফলজনন,সঙ্কটবারণ সঙ্কটতারণ, সঙ্গরহিত, সঙ্গী, সংগূঢ়, সজ্জ্যপতি, সচ্চিদানন্দ, সচ্ছল, সজাগ, সত্তম, সত্তা, সত্যং, সত্যস্যসত্যং, সত্যকর্ম্মা, সত্যবাদী, সত্যদেব, সত্যসন্ধ, সত্যময়, সত্যসঙ্কল্প,সদয়, সদাগতি, সদাতন, সদাত্মা,সদানন্দ, সদাপ্রভু, সদাশিব, সনাতন, সন্তাপহরণ, সন্তৃপ্তিদাতা, সন্তোষময়, সন্দেহনিবারণ,সন্ধানী, সন্ধি, সন্ধিবিধাতা, সন্নিহিত, সন্নিধিপ্রদর্শক, সফলকর্ম্মা, সভাপতি, সমদর্শী, সমস্ত, সমস্তসদাধার, সমন্বয়কারী, সমর্থ, সমাধিগম্য, সমাপক, সমালোচক, সমীক্ষক, সমীক্ষ্যকারী, সমীচিন, সমীপবর্ত্তী, সমুদ্ধারক, সমুৎকর্ত্তা, সমুন্নত, সমুন্নতিদাতা, সমূহদুঃখহরণ, সমূহপাপনাশন, সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিদাতা, সমৃদ্ধিবিধাতা, সম্পত্তিদাতা, সম্পদ, সম্পদশালী, সম্পাদক, সম্পূর্ণ, সম্বল, সম্ভবাতীত, সম্পন্ন, সম্ভোগ্য, সম্মার্জ্জক, সম্মিলক, সম্মিলনকারী, সম্যক্, সম্রাট, সম্রাটদিগের সম্রাট, সরল, সরলপথপ্রদর্শক, সরলবন্ধু, সরলসাধকসহায়, সরস্বতীশ, স্বরূপহীন, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বকালবিদ্যমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ববিৎ

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরত্নসার, সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বেসর্ব্বা, সর্ব্বোপরি, সবিতা, সবিত্রী, সহচর, সহকর্ম্মী, সহস্রপাদ, সহস্রভুজ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রনামধর, সহস্রাক্ষ, সহায়, সহায়ক সহিষ্ণু, সহৃদয় সক্ষম।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গের ছোট লাট—সার এণ্ড্রু ফ্রেজার গত ২রা নবেম্বর বেলভিডিয়ারের গদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

২। প্রতিনিধি ছোটলাট—বোর্ডিলন সাহেব মহিসুরে রেসিডেণ্ট হইয়া গিয়াছেন।

৩। লর্ড কুর্জ্জন পারস্য উপসাগর পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতায় আসিবেন। আগামী মার্চ্চ মাসে তিনি একবার বিলাত যাইবেন। তখন মান্দ্রাজের গবর্ণর তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৪। বিবি আনি বেসাণ্ট কাশীধামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

৫। গত ১লা অক্টোবর হইতে বিরার (বিদর্ভ) মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৬। আমরা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলাম কলিকাতাপ্রবাসী বাবু বামাচরণ ভড় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে স্বগ্রামে একটী সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করিয়াছেন; এবং কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার জন্য একটী বাটী দান করিয়াছেন। আর স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী কৌনুখী নদীর সংস্কারার্থে ৩০,০০০, হাজার টাকা দিয়াছেন।

৭। বোম্বাইয়ের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ ম্যাকার্থার ভারত হইতে অবসরগ্রহণকালে এদেশীয় লোকদের রীতি নীতি প্রভৃতির প্রশংসা করিয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখে এরূপ কথা প্রায় শুনা যায় না।

৮। আগামী কংগ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে শিল্পপ্রদর্শনী ১০ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে।

৯। আসামের বগড়ীবাড়ীর জমিদার বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের ব্যয়ে কলিকাতায় একটী সাবানের কারখানা চলিতেছে। দুই জন জাপানী এবং একজন জাপান-শিক্ষিত বাঙ্গালী এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিলাতী সাবানের মত উত্তম সাবান প্রস্তুত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

১০। বিলাতের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক লোকি ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১। এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় চারিজন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ও নির্ম্মলচন্দ্র সেন এই দুই জন বাঙ্গালী।

১২। রুষ চিনের রাজ্য মুকডেন প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন।

১৩। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে টেলিগ্রাফে ৮ কথার স্থানে ১৬ কথা যাইবে। তবে নাম ধামের জন্য মূল্য দিতে হইবে। (deferred) টেলিগ্রাফে প্রথম চারি কথার জন্য ।০ এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য /০ লাগিবে। জরুরী ও সাধারণ টেলিগ্রাফে ১৬ কথার উপর প্রত্যেক অতিরিক্ত কথার জন্য ।০ ও ৵০ লাগিবে। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল কমিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সপ্তম বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার—ইহাতে ২৫৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা লিখিত ১৪টী রচনা আছে এবং পুস্তকখানি উত্তম অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। রচনাগুলির সমস্তই সুপাঠ্য, কোন কোনটী বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ। কুন্তলীন আদর্শ ব্যবসায়ী। ইনি যে কেবল স্বদেশী সুরভি তৈল ও গন্ধদ্রব্য সকল উদ্ভাবন করিয়া দেশহিতৈষিতা ও ব্যবসায়োন্নতির পরিচয় দিতেছেন তাহা নহে, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতির সহায়তাও করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কুন্তলীনের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করি।

২। কর্ম্ম-ক্ষেত্র—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। লেখক ইতিপূর্ব্বে কোন কোন নীতিগ্রন্থ প্রচার করিয়া সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও লিপিনৈপুণ্যের অধিকতর প্রমাণ পাইয়া আমরা পরমানন্দিত হইতেছি। প্রত্যেক মানবের অন্তরে অমোঘ ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান আছে। কোনও মহৎ কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া সেই শক্তি অবলম্বনে সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। কেবল নীতিবাদীর ন্যায় এই মহাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল দিয়া তাঁহার বচন সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইংরাজ সুলেখক স্মাইলসের প্রণালীতে গ্রন্থখানি লিখিত। লেখা অতি সরল, বিশুদ্ধ ও সুযুক্তিপূর্ণ। এরূপ গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে বড়ই আবশ্যক এবং ইহা নরনারীর চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

৩। মূকশিক্ষা—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা। এদেশে

কালা-বোবাদের সম্বন্ধে এরূপ পুস্তকের এই প্রথম প্রচার। ইহাতে মূকবধির শিক্ষায় ও ইহার প্রবর্ত্তকদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মূকবধির বিদ্যালয় ও শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদিগের বিবরণ এবং মূকবধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালী সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি অতি সরল বাঙ্গালায় লিখিত এবং বিলাতী ও দেশীয় শিল্পিপ্রস্তুত অনেকগুলি ছবি দ্বারা সুসজ্জিত। গ্রন্থকার কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক এবং তিনি বহু যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা ও গ্রন্থকারকে যথোচিত উৎসাহ দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বামারচনা।

আহ্বান।

এস যাই সবে ভাই ভগিনীসদনে,
ডাকিছেন ভাইফোঁটা সবারে সঘনে।
ত্যজিয়া বিষয় কার্য্য দিনেকের তরে
এসহে মিলিত হই ভগিনীর ঘরে।
চন্দ্রাতপে সুশোভিত বিমল প্রাঙ্গণ,
আম্রপল্লব কুসুম কত সুশোভন।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারে দ্বারে কদলীশাখায়,
ভাইফোঁটা আগমনী বিহগিনী গায়।
চৌদিকে উৎসবময় করে শঙ্খধ্বনি,
সর্জ্জরস গন্ধে পূর্ণ আজিকে অবনী।
বিবিধ বিচিত্রাবাসে শোভে সে ভবন,
ফুলমালা দোলাইছে সুমন্দ পবন।
সুন্দর কনক-নিভ ভ্রাতার আসন,
তারকা মালায় শোভে সুনীল গগন।
নানা উপচারে রচি উপহার-ডালা
ভগিনীপরাণ ফুল্ল—নেত্রানন্দ মেলা।
যমুনা শ্যামলা ধারা ধীরে ধীরে বহি,
শীতল শীকরবিন্দু হৃদি প্রাণ মোহি,
অতল হৃদয়তলে অবিরাম ছুটে,
ভ্রাতার কল্যাণময়ী স্নেহধারা লুটে।
আহ আহ ত্বরা আহ সম্ভাষি উষায়।
শুভলগ্ন শুভাশীষ এস বহে যায়।
ডাকিছে ভগিনী শুন মধুর আহ্বানে,
ফুটিয়াছে পারিজাত আশীর্ব্বাদ দানে।
অবোধ অশান্তচিত্ত কে আছে ধরায়?
উঠহে ত্যজিয়া ঘুম অলস নিদ্রায়।
মহামূল্য ভ্রাতৃপূজা ভারত শিখায়,
ভগিনীর স্নেহ দান আজিকে বিলায়।
ত্যজ মান অভিমান স্বার্থ পায় পায়।
লভহে আশীষ বিত্ত ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায়।
ভীষণ করাল যম ভগিনীর বরে
ভাইকে রাখিবে সুখে চিরজীবী করে।
ভুলেছ হিন্দুর নীতি পবিত্র সুরীতি,
তবু না বিস্মৃত হও এ দ্বিতীয়া তিথি।
ভগিনীর স্নেহে প্রাণে জাগিবে চেতনা।
এক মন্ত্রে হবে সব সফল কামনা।

একতার মহাবলে দুঃখ কাঁটা যাব দলে,
লভিব অমৃত শান্তি এ ধরণীতলে,
ভাই ফোঁটা হবে ধন্য আশীর্ব্বাদফলে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।

এস ভাই কাছে এস করি আবাহন,
আজি এই পূত ক্ষণে
আনন্দ উৎফুল্ল মনে
ভ্রাতার ভগিনী যারা লয়ে সুশোভন
চন্দনের পাত্র করে,
স্নেহবিগলিত স্বরে
তিতিছে স্নেহের নীরে হরষিত মন,
এস ভাই কাছে এস করি আবাহন।
আজিকার দিবা কিবা হেরি মনোহর,
চাঁদিনীর নিশা মত
সুচারু কিরণ শত
উথলে জগত প্রাণে আনন্দসাগর;
ভ্রাতার ভগিনী যারা
আনন্দেতে আত্মহারা,
তুমি আমি—ভাই বোন র'ব কি অন্তর?
না না ভাই কাছে এস করি সমাদর।
আমারও ইচ্ছা যায় লইয়া চন্দন,
ওই বরানন ধরি
আদরে যতন করি
পরাইয়া দিই এক ফোঁটা সুশোভন,
ও চারু ললাট-নভে
উদিবে চন্দ্রমা যবে,
প্রীতির দর্পণখানি জ্বলিবে কেমন,
হাসিবে যেন বা দীপ্ত সচন্দ্র গগন!
যদবধি পাইয়াছি তব পরিচয়,
কত যে রয়েছে মণি
পূরিয়া হৃদয়খনি
দেখিয়াছি মোহিয়াছে আমার হৃদয়,
কি যে প্রেম কি যে আশা,
কি যে প্রীতি ভালবাসা
বাড়িতেছে নিতি নিতি পবিত্রতাময়,
ফুটে ফুল যথা পেয়ে মৃদুল মলয়।
তুমি যে পরশমণি অধমজনার,
ওই হৃদি দরশনে,
ও চরণ পরশনে,
এই হৃদি লৌহ মম হয়েছে সোণার;
কত উপদেশে নিত্য
গড়িয়াছে মম চিত্ত,
তোমার গুণের কথা কি কহিব আর—
বাঁধিয়াছ মম মতি পদে দেবতার?
তোমার হৃদয়খানি নন্দন সুষমা!
কানন করেছে আলা
যত অমরার বালা
সরলতা, পবিত্রতা, প্রীতি মনোরমা,
কুসুমে কুসুমে হেলি
করিছে স্বরগ কেলি,
হৃদি-ফুল-পত্রে পত্রে শোভা অনুপমা,
মুগ্ধ মম চিত্ত হেরি অতুল সুষমা।
ছাড়ি তব স্তুতিবাদ এসহে এখন,
তোমার মমতা প্রীতি

যেন পাই নিতি নিতি,
ভাই বোনে থাক চির অখণ্ড মিলন,
মাঝে আসি শত্রু কেহ,
না টুটে মোদের স্নেহ,
ঘটে না জীবনে যেন বিচ্ছেদ কখন,
এস ভাই কাছে এস করি আবাহন।
এস ভাই কাছে এস করি সমাদর!
কর্পূর চন্দন চুয়া
একত্রে শিশির দিয়া
অঙ্গুলিতে মিশাইয়া সোহাগ সুন্দর
ও কম ললাটভাগে
অপূর্ব্ব হৃদয়রাগে
পরাইয়া দিই এক ফোঁটা মনোহর,
দেখুক সে শোভা যত অমরী অমর।

শ্রীঅপরাজিতা দাসী।

ভাইদ্বিতীয়া।

উদ্বেলিত হৃদিটুকু,
আকুল আবেগে মিশি
এসেছে সুদূর হতে
তোমার দুয়ারে "নিশি।"*
বহু দূরে প্রবাসীর
শুষ্ক ছাত্রাবাস-গেহ,
বহাইতে পুণ্য নদী
ভগিনীর পূত স্নেহ।
আয় কোলে, আয় ভাই,
ভাই-ফোঁটা পরাইয়ে,
মঙ্গল আশীষ রাখি
বিঘ্ন বাধা যাই লয়ে।
আজি এ বিশেষ দিনে
হৃদয়ের শুভ্র প্রীতি,
জাগাইছে ধীরে ধীরে
করুণ শৈশবস্মৃতি।
আয় আজি, পঞ্চ ভাই
জননীরে লয়ে সাথে,
শুভ্র চন্দনের ফোঁটা
পরাব বিমল প্রাতে।
ফুল্ল দৃষ্টি তোমাদের
হাসিভরা মুখ মার,
ভুলাইবে সংসারের
শতেক যাতনাভার।
এই দিনে স্বরগের
অমিয়া পড়িছে ঝরি,
সে সুধা পরশে হৃদি
ভ্রাতৃপ্রেমে গেছে ভরি।
বিধাতার করুণায়
বুকে লয়ে স্নেহ হর্ষ
আবার কাটিবে ভাই
প্রবাসের এক বর্ষ।

শ্রীসরলা দত্ত।

* ভ্রাতার নাম।

কাঙ্গালের আবাহন।

আসিছে আনন্দময়ী! এ পাপ ধরায়।
ধরিছে শেফালি ফুল,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
তব আগমনে ধরা সুখে উথলায়।

প্রবাসী যতেক নর,
বৎসরান্তে অবসর
পেয়েছে সবাই মাগো! তোমারি কৃপায়।
সবাই সানন্দমনে,
ছুটিছে প্রাণের টানে,
যেখানে যে আছে সবে গেহ পানে ধায়।
সবাই আনন্দ ভরে,
কালি মা পূজিবে তোরে
সুখদা সপ্তমী কালি উদিবে ধরায়।
বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ!
এ আনন্দে নিরানন্দ,
আমার পরাণ সদা করে হায়! হায়!
বসাইয়ে সিংহাসনে,
নানা উপহার সনে
সবাই নৈবেদ্য দিবে তোর রাঙা পায়।
আমি কি দুখিনী ব'লে পাবনা তোমায়?
আমি যে কাঙ্গাল অতি,
নাহিক কোন সঙ্গতি,
কি দিয়ে পূজিব মাগো! ওরাঙা চরণ?
নাহি ঘর নাহি বাড়ী,
কোথা পাব ধন কড়ি,
জনমেছি এ ধরায় আমি অভাজন।
তা বলে কি অভাগীরে,
বারেক চাবে না ফিরে,
তুমিত জননী-স্নেহে সবার সমান।
বসাইয়ে হৃদি পরে,
আয় মা! পূজিব তোরে,
ভকতি চন্দন পুষ্প করিব প্রদান।
মন-জবা বিল্বদলে,
সুগন্ধি প্রেমাশ্রু জলে,
সাজাইব মনসাধে পাদুখানি তোর।
একবার দয়া করে,
আয় মা এ হৃদি পরে,
তাপিত হৃদয় মাগো শান্ত হোক মোর।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

একটী নবজাত শিশুর জন্মোপলক্ষে

(২০শে ভাদ্র, পূর্ণিমা তিথি, রবিবার)।

আজিকে পূর্ণিমা তিথি, ভরা চাঁদিমায়,
চকোর চকোরী ভাসে ডুবে অমিয়ায়।
সরোবরে "কুমু" সতী হাসিয়া আকুল,
চৌদিকে ছুটিছে তার যত অলিকুল।
এমনি সময়ে পূর্ণ ইন্দু সুবিমল,
একটুকু কণা ভেঙ্গে পড়িল ভূতল।
নেহারি তাহার সেই পবিত্র বয়ান,
কি করি কোথায় রাখি ভেবে আট খান।
সঞ্জীবনী সুধা মন্ত্রে, ভরা সেই হিয়া,
নির্জীব মানবপ্রাণ উঠিল জাগিয়া।
আশাশূন্য হৃদি ছিল, আশা উপজিল,
পরশ-পাথর যেন দরিদ্র পাইল!
এসেছ, এসেছ, যদি ত্রিদিবের ফুল,
চিরদিন আলো করে রেখ তিন কুল;
যেই সঞ্জীবনী শক্তি দেখালে এখন,
চিরদিন রেখ তাহা করিয়া যতন;
দেব দ্বিজে ভক্তি রেখ, রেখ শুদ্ধ মন,
তোমাতেই দেখি যেন স্বরগ ভবন॥

শ্রীহেমপ্রভা কর।

Registered No. C. 134

No. 484. December, 1903.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১০; ডিসেম্বর, ১৯০৩। } ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	২২৫
২।	দুষ্প্রাপ্য বিধবা	২২৬
৩।	মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষার চর্চ্চা	২২৮
৪।	মৌনি-সভা	২৩১
৫।	আকাঙ্ক্ষা (পদ্য)	২৩৩
৬।	গীতাসার-ব্যাখ্যা	২৩৪
৭।	মিলন (পদ্য)	২৩৫
৮।	পত্র	২৩৯
৯।	সতীর প্রতিজ্ঞা	২৪৩
১০।	কায়স্থ-মহিলাগণ সমীপে নিবেদন	২৪৫
১১।	আশ্চর্য্য স্বামি-ভক্তি ...	২৪৭
১২।	ঈশ্বরের নামাবলী ...	২৪৯
১৩।	নূতন সংবাদ	২৫০
১৪।	পুস্তকাদি সমালোচনা ...	২৫৩
১৫।	বামারচনা—অমিয়া আমার	২৫৪
	শিশুর হাসি	২৫৫
	অনিত্য সংসার ...	২৫৫

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

প্রবাসী যতেক নর,
বৎসরান্তে অবসর
পেয়েছে সবাই মাগো! তোমারি কৃপায়।
সবাই সানন্দমনে,
ছুটিছে প্রাণের টানে,
যেখানে যে আছে সবে গেহ পানে ধায়।
সবাই আনন্দ ভরে,
কালি মা পূজিবে তোরে
সুখদা সপ্তমী কালি উদিবে ধরায়।
বিধাতার কি নির্বন্ধ!
এ আনন্দে নিরানন্দ,
আমার পরাণ সদা করে হায়! হায়!
বসাইয়ে সিংহাসনে,
নানা উপহার সনে
সবাই নৈবেদ্য দিবে তোর রাঙা পায়।
আমি কি দুখিনী ব'লে পাবনা তোমায়?
আমি যে কাঙ্গাল অতি,
নাহিক কোন সঙ্গতি,
কি দিয়ে পূজিব মাগো! ওরাঙা চরণ?
নাহি ঘর নাহি বাড়ী,
কোথা পাব ধন কড়ি,
জনমেছি এ ধরায় আমি অভাজন।
তা বলে কি অভাগীরে,
বারেক চাবে না ফিরে,
তুমিত জননী-স্নেহে সবার সমান।
বসাইয়ে হৃদি পরে,
আয় মা! পূজিব তোরে,
ভকতি চন্দন পুষ্প করিব প্রদান।
মন-জবা বিল্বদলে,
সুশান্তি প্রেমাশ্রু জলে,
সাজাইব মনসাধে পাদপদ্মানি তোর।
একবার দয়া করে,
আয় মা এ হৃদি পরে,
তাপিত হৃদয় মাগো শান্ত হোক মোর।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

একটী নবজাত শিশুর জন্মোপলক্ষে
(২৩শে ভাদ্র, পূর্ণিমা তিথি, রবিবার)।

আজিকে পূর্ণিমা তিথি, ভরা চাঁদিমায়,
চকোর চকোরী ভাসে সুধে অমিয়ায়।
সরোবরে "কুমু" সতী হাসিয়া আকুল,
চৌদিকে ছুটিছে তার যত অলিকুল।
এমনি সময়ে পূর্ণ ইন্দু সুবিমল,
একটুকু কণা তেঙ্গে পড়িল ভূতল।
নেহারি তাহার সেই পবিত্র বয়ান,
কি করি কোথায় রাখি ভেবে আট খান।
সঞ্জীবনী সুধা মন্ত্রে, ভরা সেই হিয়া,
নির্জীব মানবপ্রাণ উঠিল জাগিয়া।
আশাশূন্য হৃদি ছিল, আশা উপজিল,
পরশ-পাথর যেন দরিদ্র পাইল!
এসেছ, এসেছ, যদি ত্রিদিবের ফুল,
চিরদিন আলো করে রেখ তিন কুল:
সেই সঞ্জীবনী শক্তি দেখালে এখন,
চিরদিন রেখ তাহা করিয়া যতন;
দেব দ্বিজে ভক্তি রেখ, রেখ শুদ্ধ মন,
তোমাতেই দেখি যেন স্বরগ ভবন॥

শ্রীহেমপ্রভা কর।

Registered No. C. 134

No. 484. December, 1903.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ; ডিসেম্বর, ১৯০৩। } ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ ...	... ২২৫
২।	দুর্গোৎসব বিসর্জ্জন ...	... ২২৬
৩।	মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষার চর্চা	২২৮
৪।	যোগি-সঙ্গ ...	... ২৩১
৫।	আকাঙ্খা (পদ্য) ...	... ২৩৩
৬।	নীহারের-বাগান ...	... ২৩৪
৭।	বিনয় (পদ্য) ...	... ২৩৫
৮।	পত্র ...	... ২৩৬
৯।	সতীর প্রতিজ্ঞা ...	... ২৪০
১০।	কায়স্থ-মহিলাদের প্রতি নিবেদন ...	... ২৪২
১১।	আশ্চর্য্য খনি-তত্ত্ব	... ২৪৭
১২।	ঈশ্বরের নামাবলী	... ২৪৮
১৩।	নূতন সংবাদ ...	... ২৫০
১৪।	পুস্তকাদি সমালোচনা	... ২৫৩
১৫।	বামারচনা—আমার আমার	২৫৪
	শিশুর হাসি ...	... ২৫৫
	অনিত্য সংসার	... ২৫৫

কলিকাতা।

৬নং কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীঅবনাশ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্তৃক ৬নং আর্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, মফঃস্বলে বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-নাশে [illegible]

বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়। বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ হইতে আরাম [illegible] অথচ ইহা সুস্থ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন [illegible] আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া [illegible] সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সুস্থ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন [illegible] আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্যে, অজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্যে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, [illegible] কাশিতে, হাত-পা-চক্ষুজ্বালায়, মাথা-ধরায় ও ঘোরায়, ঠাণ্ডা লাগায়, রাত্রি জাগরণে [illegible] তৃষ্ণায়, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা আহারান্তে [illegible]

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর, অন্তর্বেগ-প্রভৃতি [illegible] বিষমজ্বর, ঘুষঘুষেজ্বর, সৌকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা [illegible] বিজয়া বটিকা অব্যর্থ ঔষধ। ইংরাজ বাঙ্গালীও ইহা সেবন করিয়া [illegible] বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৸০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৸৵০	।০	৶০
বিশেষ সুলভ পারিবারিক কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে [illegible] দুই আনা অধিক দিতে হয়।

সতর্কতা; বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া [illegible] প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। [illegible] সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া [illegible]

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি [illegible] বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—কে, সি, বসু [illegible] প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭২নং হ্যারিসন রোড, বিজয়া বটিকার [illegible] পক্ষে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 484. December, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৪ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১০; ডিসেম্বর, ১৯০৩। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড কর্জ্জন কয়েকখানি রণতরী লইয়া সস্ত্রীক স্বদল-সমভিব্যাহারে পারস্যোপসাগরে যাত্রা করিয়াছেন। পারস্যে ইংলণ্ডের প্রভাব বিস্তার সর্ব্বাই উদ্দেশ্য। ইনি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিবেন।

প্রধান সেনাপতির বিপদ—লর্ড কিচেনর সিমলা শৈলে অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত ও ভগ্নপদ হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ ও নিরাপদ করুন।

তিব্বতে অভিযান—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের সহিত বাণিজ্য-সন্ধি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া সশস্ত্র বহুসংখ্য সৈন্য লাসা অভিমুখে যাত্রা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার পরিণাম কি হইবে ভাবনার বিষয়।

মহতের সম্মাননা—লর্ড কর্জ্জনের ব্যবস্থায় রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মহোদয়দিগের বাসগৃহের দ্বারদেশে প্রস্তরফলকাঙ্কিত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

অভ্যর্থনা—গত ১৪ই নবেম্বর জাপান-প্রত্যাগত বাবু মন্মথনাথ ঘোষের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান কলিকাতা আলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়াছে। ইনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে জাপানে প্রথম শিক্ষার্থী। সেখানে কলিসম্বন্ধীয় প্রভূত জ্ঞানলাভ ও চরিত্র-প্রভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

নূতন ছোট লাটের ভ্রমণ—কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই সার এণ্ড্রু ফ্রেজার পূর্ব্ববঙ্গ সমূহ ও পাবনা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আবার উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতেছেন।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-পক্ষেই

বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়।

বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ ইহাতে আরাম অথচ ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া সেবনে আরোগ্য হইয়াছে; অথচ বিজয়া বটিকা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-অপরিষ্কারে, ধাতুদৌর্ব্বল্যে, অগ্নিমান্দ্যে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, কাশিতে, হাত-পা-চক্ষুজ্বালায়, মাথা-ধরায় ও ঘোরায়, ঠাণ্ডা লাগায়, রাত্রি জাগায় চলায়, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা তাহার মহৌ

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালজ্বর, পালাজ্বর, আমাবস্যা-পূর্ণিমার বি বিষমজ্বর, ঘুষ্‌ঘুষেজ্বর, দৌকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা মহৌ বিজয়া বটিকা আজ সর্ব্বত্র আদৃতা, ইংরাজ নরনারীও ইহা সেবন করিয়া থাকে

বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৲০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৷৵০	।০	৵০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৵০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে দুই আনা অধিক দিতে হয়।

সতর্কতা। বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া যায়

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭৯নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা লয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 484. December, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১০; ডিসেম্বর, ১৯০৩। } ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড কুর্জন কয়েকখানি রণতরী লইয়া সস্ত্রীক স্বদল-সমভিব্যাহারে পারস্যোপসাগরে যাত্রা করিয়াছেন। পারস্যে ইংলণ্ডের প্রভাব বিস্তার করাই উদ্দেশ্য। ইনি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিবেন।

প্রধান সেনাপতির বিপদ—লর্ড কিচেনর সিমলা শৈলে অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত ও ভগ্নপদ হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ ও নিরাপদ করুন।

তিব্বতে অভিযান—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের সহিত বাণিজ্য-সন্ধি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া সশস্ত্র বহুসহস্র সৈন্য লাসা অভিমুখে যাত্রা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার পরিণাম কি হইবে ভাবনার বিষয়।

মহতের সম্মাননা—লর্ড কুর্জনের ব্যবস্থায় রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মহোদয়দিগের বাসগৃহের দ্বারদেশে প্রস্তরফলকাঙ্কিত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

অভ্যর্থনা—গত ১৪ই নবেম্বর জাপান-প্রত্যাগত বাবু রমাকান্ত রায়ের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান কলিকাতা আলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়াছে। ইনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে জাপানে প্রথম শিক্ষার্থী। সেখানে খনি-সম্বন্ধীয় কার্য্যে কৃতিত্বলাভ ও চরিত্র-প্রভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

নূতন ছোট লাটের ভ্রমণ—স্বীয়পদ গ্রহণ করিয়াই সারএণ্ড্রু ফ্রেজার পুরুলিয়া গয়া ও পালামৌ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আবার উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতেছেন।

ডাক্তার কারী—এই গুণবতী রমণী রেডিয়া নামক এক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া 'ডাক্তার' উপাধি পাইয়াছেন।

বিক্‌টোরিয়া মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি ধুবড়ী নগরে ব্রহ্মপুত্রতীরে স্থাপিত হইয়াছে। আসামের চিফ কমিশনর ফুলার সাহেব প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ছত্রী-সার্কস—মারহাট্টা ক্রীড়াপ্রদর্শক ছত্রীর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়কে ধন্য। তিনি চিনের সাম্রাজ্ঞীর দরবারে সদলে সার্কস ক্রীড়া দেখাইয়া ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ছত্রী রাজ্ঞীকে অন্যান্য উপহারের সহিত একটী হস্তী ভেট দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-বিল—সিমলা শৈলে এই আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে; কলিকাতায় ইহা বিধিবদ্ধ হইবে। ইতিমধ্যে বিল সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মত লওয়া হইতেছে।

পোষ্টকার্ডে সংবাদপত্র—প্যারিসের এক সম্পাদক এই কার্য্য করিবেন। এক পেনী মূল্যে দৈনিক পত্র পাওয়া যাইবে। তাহাতে দৈনিক প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ ও তারের খবর থাকিবে।

রাজভ্রমণ—ইটালীর রাজা ও রাণী ইংলণ্ডভ্রমণে আগ্যায়িত হইয়া গিয়াছেন।

তীর্থযাত্রা—ভূপালের বেগম মক্কা-তীর্থে গমন করিয়াছেন এবং আরবের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া আসিতেছেন।

দুগ্ধপোষ্য বিধবা।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা বুঝিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। একটী হুজুগ উপস্থিত হইলেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। গত সেন্সাস গণনার ফল আর যাহা হউক না হউক, ইহা দ্বারা বাঙ্গালীদিগের জাতিভেদের ধুয়াটা খুব জাগিয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত্রী, উগ্রক্ষেত্রী, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, সুবর্ণবণিক, যুগী প্রভৃতি সকল জাতিই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহার মধ্যে "হাম্ বড়া" এই মাত্র ভাব। কিন্তু সকলেই যে বহুকালাবধি ম্লেচ্ছ বিজাতীয়দিগের পদানত, সুতরাং নগণ্য, এ উদ্বোধ নাই। আজ কালি বিবাহ একটী লাভের ব্যবসায় হইয়াছে। কন্যার বাপের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বরের বাপ হয়ত রাতারাতি বড়মানুষ হইতে পারেন। এই সুযোগ পাইয়া সকলেই আত্মস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উন্মত্ত; তাহাতে স্বজাতির কি দুর্গতি, সে চিন্তা নাই। এইরূপ আপাতস্বার্থ-দৃষ্টি-পরায়ণ ও পরিণাম-দৃষ্টি-বিহীন হইয়া হিন্দু জাতি অধঃপাতে যাইতেছেন—ক্রমে বিনাশ

প্রাপ্ত হইবেন কিনা কে বলিতে পারে? গত সেন্সাস-বিবরণে একটি হৃদয়-বিদারক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রতি কয় জনের দৃষ্টি পড়িয়াছে? দৃষ্টি পড়িলেও কয় জন তাহার তীব্রতা অনুভব করিয়া জাতীয় কলঙ্ক ও দুর্গতি নিবারণার্থ আকাশ পাতাল তোলপাড় করিতেছেন? এই রহস্য—দুগ্ধপোষ্য বিধবা। হিন্দুর ঘরে বিধবার সংখ্যাই অধিক, ইহা সকলের জানা কথা। কিন্তু বিধবা অর্থে সচরাচর বয়স্কা, অন্ততঃ বালিকা বিধবা মনে হয়। সেন্সাসে এ দেশের শিশু-বিধবার তালিকা এইরূপ দিয়াছেন:—

১ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা	...	৫৩৫
২ " " " "	...	৫৭৪
৩ " " " "	...	৬৫১
৪ " " " "	...	৫৭৬
৫ " " " "	...	৩৮৬১

আর না। ৬ হইতে ১০।১২ বৎসর ধরিতে গেলে তালিকা ক্রমেই বাড়িবে। মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি পাঁচ বৎসর অতিক্রম করে নাই, ইহারা ত দুগ্ধপোষ্য শিশু; কিন্তু ইহারা সামাজিক নিয়মে বিবাহিতা হইয়া পতিহীনা হইয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে যাবজ্জীবন বৈধব্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া বিধবার দুর্ভাগ্য-ভার মস্তকে বহন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এই ৭।৮ হাজার হতভাগ্য রমণীর অনেকে বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া অচিরে পতিহীনা হইয়াছে। যাহা হউক, যে সমাজ এরূপ দারুণ সামাজিক অমঙ্গল দর্শন করিয়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে এবং তাহার প্রতীকারের উপায় অবলম্বনে উদাসীন, সে সমাজ জীবিত না মৃত? সে সমাজের আবার আত্মগৌরব ও অহঙ্কার করিবার আছে কি?

উল্লিখিত দুগ্ধপোষ্য বিধবাগুলি বিবাহ কাহাকে বলে জানে নাই, স্বামীর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই, অথচ তাহারা স্বেচ্ছামতে অথবা অভিভাবকের সহায়তায় পুনর্বিবাহে অনধিকারিণী। এদিকে অশীতিপর বৃদ্ধ ৫।৭ সংসার গত করিয়া এবং পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যদি নববরবেশে বিবাহযাত্রা করেন, সমাজের নেতৃগণ সাড়ম্বরে অনুযাত্রী হইয়া আমোদ সম্ভোগ করিবেন। স্ত্রীলোক কি মনুষ্য নয় এবং তাহাদের শরীর কি রক্তমাংসে গঠিত নয়? পুরুষদের মত তাহাদের কি সুখ দুঃখ অনুভব নাই? এদেশে কুলত্যাগিনীর সংখ্যা যে এত বেশী, বাল্যবিধবার সংখ্যাধিক্য কি তাহার কারণ নয়? সমাজ যাহাদের মুখপানে চাহে না, তাহারা সমাজের মুখ পানে কেন চাহিবে? সমাজকে স্বকৃত পাপের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। উপরে যে ৭।৮ হাজার দুগ্ধপোষ্য বিধবার কথা বলা গিয়াছে, ইহারা যদি কুপথগামিনী হয়, অথবা সহায় সম্পদ বিহনে যাবজ্জীবন দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে, সমাজ কি তাহার জন্য দায়ী নহেন? কিন্তু হায়! এই অভাগিনী-

দিগের দুঃখ ভাবিয়া কয়জন দুঃখিত এবং ইহাদিগকে ক্লেশসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কয়জন বা অগ্রসর? ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব এখন বিলোপ পাইয়াছে। হিন্দুসমাজ বৃথা আত্মাভিমান ও স্বার্থবুদ্ধি-দ্বারাই পরিচালিত—তাহাতে দয়া ধর্ম্ম পরদুঃখকাতরতা, এ সকলের আর স্থান নাই। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জন্য দারুণ মর্ম্মবেদনায় কি আক্ষেপই করিয়া গিয়াছেন! আজও সে আক্ষেপের কারণ কি নিরাকৃত হইবে না?

মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষার চর্চ্চা।

বড়ই আহ্লাদের কথা বঙ্গীয় মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে আপনাদের মাতৃভাষারূপে বরণ করিতেছেন এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় চিঠি পত্র লিখিতে, বক্তৃতা করিতে, পত্রিকা প্রচার করিতে—এমনকি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বামাবোধিনীর অনেক দিনের পরিচিতা মুসলমান গ্রাহিকা সকল আছেন এবং বামারচনা-স্তম্ভে কোন কোন মুসলমান বালিকার সুন্দর কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছে। "মিহির ও সুধাকর", "ইসলাম প্রচারক" প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্র পাঠ করিয়া আমরা বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকি। কবিবর হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীতের অনুকরণে মুসলমান-জাতির উন্নতির জন্য যে কবিতা লিখিত হইয়াছে এবং হজরত মহম্মদের জীবনবৃত্ত যেরূপ কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানদিগের মধ্যে কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। গত মাইকেল-উৎসবে কয়েকটী দেশহিতৈষী মুসলমান হিন্দু খৃষ্টানদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ও মধুসূদনের কাব্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন, তৎশ্রবণে আমরা মোহিত হইয়াছি। এদেশে বাঙ্গালী ও মুসলমান বলিয়া এক ভ্রান্ত প্রভেদ-কল্পনা আছে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশবাসী মুসলমানেরাও বাঙ্গালী এবং বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও মাতৃভাষা, ইহা তাঁহারা যত বুঝিবেন, এদেশবাসী হিন্দুদিগের সহিত ততই তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ হইবে এবং মাতৃস্তনের ন্যায় মাতৃভাষার সুধা পান করিয়া ততই তাঁহাদের চিন্তা, লিখন ও বক্তৃতাশক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। ইহা দ্বারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশেরও মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, বলা বাহুল্য।

মুসলমান লেখক কিরূপ সুন্দর বঙ্গভাষায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত "উপবাস" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী মিহির ও সুধাকর হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোককে বৎসরের মধ্যে কিছু কালের নিমিত্ত উপবাস করিতে ও তৎসহ নম্রতা বা দুঃখের অথবা শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতে দেখা যায়। পুরাকালের ইহুদীগণ বৎসরের মধ্যে কয়েক দিন উপবাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল উপবাস করিতেন। হজরত মুসা (আলা) কেবলমাত্র অনুতাপের দিন (day of atonement) উপবাস করিবার বিধান করেন। যাহা হউক আমরা তওরাতে (Old Testament) উপবাসের বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইহুদীগণ আজিও দুইটী উপবাস করিয়া থাকেন। প্রথমটী, অনুতাপের দিনে (day of atonement) করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা উপবাসী থাকিতে হয়। এই উপাবাসকে তাঁহারা Black fast বা 'কৃষ্ণোপবাস' নামে অভিহিত করেন। ইহা তাঁহাদের সপ্তম মাসের দশম দিনে পালন করিতে হয়। দ্বিতীয়টী, কেবল একদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পালন করিতে হয় এবং উহা White fast বা 'শ্বেতোপবাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য জাতির মধ্যেও উপবাস পালন করিতে দেখা গিয়াছে। প্রাচীন মেসেরবাসিগণ কিছুদিন উপবাস করিয়া, কিরূপে তাহাদের আইসিস দেবতার মহোৎসব সম্পাদন নিমিত্ত উদ্যোগী হইত, তাহা ইতিহাসের জন্মদাতা হিরোডোটাস স্বীয় পুস্তকে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এথেন্সে থেস্মোফোরিয়া পর্ব্বোপলক্ষে এবং সিরিস দেবতার পূজা উপলক্ষে উপবাস করিবার প্রথা সম্যক্ রূপে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও একাদশী, শিবরাত্রি প্রভৃতি তিথিতে উপবাসের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল জাতির মধ্যেই উপবাস-প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। মোট কথা, পুরাকালে লোকে অন্ন জল হইতে বিরত থাকিবার নিমিত্ত উপবাস করিত না, কেবল অনুতাপের নিমিত্তই উপবাস করিত। এমন কি, ইহুদীগণের মধ্যেও পরবর্ত্তী সময়ে উপবাসে বিরতির ভাব জন্মিয়াছিল। পিথাগোরীয়দের সংশ্রবে এবং প্রাচ্য জগতের সন্ন্যাসী বা ফকিরদিগের সংমিশ্রণে থাকিয়া ইহুদীদিগের মধ্যে এসেনীয়গণ সর্ব্বপ্রথমে উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কতিপয় গ্রন্থকারের মতে হজরত ইসাও তাঁহাদের নিকট উপবাসের উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ বিবেচনা করেন যে, হজরত ইসা (আলা) বা তাঁহার শিষ্যবর্গ উপবাসের নিমিত্ত কোন বিশেষ আদেশ প্রদান করেন নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টানেরা উপবাসকে স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে একটী ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য করেন। হজরত ইসার ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যুর দিন অর্থাৎ গুডফ্রাইডের দিন ভিন্ন অতি প্রাচীন সময়ে খৃষ্টানদিগের মধ্যে কোন-

রূপ সাধারণ উপবাসের বিষয় কুত্রাপি কোন স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান্‌গণ উপবাস ও বিরতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত দিবসগুলি খৃষ্টানের উপবাসের দিন বলিয়া গণ্য করেন। যথা—(১) লেণ্টের চল্লিশ দিন; (২) এম্বার ডেস অর্থাৎ লেণ্টের প্রথম সপ্তাহের, হুইটসণ্ডে সপ্তাহের, সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের এবং এডভেণ্টের তৃতীয় সপ্তাহের বুধ, শুক্র ও শনিবার; (৩) এডভেণ্টের চারি সপ্তাহের বুধ ও বৃহস্পতিবার; (৪) হুইটসনটাইডে ও মহাত্মা পিটর ও পলের ভোজের, অল সেণ্টসের এবং খৃষ্টমাসের পূর্ব্ব দিন। প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ উপবাস ও বিরতির মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ না করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী দিনে উপবাস পালন করিয়া থাকেন। যথা—(১) লেণ্টের ৪০ দিন; (২) চারি ঋতুতে এম্বার দিনে; (৩) হোলী থর্সডের পূর্ব্ব তিন দিন; (৪) খৃষ্টমাসডে ব্যতীত প্রত্যেক শুক্রবারে। রাজবিধানের দ্বারা অন্যান্য উপবাসের দিন নিরূপিত হয়।

হজরত ইসা স্বয়ং উপবাস করিতেন এবং অরণ্যমধ্যে তাঁহার চব্বিশ দিন উপবাসী থাকিবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উপবাস ব্রতের সহিত ধর্ম্মভাব যে বিশিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহরূপে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা তদ্দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে; —এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উপবাস সম্বন্ধে অনুতাপ বা অনুশোচনারই সমধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতপ্রবর সুলেখক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মোশেম (১) স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, শয়তানের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ ও তাহার দর্প চূর্ণ করণ জন্য এবং কোন কোন সংকুপিত দেবতার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত লোকে প্রথম প্রথম উপবাসকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া জ্ঞান করিত।

'চার্চ্চ হিষ্ট্রী' নামক গ্রন্থপ্রণেতা বলেন 'স্বকীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের কার্য্যকলাপের অনুকরণ ও তদঙ্কিত মার্গের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করা খৃষ্টানদিগের উপবাসব্রত পালনের অন্যতম কারণ।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হজরত ইসার (আলাঃ) অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি হইতেই খৃষ্টানদের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পর্ব্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যে সকল খৃষ্টান আপনাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে রণব্যাপারের সহিত তুলনা করেন, তাঁহাদের মতে উপবাসাদি খৃষ্টীয় সৈন্যগণের রক্ষাকরী উপদেবতার কার্য্য করিয়া থাকে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীরকে কষ্ট দিবার প্রথা খৃষ্টীয় চার্চ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, অন্যান্য চার্চ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেইরূপ

(১) মোশেম কৃত "ধার্ম্মিকদের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৩১ ও ৩৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাবে প্রচলিত ছিল; কিন্তু দৈহিক ও মানসিক শক্তিপুঞ্জের ধ্বংস সাধন ও নীচ সন্ন্যাসধর্ম্মের পরিপোষণ ব্যতীত উক্ত প্রকারে শরীরকে কষ্ট দিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। জনৈক খৃষ্টান কবি তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বিগণের উপবাস করিবার কারণ নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

খাদ্য দ্রব্য হায়! কোথাও না পায়
দরিদ্রেরা তেঁই করে উপবাস,
ভোজনে অক্ষম হের সে কারণ
রোগগ্রস্ত জন করে উপবাস;
লোভ-পরায়ণ যতেক কৃপণ,
সঞ্চয় কারণ করে উপবাস,
অধিক আহার করিবে আবার
ভাবি পেটুকেরা করে উপবাস;
এ মর জগতে ধার্ম্মিক সাজিতে,
কপটী যতেক করে উপবাস;
পাপ আচরিয়ে শাস্তি দণ্ড ভয়ে
ধর্ম্মভীরুজন করে উপবাস।

ইসলাম ধর্ম্মে রমজান মাসের উপবাস (রোজা) তিন প্রকারে পালন করিতে হয়।

প্রথমতঃ—ক্ষুৎপিপাসা দমন;

দ্বিতীয়তঃ—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিচয়কে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তকরণ।

তৃতীয়তঃ—পার্থিব সর্ব্ববিধ চিন্তা হইতে মনকে বিরত রাখা ও বিভুচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।

কোন ব্যক্তি ইসলাম প্রবর্ত্তিত বিধিসিদ্ধ উপবাস রাখিতে (পালনে) ইচ্ছা করিলে তাহার নিম্নলিখিত সর্ত্তত্রয় (নিয়ম) পালন করা আবশ্যক; যথা—

১। প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক।

২। সাবালক বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

৩। সুস্থমনা ও সজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কতক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রীতিমত প্রাত্যহিক উপবাস করিয়া আমাদের প্রবৃত্তনিচয়কে ভোগ্যবস্তু হইতে বিরত রাখা এবং আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে পবিত্র ও মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করা—এই দুই যুক্তিযুক্ত ও বৈধ উদ্দেশ্য ইসালাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত রোজা রাখা প্রথার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।"

মৌনি-সভা।*

পারস্য রাজ্যের আম্দিান নগরে একটি বিখ্যাত বিদ্বন্মণ্ডলীর সভা ছিল। এই সভার ব্যবস্থাবিধির প্রথম নিয়মটি এই—"সভ্যেরা অধিক চিন্তা করিবে, লিখিবে অল্প ও তদপেক্ষা অল্প কথা কহিবে।" এই সভা 'মৌনী' নামে খ্যাত হইয়াছিল,

* ফরাসী পত্র হইতে গৃহীত।

এবং পারস্যরাজ্যের প্রকৃত বিদ্বান্‌মাত্রেই ইহার সভ্য হইতে গৌরব বোধ করিতেন। 'মুখবন্ধনী, নামক একখানি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর পুস্তকলেখক মৌলবী জেব সাহেব, নগর হইতে সুদূরস্থ নিজ নিভৃত নিবাস হইতে শুনিলেন যে, মৌনি-সভায় একজন সভ্যের পদ খালি আছে। তিনি অবিলম্বে যাত্রা করিয়া আমিদান নগরের সমবেত সভ্যমণ্ডলীপূর্ণ সভাগৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, ও দ্বারবান্ দ্বারা সভাপতির নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন,"মৌলবী জেব সাহেব বিনীতভাবে ঐ শূন্য পদ প্রার্থনা করেন।" দ্বারবান তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল, কিন্তু মৌলবী সাহেব ও তাঁহার প্রার্থনাপত্র আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; ইতিমধ্যে শূন্যপদটী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সভ্যমণ্ডলী বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছায় একজন রাজকীয় প্রসাদভোগী অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, সহরের যুবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রশংসিত নবীন লেখককে সভায় স্থান দানে বাধ্য হইয়াছিলেন; এক্ষণে মৌলবী সাহেবের ন্যায় গম্ভীর চিন্তাপরায়ণ এবং প্রগল্‌ভতা ও বাচালতার শাসক স্বরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে সভায় স্থান দিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাগ্যে প্রার্থনাকারীর নিকট এই অশুভ ঘটনা প্রকাশ করিবার ভার পড়িল। তিনি ইহাতে বড় সুখী হইলেন না, এবং কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই বিষয় কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি একটি বৃহৎ জলপাত্র জলপূর্ণ করিতে বলিলেন, এবং এমন সুন্দররূপে পূর্ণ করাইলেন যে, আর এক ফোঁটা জল ঢালিলে তাহা উছলিয়া পড়িবে। অতঃপর তিনি দর্শনপ্রার্থীকে আনিতে সঙ্কেত করিলেন। জেব সাহেব যথার্থপাণ্ডিত্যসূচক সদ্ভাব ও সারল্য সহকারে প্রবেশ করিলেন। সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোন কথা না বলিয়া বিষণ্ণমুখে জলপূর্ণ পাত্রটি দেখাইয়া দিলেন। মৌলবী সাহেব তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, কোন পদ খালি নাই; কিন্তু কোনরূপে ভগ্নমনোরথ না হইয়া আর একজন সভ্যের প্রবেশে কোন ক্ষতি হইবে না—বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন। পদতলে একটি গোলাপের পাপড়ী পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন, এবং এমন ধীরভাবে সেই জলের উপরে ভাসাইয়া দিলেন যে, এক ফোঁটা জলও পড়িল না।

এই উদার ও সরল উত্তরে সকলে হাততালি দিয়া উঠিলেন। এইবার সভার নিয়ম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং হর্ষ-কোলাহল সহকারে জেব সাহেব অভ্যর্থিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার হস্তে নাম সহি করিবার জন্য ঐ সভার সভ্যতালিকার বহি প্রদত্ত হইলে তিনি নাম সহি করিলেন। তাহার পর চলিত প্রথানুসারে ধন্যবাদসূচক কোন কথা বলিতে হইত; কিন্তু প্রকৃত

'মৌনী-সভার' সভ্যের ন্যায় তিনি কোন কথা না বলিয়া ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন ০১০০—মার্জ্জিনে সভ্যসংখ্যা-নির্দেশক এক শত নম্বর রাখিয়া তাহার পূর্ব্বে একটি শূন্য বসাইয়া দিলেন, এবং নিম্নে লিখিয়া দিলেন "উহারা সংখ্যায় বেশী কিংবা কম হইল না। যাহা ছিল তাহাই রহিল"—১০০।

সভাপতি মহাশয় বিনীত সাহেবকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত সমান বিনীতভাবে উত্তর করিলেন। তিনি ঐ সংখ্যার পূর্ব্বে এক সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন, এবং লিখিলেন "উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ অধিক মূল্যবান্ হইল" ১০১০০।

শ্রীমতী অপরাজিতা দাসী।

আকাঙ্ক্ষা।

দেখ এ হৃদয়-তল, দেখ গো লুকানো স্থল,
কিবা আমি চাই,
চিনি না উদ্দেশ্য আশা, বুঝি না প্রাণের ভাষা
কেমনে বুঝাই?

দিয়াছি খুলিয়া দ্বার, খুঁজি লহ সেথাকার
যা আছে যথায়,
সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, যত আছে পরিপূর্ণ,
দেখ সমুদায়।

দেখ সে আকাঙ্ক্ষা, আশা, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, ভালবাসা,
বল, দুর্ব্বলতা;
যাহা শুভ্র, যাহা কালো, যাহা মন্দ, যাহা ভালো,
চির-নীরবতা।

উজল আলোকে আনি, দেখ মোর হৃদিখানি,
আমি শুধু চাই
তোমারি মহিমা ভরা একখানি বসুন্ধরা,
তোমা বিনা নাই।

তব জ্যোতিঃ শশী রবি, নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক সবি
উদার আকাশে,
বরষা, বসন্ত, শীত, ছয় ঋতু উপনীত
তোমারি বাতাসে।

লইয়া তোমারি হাসি, ফুল ফোটে রাশি রাশি
বিচিত্র বরণে,
তোমারি প্রেমের গীতি, শুনিবারে পাই নিতি
বিহগ স্বননে।

তোমারি করুণা বুকে, নদী ধায় সিন্ধু-মুখে
ছুটায়ে লহরী;
আমার প্রভাত নিশা, তোমাতেই মিলামিশা
সকলি তোমারি।

আমি শুধু একমনে তোমাময় নিরজনে
সাধি সে সন্ন্যাস,
তাহে লাভ শুভবুদ্ধি, পূত আত্মা, চিত্তশুদ্ধি
—এই অভিলাষ।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৭)

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, মমতাহীন ও নিরহঙ্কার হইয়া জীবনপথে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সার-ধর্ম্মলাভের উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আচার্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব উপদেশ সকলের অনুবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রের উপসংহার করিতেছেন।

যে ব্যক্তি এক দিকে সর্ব্বপ্রকার কামনা অর্থাৎ ধনকামনা, যশঃকামনা, সুখকামনা, প্রভুত্বকামনা, পুত্রকামনা, বিষয়কামনা প্রভৃতি সকল মনস্কামনা পরিত্যাগ করেন; অন্য দিকে সকল কাম্য বস্তুর প্রতি বীতস্পৃহ হন, অথচ জীবনের কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা ত্যাগী বা বৈরাগী। তাঁহারা কাম্য বস্তু ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর হইতে তাহার স্পৃহা বা কামনা দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বাহিরে ভস্মমাখা বৈরাগী, কিন্তু অন্তরে কামকামী। এরূপ ব্যক্তিরা সংসার অর্থাৎ জনসমাজ ছাড়িয়া যদি বনে গমন করেন, তাহা হইলেও সেখানে বিষয়ভোগের চিন্তা করিবেন এবং সুযোগ পাইলেই পুনরায় ভোগাসক্ত ও সংসারাসক্ত হইয়া যাইবেন। কত কঠোর যোগী তপস্বীর এইরূপে পতন হইয়াছে এবং তাঁহারা পুনরায় ঘোর সংসারী হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তরের বাসনা সমূলে দগ্ধ হইয়া না গেলে কোনও স্থানেই নিস্তার নাই। প্রকৃত ব্রহ্মযোগী সংসারে বাস করেন, বিচরণ করেন ও কার্য্য করেন; কিন্তু সংসারে তাঁহার শরীর মাত্র থাকে, তাঁহার মন তাহাতে যুক্ত বা আসক্ত হয় না। তাঁহার আত্মা ঈশ্বরে বাস করে, বিচরণ করে এবং তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ অবলম্বন স্বরূপ ধরিয়া তাঁহারই উদ্দেশে সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সংসার-বাসনার বিরামেই এবং ব্রহ্মকামনার প্রাবল্যেই বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানুরাগ প্রদীপ্ত হয়। ইহাতেই প্রাণের আরাম, হৃদয়ের তৃপ্তি এবং আত্মার শাশ্বত শান্তি লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মনের দুইটী অবস্থা আবশ্যক। এই দুই অবস্থা নির্ম্মমতা ও নিরহঙ্কার। মমতা কিনা 'আমার আমার' বলিয়া অনুভব। আমার বাড়ী, আমার বিষয় সম্পত্তি, আমার স্বামী স্ত্রী পুত্র পরিবার, এই মোহ বা অজ্ঞানতায় মুগ্ধ হইয়া জীব মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় এবং সংসারের অনিত্য বস্তু সকলের বিয়োগে শোকে মুহ্যমান হয়। স্বার্থের পরিবর্ত্তে যদি পরমার্থ ভাব আইসে অর্থাৎ কিছুই

আমার নহে, সকলই ভগবানের, যদি এইরূপ মনে হয়, তাহা হইলে সংসারে আর কাহাকেও অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। তাঁহার বস্তু তিনি দেন, তিনি লন, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? পরমেশ্বর সকল সময়েই যেমন শান্ত, তাঁহার যোগে তাঁহার ভক্তও সেইরূপ শান্ত হইয়া থাকেন।

অশান্তির আর একটী উপাদান অহঙ্কার অর্থাৎ আমি কর্ত্তা—আমি প্রভু—আমি আপনার ইচ্ছায় বা বলে সকলই করিতে পারি। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, সকলের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করে, এবং আপনার গরিমা স্থাপনেই ব্যস্ত হয়। এরূপ ব্যক্তির শান্তি কোথায়? যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা নিরহঙ্কার—শান্ত, দান্ত, ধীর, বিনয়ী। তাঁহারা জানেন ঈশ্বরই জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং তাঁহারা তাঁহার দাসানুদাস। তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ মস্তকে লইয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই মহিমা দর্শন শ্রবণ কীর্ত্তন ও প্রচারে ব্যস্ত হন। তাঁহারা সেবক হইয়া জগদীশ্বরের ও জগদ্বাসী জীবগণের সেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। যতই তাঁহারা দীনের দীন হইয়া দীননাথের শরণাপন্ন হন এবং প্রভুর কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন করেন, ততই তাঁহাদের শান্তি, আরাম এবং আনন্দ। স্থিতধীর লক্ষণা করিবার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ! সর্ব্বপ্রকার মনোগত-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্য যখন পরমাত্মাতে আত্ম তুষ্টি লাভ করেন, তখনি তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।* আবার এই প্রস্তাবনা শেষ করিবার সময়ে সেই কথা বলিলেন—যখন মানুষ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্পৃহাশূন্য, মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া জীবনের কর্ত্তব্যসাধন করেন, তখনই তিনি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

* প্রজহাতি যদা কামান্ সর্কান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

মিলন।*

শৈল সিংহ—যশলমীরের অন্তর্গত পুগলাধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র "সাধু"।

মাণিক রাও—মহিলবংশীয় এবং অরিষ্ত নগরের রাজা।

অরণ্যকমল—রাষ্ঠোরবংশীয় মন্দোর-যুবরাজ।

বীর সিংহ—মন্দোর-কর্ম্মচারী।

মহারাণী—মহিলরাজরাণী।

লাবণ্যবতী—'কর্ম্মদেবী' মহিলরাজ মাণিক রাওয়ের দুহিতা।

সুরমা—পূর্ব্ব মহিলরাজকন্যা।

চপলা—লাবণ্যবতীর সখী।

* রাজস্থানের "কর্ম্মদেবী" নামক ইতিবৃত্তমূলক কাব্যোপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান—মহিলরাজধানী অরিন্ত নগর।
রাজ্যপ্রান্তে মন্দির।
মন্দিরে লাবণ্যবতী ও সখীগণ, দূরে
শিবিকাসহ অনুচরগণ।)

চপলা—

"প্রতিদিন কেন দেবী! সহি ক্লেশ শত
এ দুর্গমে এস ইষ্ট দেবে পূজিবারে,
রাজ-গৃহে বিরাজিত দেবতা জাগ্রত,
কেন করিলে না তুমি অর্চ্চনা তাঁহারে?
এ যে গো নিবিড় বন—গেহ নিরালার,
ভয় হয় পুরুষের নিঃশঙ্ক পরাণে,
নারী-হৃদি সশঙ্কিত! হের চারিধার
শৈল-শৃঙ্গ ঘেরি, ভয় উপজে না মনে?
বলেছিলে এক দিন বলিবে আমায়
নির্জ্জনে কাহার লাগি কর উপাসনা,
বল দেবী, বড় সাধ জাগিছে হিয়ায়,
তিরপিত কর মোর অধীর বাসনা।"

লাবণ্যবতী—

শুন সখি! কেন করি কঠোর সাধনা—
এক দিন উদ্যানের মন্দির মাঝারে
ধ্যেয়ানে মগন ছিনু হারায়ে আপনা,
সহসা মেলিয়া আঁখি চাহিনু দুয়ারে
দেখিনু, এখনো মনে পড়িলে আমার,
হৃদয় উথলি উঠে কি যেন পুলকে!
সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তিখানি দেবী প্রতিমার,
আননে নয়নে তাঁর কি জ্যোতি ঝলকে!
বলিলেন মোরে চাহি, কি মধুর স্বরে,
মরমেতে দূরাগত বীণাধ্বনি প্রায়।
"কেন বৎসে! হেথা বসি আরাধিছ হরে,
কিশোরী! কামনা তব কি জাগে হিয়ায়?
প্রেমের কামনা হবে, প্রণয়ীর তরে
সহ ক্লেশ, কর বৎসে! আত্ম-বিসর্জন।
মহিলরাজ্যেতে এই নগর-প্রান্তরে
এখনো মন্দির এক আছে পুরাতন,
জাগ্রত দেবতা তিনি পূজিলে তোমার
পূর্ণ হবে মনোরথ একই বরষে।
প্রতি প্রাতে করো পূজা চরণে তাঁহার।"
এই বলি চলিলেন। আমি অবশেষে
বলিলাম "কে তুমি মা! ছলিতে আমায়
এসেছ কি এ ধরায় মহেশ-মোহিনী?
জান যদি বলে দাও ভবিষ্য ছায়ায়
পূর্ণ মনোরথ হবে, সত্য তব বাণী।"
সে কোমল স্বর সখি সহসা কে জানে
বজ্রধ্বনি সম মোর শ্রবণে পশিল,
সভয়ে উঠিনু আমি চাহি তাঁর পানে,
উজল নয়নে তাঁর জ্যোতি নিঃসরিল।
বলিলেন "সাবধান! কিশোরী বালিকা,
প্রণয়েতে আত্মহারা কোরোনা হিয়ায়।
অকালে ঝরিয়া যাবে কুসুম কলিকা,
বিফল মিলন শুধু হবে এ ধরায়।
কোরো পূজা মহেশের পবিত্র চরণ,
আত্মজয়ী হ'য়ো বৎসে! দোষ যাবে দূরে,
প্রতিদিন অষ্টশত কুসুম রতন
সহস্রেক বিল্বপত্র অর্পিও তাঁহারে।"
সহসা সে মূর্ত্তি যেন মিশাল কোথায়,
চিত্রিত পুতলী প্রায় রহিলাম চেয়ে।
তার পর তুমি সখি আসিলে সেথায়,
লভিলাম শক্তি যেন তোমারে হেরিয়ে।

চপলা—

কাহার প্রেমের লাগি করিছ কামনা,
আপনিত প্রেমে বদ্ধ ওই রাঙ্গা পায়

মন্দোর-কুমার সখি, তবুও বাসনা—
আরো কি সুদৃঢ় কোরে বাঁধিতে তাঁহায়?

লাবণ্যবতী—

থাক সখি. বেলা হল কথায় কথায়,
যাও ত্বরা করি সবে আনগে ডাকিয়া,
ফুল তোলা হল নাক ফিরিছে কোথায়,
যাই মন্দিরেতে, বেলা যেতেছে বহিয়া।

(চপলার প্রস্থান)।

(অলক্ষ্যে শৈলসিংহের প্রবেশ।)

লাবণ্যবতী—

"এই সবে শরতের প্রথম বিকাশ,
পল্লবিত তরু লতা বরষার শেষে।
কেনই জীবন এত হয়েছে উদাস,
কালো মেঘরাশি বুকে ছাইতেছে এসে।
বেশী দিন নাহি আর মাঘী পূর্ণিমার,
বৎসরেক পূজা মোর হয়ে যাবে শেষ।
ইষ্ট দেব কই তুষ্ট হলেন পূজায়,
সহি সেই তুষানল—হৃদয়ের ক্লেশ।
বসন্ত-পূর্ণিমা দিনে মন্দোর-কুমার
বর-বেশে এসে মোরে করিবে বরণ।
কি করে ভুলিব "তাঁরে" কি করে আমার
হৃদয় অন্যের প্রেমে হইবে মগন?
একে ভালবেসে প্রাণ সঁপেছি সাদরে,
অন্যে পুনঃ এ হৃদয় দিব কি করিয়া?
অসতী হবনা কভু এ ছার সংসারে,
লভিব অতুল শান্তি আত্ম বিসর্জিয়া।
সখীরা জানেনা সবে কেন এ কামনা,
বহিতেছে প্রেমরাশি উদ্দেশে কাহার!
বুঝি বিধূমিত হল জীবন-বাসনা,
শৈল তুমি এত দিন কোথায় আমার"—
সহসা কোমল কার করের পরশে
চমকি চাহিলা বালা, চিত্রার্পিত প্রায়
রহিল চাহিয়া মুখে যুবা, অবশেষে
বলিল মধুর বাণী জড়িত সুধায়।

শৈলসিংহ—

"লাবণ্য আনন্দময়ি! প্রেমের প্রতিমা,
গোপনে এসেছি দেবি! দেখিতে তোমার,
তোমার অতুল প্রেম নাহি যার সীমা
আত্মহারা করি এবে এনেছে আমায়
নিকটে তোমার, কেন বিষণ্ণ চাহনি
হৃদয়ের শিরা টানি ফেলিছে ছিঁড়িয়া।
কি দুখে মলিন মুখ, কেন বিষাদিনী
প্রিয়তমে অভাগারে আছিলে ভুলিয়া!

লাবণ্যবতী—

"ভুলি নাই প্রিয়তম, এ জীবন মোর
শুধু তব প্রেমময়, ভুলেছি সকলি
নীরবে প্রেমের মোহে রহিয়াছি ভোর।
যদি সখা প্রেমব্রত স্বপন কেবলি—
জীবনেতে আসিত না দারুণ নিরাশা!
এই সবে জীবনের বিকাশ মধুর,
তবে কেন এরি মাঝে ফুরায়েছে আশা,
দুঃখ-গীতি অবিশ্রান্ত জাগাতেছে সুর
কতদিন এ প্রণয় রবে লুকাইয়া?
প্রকাশ করিতে মানা কোরোনা আমায়।
মন্দোর-কুমার সখা সহসা আসিয়া
এ বন্ধন নিমেষেতে ছিঁড়িবে গো হায়!
শুনিয়াছি সখীমুখে জননী আমার
বলেছেন 'আভরণ আসিবে সত্বরে,
আসিবে মন্দোর হতে মন্দোর-কুমার',
ফুরাল প্রণয় বুঝি এতদিন পরে।
অপরের চরণেতে বিবাহ-শৃঙ্খলে
কি করে এ হিয়া মোর বাঁধিব গো বল?

হৃদয় জলিয়া তাই যায় দাবানলে,
নয়নে উথলে তাই ম্লান অশ্রুজল।"

শৈলসিংহ—

"কি বলিব প্রিয়তমে! সেই এক দিন
আহত অতিথি হয়ে আসিনু হেথায়,
সেই হতে ওই তব নয়ন মলিন
স্বর্গীয় অতুল প্রেম ছড়াল হিয়ায়।
আমি ছিনু দীন হীন, তুমি কত দূরে—
দেবী-প্রতিমার মত সৌন্দর্য্য ছায়ায়
বিরাজিত আপনার মহিমা শিখরে,
কি সাধ্য আমার দেবী নেহারি
তোমায়?
প্রতিদিন সযতনে রোগ-শয্যা পাশে,
সুরভিত ফুলদল কে দিত সাজায়ে?
প্রত্যূষে নয়ন মেলি শুধু কার আশে
আত্মহারা দুয়ারেতে রহিতাম চেয়ে!
মূর্ত্তিমতী করুণা যে লয়ে মধু হাসি
প্রত্যহ উষার সহ রুগ্ন কক্ষে মোর
আসিতেন, দুটি করে লয়ে ফুলরাশি।
সে ছবিতে এখনও হয়ে আছি ভোর।
তৃষার্ত্ত অধরে কেবা যোগাইত বারি,
ওই রূপরাশি দেবী যে দিন নেহারি,
হৃদি বাঁধা সেইদিন ওই চরণেতে।
কি করিব বল দেবি! জনক তোমার
দীন-হস্তে দিবেন কি দুহিতা রতন?
পাণি-প্রার্থী তব শুনি মহিল-কুমার
করেছেন এ হৃদয়ে অশনি ক্ষেপণ।
মন্দোর-কুমার দেবি! উচ্চ কুল মানে
কুমারীর উপযুক্ত সেই যোগ্য পতি।
আমি দীনহীন বল কে মোরে বাখানে,
মন্দোরে দিবেন তোমা, তিনি দৃঢ়মতি।"

লাবণ্যবতী—

"কি উপায় আছে আমি কি করিব
বল?
সাক্ষী দেবাদেব আর মা জননী সতী,
সঁপিনু তোমারে এই হিয়া দুরবল,
স্বরগে মরতে থাকি, তুমি মোর পতি!
ত্যজিব এ ছার প্রাণ, কখনো জীবনে
একে ভালবাসি, নাহি সঁপিব অপরে,
তুমি স্বামী, গতি মোর জীবনে মরণে,
রাখ, মার, যাহা ইচ্ছা বলিনু তোমারে!"

শৈল—

প্রিয়তমে! যাই তবে মনে রেখো তবু,
বাসন্তী-পূর্ণিমা অগ্রে চতুর্থীর দিনে
সাক্ষী দেবাদেব বাক্য টলিবেনা কভু
হরিয়া লইয়া যাব তোমারে গোপনে।
দুচারিটি সখী লয়ে পূজিবার ছলে
এসো হেথা প্রিয়তমে, সৈন্যদল নিয়ে
লুকায়ে রহিব আমি ঘন বৃক্ষতলে,
সহসা আক্রমি তোমা লইব হরিয়ে।
রুক্মিণীর পরিণয় অপূর্ব্ব গাথায়,
যা লিখেছে তাই পুন পাবে দেখিবারে—
মন্দোর-কুমার যাবে শিশুপাল প্রায়,
বাহুযুদ্ধে এ নিখিলে কে জিনে আমারে?
হৃদয়ের রাণী তুমি হবে রাজরাণী,
করিনু শপথ আজি দেবতা-সম্মুখে,
নতুবা বীরের মত কাটি যুগ্ম পাণি
হরষে ঘুমাব আমি অনলের বুকে।
ভুলোনাক প্রিয়তমে যাই হেথা হতে,
ওই দেখ আসিতেছে সখীরা তোমার।
স্থান দিও অভাগারে ওই হৃদয়েতে,
আরাধ্য কিছুই মোর নাহিক যে আর।

লাবণ্যবতী—

কেমনে ভুলিব বল জাগ্রৎ স্বপনে
নিশিদিন ওই মুখে হারাতেছি সবি।
প্রিয়তম এই ক্ষুদ্র হৃদয়-আসনে
শুধু ওই আঁকা একি তব মুখচ্ছবি।
যাও শীঘ্র, এলো ওই সখীরা আমার,
মনে রেখো উপবনে সেই বাপী-তীর,
ঘন বৃক্ষ ছায়া দিয়ে ঘেরা চারিধার,
এসো সেথা শেষ যামে নিশি চতুর্থীর।

শৈলসিংহের প্রস্থান।

চপলা ও সখীদের প্রবেশ।

চপলা—

"এখনো হেথায় একা রয়েছ কুমারী!
নিঃশঙ্ক তোমার হৃদি, ধন্য বলি তায়,
প্রভাতে ঘনান্ধ বন গাছ পালা ঘিরি
আচ্ছন্ন রয়েছে যেন চির-তমসায়।
কবে শেষ হবে তব এই উপাসনা?
সুন্দর মার্জিত সেই উত্থান-মন্দিরে
পূরিত না কেন তব কিসের কামনা,
এত ক্লেশ সহিতেছ তুমি যার তরে।"

লাবণ্যবতী—

এত বেলা গেল আজি তোমাদেরি তরে,
একমনে চিত্ত স্থির আজকে করিয়া
আরাধনা করিব গো দেব মহেশেরে,
তোমরা গাঁথিও মালা দুয়ারে বসিয়া।

(ক্রমশঃ)

পত্র।

প্রিয় শ—হিন্দু নারীর তীর্থযাত্রাই শোভা পায়, দেশ ভ্রমণ কথাটা তত যেন ভাল লাগে না। যে রকমেই বুঝিয়া লও, তোমাকে এ প্রবাস যাত্রার সংবাদ দি। ১৯০৩ সালের প্রারম্ভেই ২৫ শে জানুয়ারী আমরা তিন জনে দুটি শিশু সন্তান লইয়া বাড়ী ছাড়িলাম। বাঙ্গালির মেয়ের বিদায়-পর্ব্বটা অবশ্যই সকরুণ। নীরব ছল ছল নেত্রপূর্ণ মুখগুলি পশ্চাতে রাখিয়া আমরা রাত্রি ৯ টায় বম্বে মেলে যাত্রা করিলাম। গাড়িখানি আপন কর্ত্তব্য অনুসারে শত শত যাত্রীর ভার লইয়া ছুটিল। গতিত কেহ ফিরাইতে পারেই না, ইহা সৃষ্টির নিয়ম।

নৈশ গগন চন্দ্র-তারকায় পরিশোভিত, তথাপি পথ অন্ধকারময়। প্রান্তর গুলিও তরুলতা বক্ষে করিয়া যেন ঘুমাইতেছে। সকলই নীরব, কেবল ট্রেণখানি ঝম্ ঝম্ শব্দে চলিয়াছে। ক্রমেই রজনীর বয়োবৃদ্ধি হইয়া আসিতে লাগিল। তরুণ সান্ধ্য জীবন উত্তীর্ণ, পূর্ণাবয়বে দ্বিপ্রহরে যৌবনে উপনীত হইল। রজনী এখন সম্পূর্ণ শান্তিময়ী, শতসূর্য্য তাহার আঁধার ঘুচাইতে পারিবে না। আমিও চারি পাশের নিস্তব্ধতা দেখিয়া কেবল আমার প্রিয়জন সম্বন্ধে কতই তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। নিরিবিলিই চিন্তার আধার, যা হোক উঠা বসা করিয়া করিয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভোর পাঁচটার সময় আগ্রা

পঁহুছিলাম। সেখানে আমাদের একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সমস্ত দিবস বিশ্রাম করা গেল ও এই অল্প সময়ের মধ্যে আগ্রার সৌন্দর্য্যময়ী প্রাসাদাবলী দেখা হইল। বিখ্যাত মমতাজমহলের কথা আমি আর কি বলিব? ইহার সুষমার গান অনেকেই গাইয়াছেন। উহা দেখিয়া আমার মনে হইল সে অসামান্যা জগদ্বিখ্যাতা সুন্দরীর অনুরূপ বুঝি এই সমাধি-স্থল। শ্বেতাঙ্গিনী একটি ইংরাজ মহিলা উক্ত তাজমহলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন।

সেই শ্বেতমর্ম্মর-সজ্জিত সমাধির নিকট গিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন হৃদয়ে এক-প্রকার অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর শান্তভাব আসিয়া অন্তর বাহির পূর্ণ করিল। সম্রাটের পত্নী-প্রেম ঐ মর্ম্মর প্রস্তরের প্রত্যেক লতা পাতা ও পুষ্পে পুষ্পে এখনও ফুটিয়া রহিয়াছে। যদিও তাঁহার একাধিক মহিষী ছিল, তিনি প্রণয় বিভক্ত করিয়া দিয়াও মমতাজ মহলের অংশে এত ঢালিয়াছিলেন, যে সে প্রাণে অকূল জলধি-প্রেম বিস্তারিত হইয়াছিল। তাই কি তিনি সর্ব্ববলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন। সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে যেন নিস্তব্ধতার নীরব মাধুরী এই গাইতেছে :—

উঠ জাগগো সুন্দরী,
মেলগো কমল আঁখি,
পাষাণে ফুটেছে ফুল
প্রেমের গৌরব মাখি।

আমরা সেই শ্বেত সৌধমালা চরণে দলিয়া দলিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম এবং তাজমহলের পাদদেশ-শোভিত বিনোদ উদ্যানের শ্যামল পত্র ও সৌরভিত পুষ্পদলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সত্বর বাহির হইলাম।

পরে আমাদের গাড়ীখানি আগ্রার দুর্গাভিমুখে সত্বর ধাবমান হইল। গাইড মহাশয়ের পরামর্শানুসারে একেবারে দেওয়ান ও আমখাসের নিকট গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। ইহা একটি প্রকাণ্ড দালান, শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। দিল্লীর মতন এখানেও বেগমগণের উপাসনালয় মতি-মসজিদ নামে খ্যাত, তবে দিল্লীর অপেক্ষা বড়। তার পর নাগিনা মসজিদ ও বাদসাহের তখত্ তাউস খানি ঐ খানে ধূলিসংযুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে, যেন বাদসাহের সঙ্গে সঙ্গে উহারও দেহখানি প্রাণবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই ঐ শবময় সিংহাসনখানি ধূলিরূপ কাক শকুনি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। শুনিলাম, লর্ড কর্জন না কি জীর্ণসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পরে বাদশাহের অন্দর মহল, ভোজনাগার, শয়নাগার, নৃত্য-গীত-ক্রীড়াগার—প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ অতীত ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। পরদানশিন্ বেগমগণ ঐ দুর্গমধ্যেই বাস করিয়া পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষিত সকল সুখ উপভোগ করিতেন। এই প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য্য এখন কেবল শ্বেত মর্ম্মর রক্ষা করিতেছে, বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন আর কিছুই নাই। ইহার পরে শিশমহল দেখিলাম।

উহা কেবল স্নানাগার মাত্র। গৃহটি হম্মামের উপযোগিতায় নির্ম্মিত, খিলান করা ও নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গিন কাচখণ্ডে বিনির্ম্মিত। দেওয়ালের অভ্যন্তরে আলোকাধার, উহার মধ্যে যখন শতাধিক মোমবাতি জ্বলিত, দ্বার বন্ধ করিয়া সূর্য্যালোক রুদ্ধ করিয়া দিলে পরমরূপবতী ভামিনীগণের সৌন্দর্য্য উহার অভ্যন্তরে বিবিধ বর্ণের কাচখণ্ডের সহিত হীরকপ্রভারূপে খেলিতে থাকিত। বিলাসী মুসলমান জাতি পার্থিব সুখের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারে!

সেই প্রকাণ্ড দুর্গমধ্যে যবন-পরিবেষ্টিতা রাজপূতবালা যোধাবাইর মহল দৃষ্ট হইল। হিন্দু রাজকন্যা স্বীয় আবাস মুসলমানগণ হইতে বিভিন্নাকৃতি করিয়াছিলেন। যোধপুরীর প্রাসাদ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। তিনি যবন-গৃহিণী হইয়াও হিন্দুধর্ম্ম যাজনা করিতেন, এখনও প্রতীয়মান। তাঁহার মহলের মধ্যে একটি হোমকুণ্ড দেখা গেল। পূজার স্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। অতঃপর দেখিলাম সোমনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ গেটটি সেই দুর্গমধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সুন্দর কারুকার্য্য এখনও প্রাচীন শিল্পীর গৌরব রক্ষা করিতেছে। ক্রমেই বেলা হইয়া উঠিল। একটি ইংরাজ সৈনিক আসিয়া জানাইলেন যে আর এখানকার ফটক খোলা থাকিবার সময় নাই; সুতরাং আমরা নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে ৮টার মেলে বম্বে যাত্রার সময়। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম আর সে সত্বরতা নাই—আজিকেও "লেট"। আমরাও ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমের দৃশ্য কি এক উদ্বেগপূর্ণ! কখন গাড়ী আসিবে, কখন গিয়া বসিবার স্থান অধিকার করিব। এই সকল দেখিয়া মনে হইতেছিল আমাদের যাওয়া আসার গতি সর্ব্বত্র এক, তবুও কেন সকল সময় এক-প্রাণ হইয়া থাকিতে পারি না। এই প্ল্যাটফরমের মত সংসার-দৃশ্য। এখানেও পাপ ও পুণ্যের বোঝা কাঁধে বহিয়া বেড়াইতেছি। কেহ বা ভারাক্রান্ত—যাইবার জন্য ব্যাকুল, কেহ বা সুখস্রোতে গা ঢালিয়া ঘুমাইতেছেন, আর কেহ যাইবার জন্য পথ-সম্বলের আয়োজন করিতেছেন। এই সকল চিত্ত-আন্দোলনের মধ্যে ট্রেণখানি সবেগে আসিয়া উপস্থিত। আর কেহ কাহারও মুখ তাকাইল না, সকলেই স্ব স্ব স্থান অধিকারে ব্যতিবস্ত। আমি যদিও একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, তথাপি যথাস্থানে দাঁড়াইয়া ভ্রাতার অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ভায়া দুইটি কুলি লইয়া আসিয়া আমাকে সত্বর যাইতে কহিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলাম। সেখানে শ্বেতাঙ্গিনীর আলয় হইয়া পড়িয়াছে। আমি একা বাঙ্গালীর মেয়ে, যা হউক মুখে সাহস লইয়া বসিলাম। সেখানে "লেডিজ রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট" দেখিয়া ভরসা হইল। তবুও প্রাণে শ্বেত কৃষ্ণের ভেদাভেদ-জনিত একটা

উদ্বেগ রহিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ সেথানেও ঘরকন্না বিস্তার করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্কেত হইল। এইবার বিদায়ের পালা। এই স্থলে বহুদিনের একটি ধারণা অপসারিত হইল। আমার বিশ্বাস ছিল ভারতবাসিনীগণেরই অন্তঃকরণ এত কোমল যে তাঁহারা ক্ষণেক বিদায়েও ব্যথিত হইয়া পড়েন। শিশির-বিন্দুস্বরূপ অশ্রুজল তাঁহাদের নয়নপ্রান্তে যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সুসভ্য বীর-নারী ইংরাজমহিলাদিগের তেমন নহে, তাঁহাদের অন্তঃকরণ সামান্য আন্দোলনে টলটলায়মান হয় না। সহযাত্রিণীগণের মধ্যে কাহারও মাতা ভগ্নী, কাহারও স্বামী বন্ধু বিদায় দিতে আসিয়াছেন। ট্রেণের হুইসল কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র বদন রক্তিমাভ হইয়া নয়নজল গণ্ডস্থল বহিয়া করুণ বিদায় চাহিল ও প্রতিদানে আশীর্ব্বাদ, প্রণাম ও স্নেহ প্রেমের অকৃত্রিম নিদর্শন স্বরূপ পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া অভিনয় শেষ করিলেন। অনিমেষচক্ষে কেবল সেই মুহূর্ত্তের চিত্রখানি দেখিতেছি ও নিজের প্রবাসযাত্রায় সকল পরিজন ছাড়িয়া স্নেহ প্রীতির অভাব অনুভব করিতেছি। এই অবসরে বেলা দশটার গাড়ি ছাড়িল। খানিক ক্ষণ পরে একটি একমাসের শিশু অবলম্বনে আমরা পরস্পরে আলাপ আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে সকল মেম সাহেবেরই শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া গেলাম। এইবার নির্ভয়ে চলেছি। উচ্চ নীচ প্রান্তর, কোথায়ও বা অদূরে পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইল। গোয়ালিয়র ষ্টেষণ হইতে মহারাজার কেল্লা দেখা গেল। পরে মধ্যাহ্নবেলায় মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি উপস্থিত হইলে জগৎ প্রখর কিরণমালায় উত্তপ্ত হইয়া শ্রান্তকলেবর হইলে ট্রেণখানি বুঁদেলখণ্ডে পদার্পণ করিল। তৎপরেই বীরমহিলা লক্ষ্মীবাইর লুপ্তরাজত্ব ঝাঁসীতে প্রবেশ করিলাম। এই ষ্টেষণটি অপেক্ষাকৃত বড়, এখানে ট্রেণ অধিকক্ষণ থাকে, সাহেবেরা লঞ্চ ভোজন (জলযোগ) করেন। তাই এখানে নামা উঠার ধুম পড়িয়া গেল। আমাদের একজন যাত্রী কমিয়া গেলেন। অবশিষ্টেরা সেই অবসরে প্রশস্ত স্থানের জন্য অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে গাড়ী আবার ছাড়িল। আমার সঙ্গিনীগণের আকৃতি প্রকৃতি কথাবার্ত্তা হাব ভাব সকলের মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই ছিল না। সমস্ত দিনে নানা প্রকারের আহার পান ও বিবিধ প্রণালীতে বিভিন্ন সময়ে বেশ পরিবর্ত্তন! তবে বিবীদিগের সাহস ও নির্ভীকতা বঙ্গরমণীর অপেক্ষা যথেষ্ট, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সতীর প্রতিজ্ঞা।*

"পবিত্র ত্রিদিব ধাম ধরণীমণ্ডলে
সতীর ভূষণে নারী বিভূষিতা হ'লে,
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?"

১। জীবনাবধি স্বামীর অমতে একটীও কার্য্য করিব না; মিষ্টভাষিণী, সরলান্তঃকরণা ও পবিত্র প্রেমময়ী হইব।

২। স্বামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কখনও কটুকাটব্য বলিব না, এবং স্বামীকে বিদ্বেষ-ভাবের কথা বলিব না বা কখনও বিদ্বেষ চক্ষুতে দেখিব না।

৩। যদি প্রাণ-বিয়োগ হয়, তথাপি যাহাদ্বারা তাঁহার শারীরিক কিংবা মানসিক আঘাত হইতে পারে, এমন কার্য্য, কথা বা চিন্তা করিব না। বরং যাহাতে তাঁহার সন্তোষ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা [illegible]ব।

৪। কেবল আত্মসুখভোগের নিমিত্ত স্বামীকে চিন্তা বা স্মরণ করিব না।

৫। পতির সম্মতি ব্যতীত অর্থব্যয় করিব না এবং অনর্থক ব্যয়শীলা হইব না।

৬। পতির প্রদত্ত ধন অতি আদরপূর্ব্বক এবং হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিব।

৭। আপন অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির আশয়ে স্বামীকে উত্ত্যক্ত বা বিরক্ত করিব না।

৮। সদ্বিবেচিকা ও বুদ্ধিশালিনী হইয়া ও জীবনের ধর্ম্ম জানিয়া পতির সেবা ও তাঁহার সমস্ত পরিবারের কার্য্য এবং সন্তানাদি প্রতিপালন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব, এবং গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইব।

৯। পতির গুরুজনকে ত্যাগ করিয়া পতির সহিত স্থানান্তরিত হইব না, বরং যথেষ্ট ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিব।

১০। আপনার নিমিত্ত স্বামীর অর্থ, সময় ও অন্যান্য বিষয় যাহাতে অল্প ব্যয় হয় এমন চেষ্টা করিব।

১১। পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইব।

১২। পতির সেবার জন্য দিন রাত্রি প্রস্তুত থাকিব, কখনও কাতর হইব না।

১৩। অশ্লীল কথোপকথন ত্যাগ

* প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "স্ত্রীকুল-হিতসাধিনী সভা" হইতে এতৎসংলগ্ন প্রতিলিপির মূল প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়। এখন এই সভা বর্ত্তমান আছে কিনা কিংবা প্রকাশিত পত্রখণ্ড পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হয় দেখিয়া এক খণ্ড প্রতিলিপি আপনার গোচরে আনিলাম, সহৃদয়া পাঠিকা ভগ্নীদিগের উপকারে আসিবে জানিলে প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিঃ শ্রীঅপরাজিতা দাসী।

করিব; বহুভাষিণী হইব না, ও স্বামি-নিন্দাবাদে রুষ্ট হইব।

১৪। পতির উপরে কখনও কর্ত্তৃত্ব করিব না।

১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়-পাত্র বা পাত্রী, সতত তাঁহাদিগের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকিব, এবং বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজনাদি করাইব।

১৬। যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন সহকারে পতিকে বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকী-দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিব।

১৭। স্বামী দুরাচার ও অসৎস্বভাব হইলে তাঁহাকে সৎস্বভাব-সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন করিব।

১৮। স্বামী নিষ্ঠুর ও কর্কশভাষী এবং ব্যয়কুণ্ঠ হইলে, অলোভী হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে বিনম্র বেশ ধারণ করিব।

১৯। স্বামীকে কখনও অর্থসম্বন্ধে বা পরিবার প্রতিপালনে কুমন্ত্রণা দিব না।

২০। স্বামীর ভোজনান্তে ভোজন এবং শয়নান্তে শয়ন করিব।

২১। স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে কখনও অপবিত্রভাবের কথা বলিব না, কি অপবিত্রাচারণ করিব না; সর্ব্বদা লজ্জাশীলা ও শান্তশীলা থাকিব।

২২। পতি যে ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

২৩। মলিন বেশে বা বিষণ্ণবদনে স্বামীর সম্মুখীন হইব না। প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশ ভূষায় সুচারু ভোজন দ্রব্য দ্বারা সন্তোষ সাধন করিব।

২৪। স্বামীর হিতোপদেশপূর্ণ কথা-বার্ত্তায় কখনও তাচ্ছিল্য করিব না।

২৫। দ্বার-দেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিব; অনন্তর তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইলে সাহাস্য আস্যে সম্ভাষণ করিব। তিনি কোন কার্য্যে দাসীকে নিয়োগ করিলে স্বয়ং সেই কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব।

২৬। পতি যে সকল কথা বলিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও কদাচ অন্যের নিকট প্রকাশ করিব না।

২৭। স্বামীর বিরস বদন দেখিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা নিবারণের চেষ্টায় থাকিব।

২৮। স্বামীর প্রণয়পাত্রী বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করিব না।

২৯। অল্প কারণে স্বামিসন্নিধানে অভিমানিনী হইব না।

৩০। পতি ধনহীন, রুগ্ন, বা মূর্খ হইলেও মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিব না।

৩১। ক্রোধপরবশ হইয়া স্বামীর প্রতি কর্কশ ভাষা দ্বারা সমান উত্তর করিব না।

৩২। স্বামী বা গুরুজন হইতে উচ্চ আসনে বসিব না এবং তাঁহাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য বাটীতে গমন করিব না।

৩৩। সৎকুলজাতা পুণ্যশীলা পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্যভাব অবলম্বন করিব; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপলা অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিব।

৩৪। কখনও অন্য পুরুষের সহিত এক শয্যায় উপবেশন করিব না।

৩৫। একাকিনী অন্য পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিব না।

৩৬। পরিহাসক্রমে অন্য কোন পুরুষের অঙ্গ বা বস্ত্র ধারণ করিব না।

কায়স্থ-মহিলাগণ সমীপে নিবেদন।

(প্রাপ্ত)।

আপনারা অনেকেই অল্পাধিক পরিমাণে অবগত আছেন যে কায়স্থের জাতীয় উন্নতি, সামাজিক সংস্কার, জাতীয় বর্ণ-নির্ণয়, বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ, শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন প্রভৃতি সমাজহিতকর বিষয় সকল, বিগত দুই বৎসর হইতে বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছে। তজ্জন্য কলিকাতায় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থগণের উৎসাহ ও যত্নে অনেকানেক কায়স্থ সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মফঃসলস্থ অনেক সভা সমিতি কলিকাতার মূল সভার শাখা স্বরূপে উহার নিয়মাবলী অবলম্বন করতঃ এবং কতকগুলি স্ব স্ব নিয়মাদির দ্বারা পরিচালিত হইয়া "কায়স্থ সভার" মূল উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতেছে। ফলতঃ কায়স্থ সাধারণে এক্ষণে কোন না কোন সভা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা প্রথমতঃ কায়স্থের জাতিনির্ণয় বা সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া ৺ কাশী-ধামের সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজন-পূজ্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ মত ও বঙ্গের পণ্ডিতপ্রধান স্থান সকলের পূজ্যপদ সুপণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট হইতে যথাশাস্ত্র মতামত সংগ্রহ করিয়া এক্ষণে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ শ্রীশ্রী৺ চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান বিধায় তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। ইহাও মীমাংসিত যে, কায়স্থ পুরুষ বা কায়স্থ-মহিলাগণ দাস ও দাসী শব্দের পরিবর্ত্তে "বর্ম্মা" ও "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন।

বহুদিন হইতে প্রচলিত ও আচরিত ব্যবহার ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দুইদিন দশ দিনে অথবা দুই জন দশ জনের চেষ্টায় বা উদ্যোগে তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। চির-প্রচলিত আচার ব্যবহারাদির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যেমন দেশব্যাপী চেষ্টা ও সমবেত উৎসাহের প্রয়োজন, সেইরূপ

তাহা অনেক সময়-সাপেক্ষ। দেশ দেশান্তরের কায়স্থ মহোদয়গণ যেরূপ উৎসাহ, চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহের সহিত কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয় কায়স্থগণ অতি অল্পকাল মধ্যে সমাজ-সংস্কাররূপ মহাব্রত উদ্‌যাপিত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব, সমাজের অবস্থা ও শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থগণের সংখ্যার বিষয় চিন্তা করিলে এইরূপ ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, কেবল বঙ্গের কায়স্থগণকে লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে চলিবে না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ প্রবাসী কায়স্থগণের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং এই সকল বিষয় যতই আন্দোলিত হয়, যতই দেশব্যাপী হয়, যতই প্রাণস্পর্শী হয়, ততই মঙ্গল ও ততই সুখের বিষয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠা বামাবোধিনীর পাঠিকা মহোদয়াগণের মধ্যে শিক্ষিতা কায়স্থ-মহিলার সংখ্যা অল্প নহে। সুতরাং আমরা (কায়স্থেরা) আশা করি অতঃপর কায়স্থমহিলাগণ আমাদের এই সংস্কার ও জাতীয় জীবন সংগঠনে সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ বা উদাসীন থাকিবেন না। যিনি যেরূপে পারেন, যাঁহার যে উপায়ে সুবিধা এবং যিনি যতটুকু পরিমাণে আমাদের উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতে পারেন, তাহা করিতে ত্রুটি করিবেন না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা কর্ত্তব্যপথে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের পুর-মহিলাগণ তদপেক্ষা অধিক পারেন। কারণ আমাদের বংশধরগণের লালন পালন ও শিক্ষার সহিত যদি তাঁহারা আমাদের বর্ণধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব সন্তানসন্ততিগণকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করেন ও গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে যে কায়স্থ সমাজ স্বকীয় সামাজিকতায় উপনীত হইবেন এবং অধিকতর ধন সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা আরও আশা করি যে, অতঃপর কায়স্থমহিলাগণ আমাদের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব পরিবারস্থ পুরুষগণকে ঈপ্সিত কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতে একান্ত যত্নপরায়ণা হইয়া জীবনের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

"স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ।" ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-বচনঞ্চ ॥ *

আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ যেন, এতদিন ভ্রম-প্রযুক্ত নামান্তে যে দাসীশব্দের ব্যবহার করিতেন, অতঃপর তাহা না করিয়া উল্লিখিত শাস্ত্রবচনবলে "দেবী" ব্যবহার করতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণের মর্য্যাদা রক্ষা ও

* ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীলোকগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন এবং বৈশ্যের ও শূদ্রের স্ত্রীলোকগণ দাসী শব্দ ব্যবহার করিবেন।

কায়স্থসমাজের এবং আপনাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা করেন।

কায়স্থসমাজের মুখপাত্র, বিশেষতঃ আমাদের এই জাতীয় আন্দোলনের উদ্যোগী আনন্দবাজার পত্রিকা, আমাদের মহিলাগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রতি সপ্তাহেই ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ দ্বারা লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। যদি কোন কায়স্থমহিলা আমাদের জাতীয় উন্নতিপ্রকাশক প্রমাণাদি অথবা অন্য কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা উহা সাগ্রহে ও সানন্দে প্রেরণ করিব।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী,
সহঃসম্পাদক, রাজসাহী কায়স্থ-সমিতি।

আশ্চর্য্য স্বামি-ভক্তি। *

আক্কু বিবি জনৈক মুলসমান রমণী। বয়স খুব বেশী নহে। সে রূপলাবণ্যসম্পন্না বলিয়া স্বামীর বিশেষ আদরের পাত্রী ছিল। স্বামী নিম্নশ্রেণীর কৃষক হইলেও স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। সংসারে সকল লোকের ভাগ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ সুবিধা ঘটিতে পারে না। আক্কু বিবির স্বামী যদিও তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল, তথাপি মুখরা মাতৃদেবীর জ্বালায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বধূমাতার প্রতি বড়ই অপ্রসন্না ছিলেন। তাহার কোনও বিশেষ কারণ ছিল না, বিধাতা যেন তাহার প্রকৃতিই এরূপ করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, তিনি সামান্য কারণেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন, এবং বধূর প্রতি সর্ব্বদাই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতেন। কখন কখন বা তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া প্রহারে উদ্যতা হইতেন। পুত্র বাধা প্রদান করিলে তাহারও রক্ষা থাকিত না। মা তাহাকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালি দিতেন। জননীর তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহারে পুত্র সর্ব্বদা ঘোরতর অশান্তিতে কাল কাটাইত। জননী ভাবিতেন পুত্র যদি স্ত্রৈণ না হইত, বধূকে সুশাসনে রাখিত, তাহা হইলে বধূর স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িতে পারিত না। পুত্রের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল যে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া সে সকল অশান্তির অবসান করিবে। তাই একদিন সুযোগ পাইয়া নিশীথকালে স্ত্রীর গলদেশে শাণিত অস্ত্র অর্পণ করিল। নিদ্রিতা যুবতী চমকিতা ও জাগরিতা হইল, এবং চীৎকার করিতে লাগিল। স্বামী ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া কিছুদিন সংকল্প সাধনে বিরত রহিল। তৎপরে এক দিবস স্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করিল যে

* অল্প দিন হইল এই মুসলমান সতীর বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইবে। পিতৃগৃহ তথা হইতে এক দূরবর্ত্তী গ্রামে ছিল। সে গ্রামে যাইবার সময় স্বামী পথিমধ্যে কক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল। তখন স্ত্রীর মুখে কাপড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া পদদ্বয়ে লোষ্ট্রখণ্ড বাঁধিয়া দিল। অতঃপর তাহাকে দীর্ঘিকার জলে নিক্ষেপ করা হইল। নিরাশ্রয় বালিকা প্রাণরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল এবং চেষ্টার বলে লোষ্ট্রখণ্ড পদপ্রান্ত হইতে খসিয়া পড়িল। তখন সে সন্তরণ করিতে করিতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিকটবর্ত্তী জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। এ দিকে স্বামী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একটা মিথ্যা সংবাদ রচনা করিয়া প্রচার করিল।

যুবতী তাদৃশ নিরাশ্রয় অবস্থায় আত্মীয়ের গৃহে কিছুদিন বাস করিতে লাগিল। সেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনও যুবক যুবতীর রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইল, এবং তাহার মনোগত ভাব রমণীর আত্মীয়ের নিকট ব্যক্ত করিল। তাহাকে এ কথাও বলিল যে, সে যদি এরূপ বিবাহসংঘটনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে তজ্জন্য যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবে। অর্থলোভে মানুষ সব করিতে পারে—রক্ষকই ভক্ষক সাজিল। সে মহিলার পূর্ব্ববিবাহ ভঙ্গ করাইয়া নব যুবকের নিকট তাহাকে অর্পণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। এদিকে পুলিস সমস্ত ঘটনার তত্ত্ব পাইয়া স্বামীকে চালান দিল। মোকদ্দমা বিচারালয়ে চলিতেছে। অনুরক্তা পত্নীর ইচ্ছা যে তাহার স্বামী বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত না হয়। তাই আপোষের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। অবশেষে স্বামী বিপক্ষকে ৫০৲ টাকা দিতে সম্মত হইলে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল। সরলা আক্ল্ এইরূপ মীমাংসার কথা শুনিয়া আনন্দিতা হইল। কিন্তু সে তাহার দুষ্টাশয় আত্মীয়ের মনোগত ভাব ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। মোকদ্দমা মীমাংসিত হইবার অব্যবহিত কাল পরে সে সেই ভাব ব্যক্ত করিল। সে আক্ল্কে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তুমি আর কি এখন এই রাক্ষস রাক্ষসীদের গৃহে যাইবে? তাহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তোমারে হত্যা করিয়া তোমার স্বামী মনের আবেগ মিটাইবে। তোমার শাশুড়ীরত কথাই নাই, সে তোমাকে সর্ব্বদা জ্বালাতন করিবে। আর তোমার পাশে যে যুবককে দেখিতেছ, তার গৃহে গেলে কত আদর পাবে, কত সুখে থাকবে। তাই বলি বিবাহ ভেঙ্গে একে বিবাহ কর, তোমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, আর অকালে প্রাণটাও হারাতে হবে না।" আত্মীয়ের এতাদৃশ প্রস্তাবনা শুনিয়া যুবতী যার পর নাই বিরক্ত হইল। ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল "আল্লা আমার প্রাণদাতা, তিনি রাখলে আমায় কে মারে, তিনি মাল্লে কে রাখে? তোমরা আমার নিকট এ প্রস্তাব করিও না। আমি মৃত্যুর ভয় করি না, যদি আমার

স্বামীর নিকট গিয়ে আমার প্রাণ যায়, তবুও তা ভাল।" দুরাত্মা আত্মীয় দেখিল ভয়-প্রদর্শনে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, তখন সে প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিল। রমণী বলিল "তোমরা আমাকে কি দিতে চাও?" তখন আত্মীয় আপোষে তাহার স্বামীর নিকট যে ৫০৲ টাকা পাইয়াছিল, তাহা প্রদান করিল। সে টাকা গ্রহণ করিয়া তাহার স্বামীকে দিয়া বলিল "এই লও তোমার টাকা।" এই বলিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। সে যখন পা টানিয়া লইতে উদ্যত হইল, তখন তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া দৃঢ়রূপে ধরিল ও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তুমি আমায় ত্যাগ করিও না, আমি কোনক্রমেই তোমাকে ছাড়িতে পারি না। তুমি যদি আমাকে মারিয়াও ফেল, তথাপি তোমাকে ছাড়িব না।" তাহার তাদৃশ প্রেমের গাঢ়তা ও ঐকান্তিক ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই বিগলিত হইল। তাহার স্বামীও তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারিল না—তাহাকে পুনর্ব্বার পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া গেল। বর্ত্তমান স্বার্থপরতার যুগে এতাদৃশ পতিভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল। মানুষ ভালবাসিতে যাইয়া ভালবাসার পাত্রের নিকট সহানুভূতিই প্রত্যাশা করিয়া থাকে। প্রেমিকা প্রেমের পাত্রের নিকট কেবল সুখই অন্বেষণ করে। যাহাকে ভাল বাসি, সে যদি আমাকে যাতনা প্রদান করে, তথাপি যদি আমার মন বিরক্ত না হয়, সে যদি আমাকে দুঃখার্ণবে ফেলিয়া—এমন কি আমার জীবনান্ত করিয়া—সুখানুভব করে, তাহা হইলেও যদি আমি আনন্দিতচিত্তে সকল ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। নিরক্ষরা মুসলমান-বালা এতাদৃশ স্বর্গীয় প্রেমের ছবি জগতের নিকট ধরিয়া দিয়া মানব-জীবনে দেবত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর, ইহাই প্রতিপন্ন করিল। জগতের ঘরে ঘরে এতাদৃশ প্রেমের দৃষ্টান্তের যত আধিক্য হইবে, ততই পৃথিবী পবিত্র ও মধুময় হইয়া দাঁড়াইবে, ততই এই শোক-দুঃখময় সংসার শান্তি-ভবন হইবে।

শ্রীচ।

ঈশ্বরের নামাবলী।

সা।

সাংযুগীন, সাংশয়িক-গুরু, সাংসিদ্ধিক, সাঁচ্চা, সাকল্য, সাকার-নিরাকার, সাক্ষাৎ, সাক্ষী, সাক্ষ্যদাতা, সাক্ষ্যগ্রহীতা, সাক্ষ্য-রক্ষক, সাগরালয়, সাঙ্গিকদীক্ষাদাতা, সাঙ্গাসিদ্ধ, সাঙ্গ, সাঙ্ঘাতিকবিপদভঞ্জন, সাজানিয়া, সাজাদাতা, সাত্ত্বিকভাবদাতা, সাথের সাথী, সাদৃশ্যহীন, সাধপূরণ, সাধক-

সহায়, সাধক-রঞ্জন, সাধনধন, সাধনলভ্য, সাধনাতীত, সাধনীয়, সাধনের ধন, সাধারণ, সাধারণপিতা, সাধারণমাতা, সাধারণগুরু, সাধারণবন্ধু, সাধিষ্ঠ, সাধিষ্ঠানবাসী, সাধু, সাধুবন্ধু, সাধ্যাতীত, সাধ্বসনাশন, সানন্দ, সান্ত্বনাদাতা, সান্ধ্যবন্দনীয়, সাপেক্ষ্যরহিত, সাফল্যদাতা, সাম্যবিধাতা, সাম-গীত, সামঞ্জস্যকর্ত্তা, সামন্ত, সামন্তেশ্বর, সামর্থ্য-শীল, সামাজিক, সামীপ্যবিধাতা, সাম্প্র-দায়িকতাহীন, সাম্যকারী, সাম্রাজ্যেশ্বর, সায়, সায়ন্তনধ্যেয়, সায়াহ্নপূজ্য, সাযুজ্য-বিধাতা, সার, সারদ, সারাৎসার, সারগ্রাহী, সারথি, সারল্যরত্নাকর, সারূপ্যবিধাতা, সার্থ, সার্থক, সার্ব্ব, সার্ব্বকালিক, সার্ব্ব-জনীন, সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বভৌম, সার্ব্ব-লৌকিক, সালোক্যদাতা, সাবধানকারী, সাবিত্রীধ্যেয়, সাহস, সাহসদাতা, সাক্ষী, সাহায্যকৃৎ।

নূতন সংবাদ।

১। নূতন ছোটলাট কটকের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, উড়িয্যা বঙ্গদেশ হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা তিনি অবগত নন। ঢাকা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রাম আসামভুক্ত হইবে, ইহা কি স্বপ্নেরও অগোচর নয়?

২। আমেরিকার ক্রোরপতি শ্রীমতী ষ্টানফোর্ড ভারতদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি অতি বদান্যা। তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজ ব্যয়ে স্বদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ১০০০ ছাত্র বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেছে।

৩। বর্ত্তমান ছোট লাটের পিতা রেভারেণ্ড ডাক্তার ফ্রেজার নাগপুরের ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি পুত্রের সহিত একত্র বাস করিতে আসিতেছেন। তিনি বড় ভাল লোক; দয়া, সৌজন্য ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

৪। এই মাসে কাছাড় ও শ্রীহট্টের নানা স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছে। কোন কোন কম্পন দশ সেকেণ্ড ছিল।

৫। ওয়েল্‌স্ প্রদেশে বড় ছুচার উৎপাত হইয়াছিল, আশ্চর্য্য কৌশলে তাহা নিবারিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাণী ছুচার চামড়ার দস্তানার ফরমাস দেন, ইহাতে দেশের সকল ধনাঢ্য রমণীর ছুচার চামড়ার দস্তানা পরিবার সাধ হয়। ইহার ফলে ছুছুন্দরী-কুল নির্মূল হইয়াছে।

৬। গত ৭ই অগ্রহায়ণ পণ্ডিতবর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৮০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি যেমন বহুকাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেইরূপ আদর্শ গৃহস্থ ও দরিদ্র-বন্ধু ছিলেন। ইনি

সামান্য আয়ে পরিমিত ব্যয় করিয়া পুত্র কন্যা জামাতা প্রভৃতি সকলের উপায় করিয়া গিয়াছেন এবং ২০ হাজার টাকা মূল ধন ট্রষ্টী সম্পত্তি করিয়া রাজপুর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারদিগের চির-সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এরূপ সাধুদৃষ্টান্ত অতি বিরল।

৭। লাহোরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রজ-লাল ঘোষ রায় বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৮। মোরাদাবাদের রাণী কিশোরী বেরিলী কলেজের ফণ্ডে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৯। দাক্ষিণাত্যের জলপ্লাবনে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ মান্দ্রাজের বাদসা সাহেব কোম্পানি চাউল কাপড় ও লবণ যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর স্বয়ং এবং প্রদেশীয় রাজা মহারাজারাও অর্থ দান করিতেছেন।

১০। বার্ণ নগরে চিকিৎসার্থী ছাত্রের সংখ্যা ১৭৪, কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা ১৯০ জন। জেনিভা নগরে এরূপ ছাত্র ১৮৩ এবং ছাত্রী ১৩৬ জন মাত্র।

১১। বিবি বেসাণ্ট গয়া নগরে কয়েকটী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিতেছেন।

১২। বুয়ারদিগের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার সাহেবকে কতকগুলি ফরাসি লোক একটী অভিনন্দনসহ এক পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। ক্রুগার বলেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং স্বদেশ সম্বন্ধে তিনি নিরাশ নহেন। তিনি এখন নির্জনে বাস করিয়া বাইবেল পড়েন এবং অবিশ্রান্ত চিঠি পত্র লেখেন।

১৩। দুইজন আমেরিকান স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ প্রাচীন গ্রীক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গ্রিস দেশে আসিয়া তত্রত্য লোকদিগকে দেখাইতেছেন যে, প্রাচীন পোষাক সমধিক সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর।

১৪। জর্ম্মণ সম্রাটের তৃতীয় পুত্র প্রিন্স এডাল্‌বার্ট কলম্বো দর্শন করিয়া চীন যাত্রা করিয়াছেন।

১৫। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজকেও চমৎকৃত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে (ইম্পি-রিয়াল) উচ্চতর শিক্ষাবিভাগে উন্নত করিয়া ইঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

১৬। আমেরিকার মিসুরী প্রদেশে এক রেলওয়ে দুর্ঘটনায় জেনারেল বুথের অশেষ-গুণবতী কন্যা বিবী বুথ টকারের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম।

১৭। সম্বুর হইতে কেহ লিখিয়াছেন, তত্রত্য পার্ব্বত্য রাজা এক কৃষিপ্রদর্শনীতে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রজারা আর স্ত্রীবিক্রয় করিতে পারিবে না। প্রজাদের ইহা প্রীতিকর হয় নাই।

১৮। বাবু নলিনবিহারী সরকার সি আই ই, কলিকাতার সরিফ হইয়াছেন।

১৯। রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রা সেণ্ট বার্থলোমিউ হাঁসপাতাল বিস্তার জন্য ফণ্ড স্থাপনার্থ স্বয়ং ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

২০। নরওয়ে ও লাপলাণ্ড পাশাপাশি দেশ। আশ্চর্য্য, নরওয়ের লোক পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি, লাপেরা সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব।

২১। জেসিন-মেয়ার নাম্নী এক মার্কিন রমণী ব্রিমেন নগরে ৭ বৎসর নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ এক অগ্নিদাহের গোলযোগে জাগিয়া উঠিয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে খাওয়ান হইত। তাঁহার শরীর সুস্থ এবং স্মৃতি পরিষ্কার আছে।

২২। মাডাম পট্টি ১০,০০০ টাকার তাঁহার স্বর বিমা করিয়া আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন। স্বর-বিকারে কোনও কনসার্টে এক রাত্রি গান করিতে না পারিলে ১০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

২৩। জাপান দেশে এক অদ্ভুত বৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে সন্ধ্যার পর ধূম নির্গত হয়। বৃক্ষটী ৬০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে।

২৪। পারস্যোপসাগরে ভ্রমণোপলক্ষে লর্ড কুর্জ্জন বাসিডোর, লিঙ্গা, বেন্দর প্রভৃতির শাসনকর্ত্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পরস্পরের সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কোনও অভাব নাই।

২৫। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ভাণ্ডারকার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

২৬। উদাঙ্কা নামক নগরে ক্রমাগত ১২০০ বৎসর ধরিয়া একই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। দিন ৫ বার চন্দনকাষ্ঠের যোগান দেওয়া হয়।

২৭। এবৎসর সেণ্ট এণ্ড্রুজ উৎসবে হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি সার ফ্রান্সিস ম্যাকলিন সভাপতি হন এবং হাইকোর্টের সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

২৮। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মূকবধির বিদ্যালয়ের নূতন-গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতল গৃহসহ ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। নূতন ছোটলাট এই বিদ্যালয়ের প্রতিপোষক হইয়াছেন।

২৯। মান্দ্রাজ কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীর সাহায্যার্থ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। মহীশূরের রাজা এই প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

৩০। হুগলি ইমামবাড়ি অফিস গৃহে হাজে মহম্মদ মসিন এবং সায়েদ কেরামত আলির প্রতিকৃতির আবরণ সমারোহে উন্মোচিত হইয়াছে।

৩১। পেনসন-প্রাপ্ত জজ, সবজজ, মুনসেফ, মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারগণ বিনা পাশে বন্দুক রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩২। মেং জে ঘোষালের স্থানে বাবু সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল বেথুন কলেজ কমিটীর সম্পাদক হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পারিবারিক জীবন—শ্রীপ্রসন্নতারা গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১॥ টাকা। এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ইহার ভাষা যেরূপ বিশুদ্ধ, ইহার রচনা-প্রণালীও সেইরূপ সুনিপুণ। গ্রন্থখানিতে লেখিকা আপনার অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি ও সুবিচারক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তিনি অপক্ষপাতে প্রাচীন হিন্দু পারিবারিক অবস্থার বিচার করিয়া তাহার গুণের সমর্থন ও দোষের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের সপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত। নব্য রীতি নীতি সম্বন্ধেও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাচারিতাকে দূষিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার পোষকতা করিয়াছেন এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খ্যাতনামা বাবু চন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থের ভূমিকা স্বয়ং লিখিয়া এইরূপে তাহার উপসংহার করিয়াছেন "পারিবারিক জীবন অতি সুশিক্ষিতা চিন্তাশীলা এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনসম্পন্না মহিলার লিখিত সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইংরাজী শিক্ষিতমাত্রকেই এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই পাঠ করিতে বার বার অনুরোধ করি।" আমরা স্ত্রীলোকমাত্রকে ইহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

২। ধবলেশ্বর কাব্য—অমিয়াগাথা প্রভৃতি প্রণেত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তফি) বিরচিত। মহানদীর গর্ভে ধবলেশ্বর শৈল অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য, তদ্দর্শনে কবি একটী ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র হইলেও রচনা পারিপাট্যে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী সরস্বতীর স্বভাব বর্ণনা চমৎকার।

৩। শ্রীমনোমত ধন দের জীবনী পুস্তক—আমাদের পরম স্নেহাস্পদ এই সাধু যুবার আকস্মিক শোচনীয় অকাল মৃত্যু তাহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ভগ্ন করিয়াছে। ইনি যুবকদিগের আদর্শ অনেক সদ্ গুণে ভূষিত ছিলেন। তৌর্য্যত্রিক ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার দৈবশক্তি ছিল। তাঁহার প্রস্তুত যন্ত্র সকল যেমন পরিপাটী, তেমনি তাঁহার সুকণ্ঠ সঙ্গীত যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে। স্বল্প জীবনে প্রতিকূল অবস্থা সকলের মধ্যে তিনি চরিত্রবল ও কার্য্যনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

৪। ব্রিটিষ ইণ্ডিয়া—নূতন ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। নমুনা আশাজনক।

বামারচনা।

অমিয়া আমার।

অমিয়া আমার,—
তুমি কি স্বর্গের ফুল,
মরতে মিলে না তুল,
তুমি কি সুচারু ছটা বাসন্তী উষার!
অমিয়া আমার,—
তুমি কি শারদ ইন্দু—
অথবা মথিত সিন্ধু—
ইন্দিরা সুন্দরী, মাগো সুষমা-আধার?
অমিয়া আমার,—
মরুভূমে বরাননি,
তুমি কি শান্তির খনি,
নিদাঘ-তাপিত বক্ষে অমৃত আসার?
অমিয়া আমার,
অমা ঘোর অন্ধকারে,
তুই কি চপলা হাঁরে,
পথিকের দগ্ধ বুকে লহরী আশার?
অমিয়া আমার!
কে তুই অমিয়া-ঢালা,
তুই কি মন্দারমালা,
অভাগীর ভগ্নবুকে দেব-পুরস্কার?
অমিয়া আমার!
কোন সাধ নাহি প্রাণে,
তবু চেয়ে তোর পানে,
মরুভূমে ফুল্ল ফুল ফুটেছে আবার।
অমিয়া আমার,
জীবনের প্রিয়তম,
সুখের স্বপন মম,
অন্ধের নয়ন-তারা জগতের সার।

অমিয়া আমার;—
তোর আধ আধ বোলে,
পড়িয়া আশার ভোলে,
ছেঁড়া তার সপ্তমেতে বাজিল আবার।
অমিয়া আমার,—
যেই সুখ কল্পনায়,
বসি আঁকিতাম হায়,
তুমি মা প্রত্যক্ষদেবী সেই কল্পনার!
অমিয়া আমার,
হেরিলে ও চারুমুখ
আমার আমিত্ব টুক
মিশে তোতে, স্বর্গ মর্ত্ত্য হয় একাকার।
অমিয়া আমার,
তোর আধ আধ স্বরে,
আলয়ে অমিয়া ঝরে,
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর কত সাধনার!
অমিয়া আমার,
ওই কচিমুখে তোর,
কি জানি কি আছে মোর,
হেরিলে উথলে বুকে অমৃত-আসার।
অমিয়া আমার!
দর্শন বিজ্ঞান কত,
ঘাঁটিলাম অবিরত,
মিলে নাই—বিশ্বতত্ত্ব তাহার মাঝার!
অমিয়া আমার!
তোর ওই কচিমুখে,
আমি যে দেখিনু সুখে
জগতের তত্ত্ব—বেদ বেদান্তের সার।
অমিয়া আমার!
হইয়া তোমার শিষ্য
বুঝিনু নিখিল বিশ্ব
নহে মা নশ্বর,—শুধু প্রীতি-পারাবার।
অমিয়া আমার!
তোর হাসি মুখ দেখে,
তোমা ধনে বুকে রেখে,
ভবনাট্যে যবনিকা পড়ুক আমার।

তোমার মা—
নগেন্দ্রবালা সরস্বতী,
কটক।

শিশুর হাসি।

কত মধুমাখা হাসি শিশুর বয়ানে,
হেরিলে আনন্দ সর উথলে পরাণে।
কালকূট বিষভরা এ ভব মাঝারে
বিরাজে অমিয়-কণা শিশুর অন্তরে।
শুনেছি স্বরগ নামে আছে পুণ্যদেশ,
জ্যোতির্ম্ময়, নাহি তথা অন্ধকার লেশ।
দুদিনে বসন্ত যেথা হয় না বিলয়,
রোগ শোক মৃত্যু নাকি পায়না আশ্রয়।
দেবেল পাপিয়া সদা মধুমাখা তানে,
নন্দন প্লাবিত করে বিভুগুণ গানে,
আনন্দ বাজারে তথা অমর অমরী,
কেহ নাচে কেহ গায়, ডাকে হরি হরি!
সেই দেশজাত এই সুদুর্লভ হাসি,
মরতে দেছেন বিধি করুণা প্রকাশি।
মোহান্ধ মানব মোরা বুঝেও বুঝি না,
এত স্নেহ পেয়ে তবু তোমাতে মজিনা।
দয়াময় দীননাথ অধমতারণ,
দয়া করে কর দেব মোহ বিমোচন,
সম্পদে বিপদে যেন ভুলিয়া তোমায়,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, না মজি মায়ায়।

শ্রীহেমপ্রভা কর।

অনিত্য সংসার।

অনিত্য সংসার, কিছু নহে সার,
সব ভোজ বাজী প্রায়;
এখনি যা ছিল মুহূর্ত্তে টুটিল,
কালেতে মিশিল হায়!
আমার আমার বাণী কেন আর,
কে তোমার বল মন?
জীবনের প্রেয়, সংসারের শ্রেয়,
গেল মুদি দুনয়ন।
এই ছিল তার কত অহঙ্কার,
অনিত্য দেহের তরে;
মুহূর্ত্তে টুটিল অবশ হইল,
দুরন্ত কালের করে।
এই ছিল সবে হাসি কলরবে
সুখে পুলকিত কায়;
এই শোক রোল হরি হরি বোল,
দুখে বুক ফেটে যায়।

ধন মান যশ স্নেহ প্রেম রস
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ভক্তি ;
দেহের গৌরব প্রকৃতি-সৌরভ
সাধুতা সখ্যতা শক্তি ;
ভাই বোন পিতা সন্তান বনিতা
মাতা মমতার রাণী ;
কেহ কারো নয়, সবি মায়াময়,
অনিত্য সংসার খানি।
সজ্জিত সুন্দর এই বাড়ীঘর
কতই সামগ্রী পূর্ণ ;
সকলি অনিত্য, হয়,যায় নিত্য,
কালে হয় সব চূর্ণ।
ঘেরে চারিধার স্নেহের আধার,
আপনা হারায়ে তায় ;
থাকি নিশিদিন চেতনা-বিহীন
কি পাষাণ এ হৃদয় !
একে একে কত হলো কালে গত
ভাঙ্গিয়া ভগন প্রাণ ;
কত পরিবার করি ছার খার
করিল কালে শ্মশান।
অনিত্য সংসার, বলি বার বার
জীবনের প্রিয় সুধা
পিনু হলাহল, তবে কেন বল
সংসারে সুখের ক্ষুধা ?
বার বার বার অনিত্য সংসার
বুঝিতেছি মনে মনে ;
কেন তবু ছিছি ! ঘুরি মিছামিছি
সে সুখের অন্বেষণে ?
আমার কি ভবে ? আমি কার তবে ?
ভাবিতে অবশ হিয়া ;
এবে সংখ্যাহীন কত নিশিদিন
কাটাইনু কি যে নিয়া।
আমার একটী যায় যদি টুটি
অপরে জড়ায়ে ধরি ;
ভাবি নারে হায় ! সবারে বিদায়
দিতে হবে জন্ম ভরি।
সকলি অনিত্য কোথা নিত্য সত্য,
চির-আকাঙ্ক্ষিত সখা !
ঝুটা আবর্জ্জন করি বিসর্জন,
সার ধন দেও (হে) দেখা !
পুতুল খেলায় লইয়া আমায়,
বুঝাইলে বৃথা সব,
সকলি অসার ধূলিমাত্র সার
ভবের সব বিভব।
এসুখ সম্ভোগ সংযোগ বিয়োগ,
পাঁচটী ভূতের খেলা,
অদ্ভুত আকার ভূত ব্যবহার
জড় অজড়ের মেলা।
যাহা কিছু নিত্য চিন্ময় শাশ্বত,
করেনা হেথায় স্থিতি ;
প্রেমে মাতোয়ারা হইয়ে তাহারা
তোমা পানে ধায় নিতি।
এ পোড়া জীবন শুনেনা বারণ,
ভুলে নিত্য সত্য সুধা ;
জড়ায়ে অসারে, ঘোর হাহাকারে,
বাড়ায় মোহের ক্ষুধা।
কোথা নারায়ণ, সত্য সনাতন
চিন্ময় মানস-চোর !
অধমা দুর্জ্জনে এ মায়া-কাননে
প্রেমানন্দে কর ভোর।

শ্রীঅম্বিকা সেন,
বরিশাল।

Registered No. C. 134

No. 485-86. January & February, 1904.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৫-৮৬ সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ, ১৩১০। ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৭
২। হিন্দু বিধবা ২৫৯
৩। নানক ২৬১
৪। আমাদের দেশের কি হইল ? ২৬৩
৫। দশা কি হ'ল ? (পদ্য) ... ২৬৫
৬। বিবি বেসাণ্টের বক্তৃতা ... ২৬৬
৭। মৃত্যু বা নিভৃত চিন্তা ... ২৭০
৮। নূতন ও পুরাতন প্রভু ও ভৃত্য ২৭৫
৯। ডুমরাওন ভ্রমণ ২৮১
১০। বনবাসিনীর পত্র ২৮৩
১১। চিত্তপ্রসাদ ২৮৬
১২। ভারতীয় পুণ্য নদী ... ২৮৯
১৩। উদাসীনের চিন্তা ২৯১
১৪। মৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বাস ... ২৯৪
১৫। করমেতিবাই ২৯৭
১৬। গীতাসার ব্যাখ্যা ৩০০
১৭। পাশ্চাত্য গ্রাম্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৩০২
১৮। স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে... ৩০৪
১৯। নারীজাতির কর্ত্তব্য ... ৩০৬
২০। "বঙ্গ দ্বিধা হও" ৩০৮
২১। রুষ-জাপান যুদ্ধ ৩০৯
২২। পালামৌর বন্যজাতি ... ৩১১
২৩। সুখের জীবন (পদ্য) ... ৩১৩
২৪। ঈশ্বরের নামাবলী... ... ৩১৪
২৫। নূতন সংবাদ ৩১৪
২৬। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ৩১৬
২৭। বামারচনা—নীরব ... ৩১৭
বিদায়ী পূর্ণিমা, যায় দেবী যায় ঐ
স্মৃতি, ব্যর্থ আশা ... ৩১৮, ৩১৯
করুণা সুন্দরী ৩২০

কলিকাতা।
৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত-কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম যাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

ধন মান যশ — যেই প্রেম রস
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ভক্তি ;
দেহের গৌরব — প্রকৃতি-সৌরভ
সাধুতা সরলতা শক্তি :
ভাই বোন পিতা — সন্তান বনিতা
মাতা মমতার রাণী ;
কেহ কারো নয়, — যদি মায়াময়,
জানিতাম সংসার খানি।
সজ্জিত সুন্দর — এই বাড়ীঘর
কতই সামগ্রী পূর্ণ ;
সকলি ভাঙ্গিয়া, — ধূলায় মিশিয়া,
কালে হয় সব চূর্ণ।
স্নেহে চারিধার — স্নেহের আধার,
আপনা হারাবে তায় ;
থাকি নিশ্চেতন — চেতনা-বিহীন
কি পাষাণ এ জনম !
একে একে কত — হলো কালে গত
ত্যজিয়া ভবন প্রাণ :
কত পরিবার — করি ছারখার
করিল কালে শ্মশান।
জানিয়া সংসার, — বলি বার বার
জীবনের প্রিয় সুধা
পিয়ে হলাহল, — তবে কেন বল
সংসারে সুখের ক্ষুধা ?
বার বার বার — ভাবিয়া সংসার
বুঝিয়েছি মনে মনে :
কেন তবু ফিরি ! — বুঝি মিছামিছি
সে সুখের অন্বেষণে ?
আমার কি হবে ? — আমি কার হবে ?
জানিতে অবশ হিয়া ;
এক-সংখ্যাহীন — কত নিশিদিন
কাটাইনু কি যে নিয়া।
আমার একটী — যার যদি ত্রুটি
অপরে দাঁড়ায়ে দাবি ;
ভাবি মনে হায় ! — সবারে বিদায়
দিতে হবে এক ভাবি :
সকলি জানিয়া — কোথা নিত্য সত্য,
চির-আকাঙ্ক্ষিত সখা !
ছুটী আবদ্ধন — করি বিসর্জন,
সার ধন সেও (সে) দেখা !
পুতুল খেলায় — লইয়া আমোদ,
ফুরাইলে খুশী সব,
সকলি অসার — বুঝিলাম সার
ভবের সব বিভব।
এরূপ সম্ভোগ — সংযোগ বিয়োগ,
পাঁচটী ভূতের খেলা,
চতুর্ভুজ আকার — ভূত বাদশার
জড় অজড়ের মেলা।
যাহা কিছু নিত্য — চিন্ময় শাশ্বত,
জানিনা কোথায় স্থিতি ;
সেদেন মাতোয়ারা — হইয়ে তাহারা
খোঁজা পানে যায় নিতি।
এ পোড়া জীবন — জানিনা কারণ,
ভুলে নিত্য সখা বলা :
জড়ায়ে অসারে, — ঘোর মায়াজালে,
বাড়ায় মোহের ধূলা।
কোথা মায়াময়, — যাহা দয়াময়
চিন্ময় মানস-চোর !
অধমা দুর্জ্জনে — এ মায়া-কাননে
প্রেমানন্দে কর ভোর।

শ্রীঅম্বিকা সেন,
বরিশাল।

Registered No. C. 151

No. 485-86. January & February, 1904.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৫-৮৬ সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ, ১৩১০। ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৭
২। হিন্দু বিধবা ২৫৯
৩। বালক ২৬১
৪। আমাদের দেশের কি হইল ? ২৬৩
৫। দশা কি হ'ল ? (পদ্য) ... ২৬৫
৬। বিবি বেসান্টের বক্তৃতা ... ২৬৬
৭। মৃত্যু বা নিভৃত চিন্তা ... ২৭০
৮। নূতন ও পুরাতন প্রভু ও ভৃত্য ২৭৫
৯। সুন্দরবন ভ্রমণ ২৮১
১০। প্রবাসিনীর পত্র ২৮৩
১১। চিত্র প্রসাদ ২৮৬
১২। ভারতীয় পুণ্য নদী ... ২৮৯
১৩। উদাসীনের চিন্তা ২৯১
১৪। মৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বাস ... ২৯৪
১৫। করমেতিবাই ২৯৭
১৬। গীতাসার ব্যাখ্যা ৩০০
১৭। পাশ্চাত্য প্রথা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৩০২
১৮। স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে... ৩০৪
১৯। নারীজাতির কর্ত্তব্য ... ৩০৬
২০। "বঙ্গ বিধবা হও" ৩০৮
২১। রুষ-জাপান যুদ্ধ ৩০৯
২২। পালামৌর বন্যজাতি ... ৩১১
২৩। সুখের জীবন (পদ্য) ... ৩১২
২৪। ঈশ্বরের নামাবলী... ... ৩১৩
২৫। নূতন সংবাদ ৩১৪
২৬। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ৩১৬
২৭। বামারচনা—নীরব ... ৩১৭
বিদায়ী পূর্ণিমা, বাম দেবী বার ঐ
স্মৃতি, দীর্ঘ আশা ... ৩১৮, ৩১৯
করুণা সুন্দরী ৩২০

কলিকাতা।
৬নং কালেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৬নং আন্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-পক্ষেই
বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়।

বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ হইতে আরাম হয়, অথচ ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজ যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন যাহার আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-অপরিষ্কারে, মাথা-ঘোরায়, অম্বলরোগে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, পেট ফাঁপিতে, হাত-পা-চক্ষু জ্বালায়, মাথা-দরায় ও বোরায়, ঠাণ্ডা লাগায়, রাত্রি জাগায়, অধিক চলায়, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা তাহার মহৌষধ।

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর, অমাবস্যা-পূর্ণিমার বাতজ্বর, বিষমজ্বর, ঘুস্‌ঘুসেজ্বর, পৌকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা মহৌষধ। বিজয়া বটিকা আজ সর্ব্বত্র আদৃত, ইংরাজ নরনারীও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	।৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	৸৵	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৵০	।০	৶০
বিশেষ সুবৃহৎ সাশ্রয়ী কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১০৮	২।০	।৶	৵০

ডাকযোগে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আর কিছু মাত্র অধিক দিতে হয় না।

সতর্কতা। বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। গ্রাহকগণ সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া যায় না।

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত বেজপাড়া গ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা বড়বাজার ৩৬নং হ্যারিসন রোড, বিজয়া বটিকা ঔষধালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

সেলাদের স্মরণার্থ অনুষ্ঠান বা বক্তৃতার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ২৫০০০ টাকা দিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বর্ত্তমানযুগের অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত।

হিন্দু বিধবা।

গতসংখ্যক বামাবোধিনীতে আমরা "হতভাগ্য বিধবা" সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা হিন্দুসমাজের চিন্তার বিষয় হইয়াছে কি না জানি না। আমাদিগের বিশ্বাস যতদিন হীন স্বার্থ এখন হিন্দুসমাজের কর্ণে প্রকৃত স্বার্থ ও ধর্ম্মের কথা অল্পই স্থান পায় এবং আপনার কন্যা ভগিনী চিরদুঃখিনী হইলেও নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেই সদা হিন্দু পুরুষগণ নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারেন; নারীজাতির উদ্ধারের জন্য যে ২।৩টী মহাত্মা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চরণে শত শত নমস্কার। কিন্তু যে সকল পুরুষ লইয়া হিন্দুসমাজ, তাঁহাদিগকে এখনও অচল অটল দেখা যায়; ভারতের নারীগণ এখন বিদ্যালোকে দীপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বচেষ্টার উপর ভারতের নারীজাতির কল্যাণের অধিক আশা ভরসা। বহুদিন হইল স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন:—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

আজিও এ কথা সত্য বলিয়া ঘোষিত হইল। ভারত-ললনাগণ জাগ্রত হইয়া নিদ্রিত অজগর সর্প সমাজকে জাগাইয়া তুলুন এবং তাহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদিত করিয়া লউন।

ভারত-বিধবাদিগের উদ্ধারসাধন সমাজ-হিতৈষীদিগের এখন একটী প্রধান কার্য্য। আমরা গত বারে দেখাইয়াছি ১ হইতে ৫ বৎসরের বিধবার সংখ্যা ৭৮ হাজার। এমন অদ্ভুত শোচনীয় ঘটনা দুর্ভাগা ভারতেই সম্ভবপর। ৫ বৎসরের ঊর্দ্ধতন তালিকা আজি দিতেছি:—

৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা—	৬৪,৭২৫
১০—১৫	১৫,১৯০
১৫—২০	১,৪১,৮৬১
২০—২৫	৩,১৯,৫৯১
২৫—৩০	৫,৪৭,০২৬
৩০—৩৫	৪,৮৩,৪৯০
৩৫—৪০	৪,৮২,১০৯
৪০—৪৫	৭,৩৭,০১৮
৪৫—৫০	৫,৫৫,০১০
৫০—৫৫	৭,৬৭,৪৪৮
৫৫—৬০	৩,২৩,৭৮৩
৬০ হইতে ঊর্দ্ধে—	১৩,৩৭,১১৯

অর্দ্ধ কোটির অধিক রমণী বৈধব্যগ্রস্ত হইয়া ভারতমাতার বক্ষে জীবন্মৃত অবস্থায় স্থিতি করিতেছে! ইহাদিগের প্রতি কি বিশেষ কর্ত্তব্য নাই? বিধবাদিগের সকলেই যে দুর্ভাগিনী এবং সকলকেই যে পুনর্বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আমরা

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-পক্ষেই

বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়।

বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ ইহাতে আরাম হয়, অথচ ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন যাহার আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-অপরিষ্কারে, ধাতুদৌর্ব্বল্যে, অগ্নিমান্দ্যে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, শরীর কাঁপিতে, হাত-পা-চক্ষুজ্বালায়, মাথা-ধরায় ও ঘোরায়, ঠাণ্ডা লাগায়, রাত্রি জাগায়, পথ চলায়, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা তাহার মহৌষধ।

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর, আমাবস্যা-পূর্ণিমার বাতজ্বর, বিষমজ্বর, ঘুষঘুষেজ্বর, দৌকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা মহৌষধ। বিজয়া বটিকা আজ সর্ব্বত্র আদৃতা, ইংরাজ নরনারীও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	৷৷৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৲	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৫	১৷৷৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৪৪	৪৲০	।০	৶০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও ছয় আনা অধিক দিতে হয়।

সতর্কতা। বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। গ্রাহকগণ সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া যায় না।

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭৯নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

স্পেন্সারের স্মরণার্থ অক্সফর্ড বা লণ্ডন নগরে বক্তৃতার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ১৫০০০ টাকা দিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার বর্ত্তমানযুগের স্মরণীয় মহাপণ্ডিত।

হিন্দু বিধবা।

গতসংখ্যক বামাবোধিনীতে আমরা "দুগ্ধপোষ্য বিধবা" সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা হিন্দুসমাজের চিন্তার স্থল হইয়াছে কি না জানি না। আমাদিগের বিশ্বাস পতিত হীন স্বার্থান্ধ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কর্ণে প্রকৃত ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা অল্পই স্থান পায় এবং আপনার কন্যা ভগিনী চিরদুঃখিনী হইলেও নিজে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেই নব্য হিন্দু পুরুষগণ নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারেন। নারীজাতির উদ্ধারের জন্য যে ২।৪টী মহাপুরুষ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চরণে শত শত নমস্কার। কিন্তু যে সকল পুরুষ লইয়া হিন্দুসমাজ, তাঁহাদিগকে এখনও অচল অটল দেখা যায়। ভারতের নারীগণ এখন বিদ্যালোকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যত্ন চেষ্টার উপর ভারতের নারীজাতির কল্যাণের অধিক আশা ভরসা। বহুদিন হইল স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন:—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

আজিও এ কথা সত্য বলিয়া ঘোষিত হউক। ভারত-ললনাগণ জাগ্রত হইয়া নিদ্রিত অজগর সর্প সমাজকে জাগাইয়া তুলুন এবং তাহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদিত করিয়া লউন্।

ভারত-বিধবাদিগের উদ্ধারসাধন সমাজ-হিতৈষীদিগের এখন একটী প্রধান কার্য্য। আমরা গত বারে দেখাইয়াছি ১ হইতে ৫ বৎসরের বিধবার সংখ্যা ৭।৮ হাজার। এরূপ অদ্ভুত শোচনীয় ঘটনা দুর্ভাগ্য ভারতেই সম্ভবপর। ৫ বৎসরের ঊর্দ্ধতন তালিকা আজি দিতেছি:—

৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা—	৩৪,৭০৫
১০— ১৫	৭৫,৫৯০
১৫— ২০	১,৪২,৮৭১
২০— ২৫	২,১৯,৪৯১
২৫— ৩০	৩,৪৭,০২৬
৩০— ৩৫	৪,৮৩,৪৯০
৩৫— ৪০	৪,৮১,১০৯
৪০— ৪৫	৭,৩৭,৩১৮
৪৫— ৫০	৪,৯৫,৮১৩
৫০— ৫৫	৭,৪৭,৪৪৮
৫৫— ৬০	৩,২৫,৭৮৪
৬০ হইতে ঊর্দ্ধ—	১৩,৩৭,১১৯

অর্দ্ধ কোটির অধিক রমণী বৈধব্যগ্রস্ত হইয়া ভারতমাতার বক্ষে জীবন্মৃত অবস্থায় স্থিতি করিতেছে! ইহাদিগের প্রতি কি বিশেষ কর্ত্তব্য নাই? বিধবাদিগের সকলেই যে দুর্ভাগিনী এবং সকলকেই যে পুনর্বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আমরা

বলি না। হিন্দুবিধবাদিগের মধ্যে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা দেবী অনেকে আছেন, তাহা আমরা জানি। বিধবা মাতা, বিধবা ভগিনী, বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও বিধবা কন্যা হিন্দুসংসারের লক্ষ্মী হইয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক দেহ মন প্রাণ অপরের সুখ ও মঙ্গলোন্নতির জন্য যেরূপ উৎসর্গ করিতেছেন, তাহা জগতে দৃষ্টান্তস্থল। যাঁহারা এইরূপ ধর্ম্মব্রত রক্ষা করিতে পারেন অথচ যাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আছে, তাঁহারা ধর্ম্মের সুখে চির-সুখী হইয়া থাকুন। কিন্তু বৈধব্য-দশার সহিত যাঁহারা অসহায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা পরের গলগ্রহ হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এরূপ নারীর সংখ্যা অল্প হইবে না। আবার অন্তরে ভোগ-বাসনা আছে অথচ সমাজ-শাসন বা লজ্জা সরম প্রযুক্ত যাঁহারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। রক্তমাংসের শরীর লইয়া পুরুষের মন যে কামনার অনুবর্ত্তী হয়, স্ত্রীলোকের অন্তরে সে কামনা হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। মনের বলে বা সমাজের লজ্জাভয়-শাসন-বলে যাঁহারা সংযম-পরায়ণা হইয়া সৎপথে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা প্রশংসনীয়া তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাসনার প্রাবল্যে অথবা কুসঙ্গ, প্রলোভন বা অত্যাচারের ভয়ে কত লক্ষ লক্ষ বিধবা পাপের কূপে ডুবিয়া কুলে কালি দিতেছে অথবা কুলে বিসর্জন দিয়া অকূল নরকাবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তাহাদের প্রতি সমাজ কি চিরকাল উদাসীন থাকিতে পারেন? যদি তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকেন, তাহারা যে স্রোতে ভাসিয়াছে, তাহার গতিরোধ না করিলে সমাজ ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

দুঃখিনী বিধবাদিগের অন্ন সংস্থান অথবা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কার্য্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিরুপায় অনাথা বিধবাগণ কিরূপ কার্য্য করিয়া দিনপাত করিতে পারে, বামাবোধিনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা তাহার তালিকা দিয়া সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। তাহার জন্য সুব্যবস্থা করিতে হইলে "টাকার ফণ্ড" ও কার্য্যদক্ষ লোক আবশ্যক। এ বিষয়ের প্রসঙ্গ পুনরায় করা যাইবে।

বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা এখন পুনর্বিবেচ্য। ইহা কেন অবৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে? যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভারতের গৌরবস্থল সূর্য্য-বংশ* ও চন্দ্রবংশ বিধবাদিগের সন্তানদ্বারাই রক্ষা পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিধবা বিবাহিত হইতেছেন, তাঁহারা অনেকে সুসন্তানবতী হইয়া সুখে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। পূর্ব্বতন বিধবাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা কেন হেয় হইবেন? যদি বিধবার প্রতি পূর্ব্বের যে কুসংস্কার ছিল না, বর্ত্তমানে তাহা হয়, তাহা হইলে কি

* সূর্য্যবংশের ভগীরথ এবং চন্দ্রবংশের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুরাজ বিধবার সন্তান।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 485-86. Jany & Feby, 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৫-৮৬ সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ, ১৩১০। ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ডাকমাশুল হ্রাস—১৯০৪ সালের জানুয়ারী হইতে ছয় তোলা পর্য্যন্ত ওজনের সংবাদপত্র এক পয়সার ডাকমাশুলে যাইবে। এই অনুগ্রহের জন্য গবর্ণমেণ্টকে শত শত ধন্যবাদ।

অনাথ-আশ্রম—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর কলিকাতার শ্যামবাজারে অনাথ-আশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২৩ কাঠা জমী দান করিয়াছেন। এই জানুয়ারী মাসে ছোট লাট ইহার গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বিভাগকে বঙ্গদেশ হইতে কাটিয়া ফেলিয়া আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিতে এবং ছোট নাগপুরকে মধ্য-প্রদেশের সহিত মিলিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গাঞ্জাম জেলা ছিন্নবঙ্গের সঙ্গে যোড়া দিবার কথা।

পুরীর যাত্রিনিবাস—কলিকাতার বাবু দুলি চাঁদ শ্রীক্ষেত্রে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণার্থ ১৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

লালগোলার রাজার বদান্যতা—মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নতিকল্পে ৫০০০ টাকা ও একটী দাতব্য হাঁসপাতালের জন্য ৩০,৫০০ টাকা দিয়াছেন।

তিব্বতাভিযান—সেনাপতি ইয়ং হজ্‌বাণ্ড সসৈন্যে চুম্বী উপত্যকায় পৌঁছিয়াছেন। তিব্বতীয়েরা এ পর্য্যন্ত বাধা দেয় নাই, পরে কি হয়।

রুস-জাপান—রুস ও জাপানদিগের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ আসন্ন। উভয় পক্ষই প্রাণপণে সমরায়োজন করিতেছেন।

স্ত্রী-ব্যারিষ্টারি—মার্গারেট ডিলহান্‌-

নাম্নী ফরাসী বিবি ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশে আর কোনও স্ত্রীলোক ব্যারিষ্টারি করেন নাই।

ডিলারির কৃতকার্য্যতা—আহম্মদ নগরে ৫০০ বুয়ার বন্দী ছিল, তাহারা ইংরাজের অধীন হইতে চায় নাই। সেনাপতি ডিলারি তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র-গণের দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনে সম্মত করাইয়াছেন। কেবল দশজন বুয়ার কিছুতেই রাজি হয় নাই।

দেশীয়ের উচ্চপদ—এডুলজি পল্লনজি নামক একজন পার্শি ব্রহ্মদেশের জেল সকলের ইনেস্পেক্টর-জেনারেল হইয়াছেন।

হাইকোর্টের জজ—জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই জানুয়ারী মাসের পর অবসর লইতেছেন। তাঁহার পদে বাবু সারদাপ্রসাদ মিত্রের নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। আরও কয়েকটী বিচারকের পদ শীঘ্র শূন্য হইবার কথা।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দারভাঙ্গার মহারাজা ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

রাজপুরুষদিগের গমনাগমন—লর্ড কর্জ্জন গত ২রা পৌষ পারসোপসাগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি আগামী মে মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন। লেডী কর্জ্জন লঙ্কার পথ দিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। লর্ড কিচ্‌নার সিমলা হইতে ভগ্নশরীরে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সামাজিক সমিতি—এবৎসর কংগ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে সামাজিক সমিতিরও অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কট রাও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে উদার মত প্রকাশ করেন। জষ্টিস্ চন্দ্র-ভার্করও একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন।

তিলকের বিচার—পুনার জজ্ বিচার করিয়া এক বৎসরের পরিবর্ত্তে ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানার হুকুম দিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টে আপিল হইয়াছে।

চিকাগো বিভ্রাট—ভদ্রো নাট্য-শালায় ১৩০০ দর্শক উপস্থিত ছিল, ঘরে আগুন লাগিয়া ৫৬৪ জন হত এবং ১৫৭ জন আহত হইয়াছে। এই ঘটনায় চিকাগোর মাজিষ্ট্রেট ১৯টী নাট্যশালা বন্ধ করিয়াছেন।

নববর্ষের রাজসম্মান — ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি ছোট লাট বোর্ডিলন কে, সি, এস, আই, মিউনিসিপালিটীর সভা-পতি গ্রিয়ার সাহেব সি, এস, আই, কটকের বাবু মধুসূদন দাস সি, এস, ই, উপাধি পাইয়াছেন। রায় বাহাদুর ও খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিও কয়েকজনকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বক্তৃতা-বৃত্তি—সুপ্রসিদ্ধ হারবার্ট

আমাদের দেশের কি হইল?

শুধু খেয়ালের জন্যই আমাদের দেশটা অধঃপাতের **শেষ সীমায়** উপনীত হইয়াছে। দেশের লোকগুলি তবু সেই খেয়ালের উপরেই চলে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি রাজা, কি জমীদার সকলেই আপনাপন মতলবেই আছেন। কেহ কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করেন না, সমাজকে মানিতে চান না, ধর্ম্মকে ভয় করেন না। ইহার পরে অধঃ-পতনের আর কি বাকী রহিল? বিবাহে টাকা লওয়া রোগটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। এ উৎকট রোগের ঔষধ কি? নিন্দুকের ভয়, ধর্ম্মভয়, এ সবত ইহাঁরা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সরকারী আইন একবার বালিকাবিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আর আজ কাল বালক-বিবাহে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইতেছে, তাহা কে দেখে? আজকালকার বিবাহ-ক্ষেত্রে যাহার পুত্র, তাহারই জগন্নাথ, আর যে বেচারীর কন্যা, সে গরুড়-স্তম্ভের যাড়ুদার মাত্র। বিবাহ আসরে উটপক্ষী অপেক্ষাও বরের পিতা উচ্চ-গ্রীব। পুত্রের বিবাহ দিয়া অগাধ টাকা লওয়াই এ পক্ষিরাজের ব্যবসা। পুত্রের বিবাহ নামমাত্র প্রচার করিয়া, অন্যের নিকট হইতে টাকা লওয়াই এ সব নরোত্তম-দের উত্তম কারবার! পুত্র দুর্ল্লভ বস্তু। লোকে কথায় বলে "দুর্গোৎসব ঘরে ঘরে, পুত্রোৎসব কপালে করে।" এই দুর্ল্লভ বস্তুর বিবাহ ব্যতীত, লোকের মাথায় বাড়ি দিয়া এবং বলে, ছলে কৌশলে, অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত, অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় কি নাই? হায় দুর্ভাগ্য! এ ব্যাপারে পুত্রের পিতাই পুত্রের ব্যথাদায়ক হইয়া দাঁড়ান। কেননা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি পুত্রের মতামত লন না, প্রেম প্রণয়ের দিকে তাকান না, সুন্দরী অসুন্দরীও বাছেন না, কুলাকুলও দেখেন না, দেখেন কেবল টাকা!

টাকা চাই টাকা, টাকা কৈ, টাকা, টাকা। টাকা দিতে পারিলেই কন্যার বিবাহ হইল, নচেৎ হইল না। টাকার জোরে অন্ধ আতুর কন্যারও রাজার ঘরে বিয়ে হয়। পিতা দরিদ্র হইলে রূপবতী কন্যারও বিবাহ ঘটে না। আহা কি গভীর অনুশোচনা!

টাকা অখণ্ড মণ্ডলাকারে জগতে দিবা-রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুদ্র সাকার মণ্ডলাকার বস্তুটা না করিতে পারে জগতে এমন কুকর্ম্মই নাই। একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

একজন ভদ্রলোকের একটি কন্যা ছিল। কন্যাটিও সুন্দরী, ভদ্রলোক নিজেও বেশ ধনশালী। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কন্যার বিবাহে বিলক্ষণ বিলম্ব হইয়া গেল, কারণ বরকর্ত্তার দাওয়া—রূপোর একসেট,

সোণার একসেট্, পিতলের একসেট্, কাঁশার একসেট্, তামার একসেট্, কাঁচের এক সেট্ ও পাথরের এক সেট্ বরসজ্জ ; পরে গরদের এক ডজন, তসরের এক ডজন, সাটিনের এক ডজন, ক্রেপের এক ডজন ইত্যাদি পরিচ্ছদের ফর্দ্দ। এই ডজনের ভয়ে, সেটের ভয়ে কন্যাকর্ত্তাকে ছুটিয়া পলাইতে হইল। কারণ তাঁহার তহবিলে এত ধন জমা ছিল না। অবশেষে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কন্যার বিবাহ স্থির হইল। ভদ্রলোক যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলেন। কন্য বিবাহ, অগ্য তাঁহার গৃহে গ্রামিক লোকের নিমন্ত্রণ। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানায় গৃহ পূর্ণ। কিন্তু যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকল তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া পরে অভুক্ত অবস্থায় নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। দুঃখে ক্ষোভে কাহারো আহার হইল না, কারণ ভদ্রলোকের ভাবী বৈবাহিক অধিক টাকার লোভে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ কাটিয়া দিয়া পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিতেছেন। ভদ্র লোক সস্ত্রীক কন্যার গলা ধরিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকল অশ্রুমুখে সে গৃহ ত্যাগ করিল। আর সে মন্দভাগিনী কন্যার দশা কি হইল, কে দেখে, কে ভাবে? তাই বলিতেছি টাকায় না করিতে পারে, এমন কিছুই নাই।

আহা! প্রতিবেশীদের যে দয়া হইল, ভাবী বৈবাহিকের সে দয়া হইল না, কি জন্য? না তিনি পুত্রের বাপ। আজ কাল পুত্রের পিতারা এই ব্যবসাই আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ শুননা পুত্রের পিতা আপন মনোগত ভাব সভাস্থলে ব্যক্ত করিতেছেন —"আমি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, এবারে পুত্রের বিবাহ দিয়া যাহার কন্যা ঘরে আনিব, তাহাকে সর্ব্ব-স্বান্ত করিব। হো-হো—উচ্চ হাস্য।" হা ধিক্, হা ধিক্, শেষে কি আমাদের দেশের এই গতি হইল?

ছেলের বাপ ঐ আবার কি বলিতেছেন শোনা যাক। ছেলের বাপ বলিতেছেন "ছেলের বিবাহ দিয়ে টাকা লওয়ার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না, তবে কিনা গতবারে পূর্ব্ব বাড়ীর মোকদ্দমাটায় ৪০০০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্যই কনের পিতার নিকট হইতে মাত্র ৩০০০ হাজার টাকা লইতে হইল। গৃহিণী পুত্র প্রসব করিয়া আমার বড়ই উপকার করিয়াছেন। এ উপকারের জন্য আমি বাস্তবিকই তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। হো হো হো হাস্য, হা হা উচ্চ হাস্য।"

পূর্ব্বে ছিল মেয়ের বিবাহে টাকা লাগিত না, যে যাহা পারিত দিয়া অষ্টম বৎসরে মেয়েকে গৌরী দান করিয়া স্বর্গলাভের ফল সঞ্চয় করিত এবং পিতার পুণ্য-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মেয়েরও রসাতল-গমন অথবা বৈধব্য যন্ত্রণার পথ মুক্ত হইত। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। কনের পিতা ডজন ও সেটের ভয়ে বরের পিতার নিকট অগ্রসর হইতে পারেন

ও বালবিধবাদিগকে কুমারী শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদিগের বিবাহের পথ উদ্ঘাটন করা বিধেয়। ইহা না হইলে বর্ত্তমান সমাজের স্থিতি, তাহার উন্নতি-সাধন ও অধোগতি নিবারণ অসম্ভব। দেশহিতৈষী নরনারীগণ এ বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্যকর কোনও উপায় করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

নানক।

শিখেরা যে ধর্ম্মের শিষ্য, তাহার নাম নানকপন্থী ধর্ম্ম। মহাত্মা নানক সা এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়াই ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে।

মহাত্মা নানক খ্রীষ্টীয় ১৪৬৯ অব্দে কালু নামক ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বিপাশা-নদী-তীরস্থ তালবণ্ডী। পূর্ব্বে এই স্থানটী একটী সামান্য গ্রাম ছিল, কিন্তু এক্ষণে একটী প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছে; ইহার নাম আর তালভণ্ডী নাই, ইহা এক্ষণে রায়পুর নামে প্রসিদ্ধ। নানাবাই নাম্নী নানকের একটী মাত্র ভগিনী ছিলেন। জয়রাম নামক একজন ক্ষত্রিয় যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকালেই নানকের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুরূপ পত্নী লাভ করিয়া তিনি অল্পবয়সেই শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামক দুইটী পুত্র সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে নানকের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এই সকল উপাখ্যান কত দূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বহুদর্শিতা ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করি-বার জন্য মহাত্মা নানক স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে সর্ব্বপ্রথম লাহোর পরিত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগস্থ প্রায় সমুদয় তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। দ্বিতীয় বার যাত্রা করিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতের সমস্ত তীর্থ স্থান ও সিংহল দর্শন করেন। তৃতীয় বার তীর্থযাত্রা করিয়া তিনি আরব ও পারস্য দেশে গমন করেন এবং মক্কা ও মেদিনায় মহম্মদের মসজিদ দর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। দেশভ্রমণের সময় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ মার্দনা এবং সাধু নামক অন্য এক শিষ্য তাঁহার সহগামী হইয়া-ছিলেন। মহাত্মা নানকের পর্য্যটন বিবরণ তাঁহারাই লিপিবদ্ধ করিয়া যান। দেশ-ভ্রমণের সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় হিন্দু মুসল-মান অনেক সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মার সহিত নানকের ধর্ম্মালোচনা ও বিচার বিতর্কাদি হইয়াছিল। এরূপ বিচারে মতদ্বৈধ হইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নানক কথনই

কাহারও সহিত বিবাদ করেন নাই। তিনি স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল ও শান্তিপ্রিয় বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল।

নানক যে কথা অনর্থক ও অহিতকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে এবং সর্ব্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরে নির্ভর করিতে লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। কোনও সময় একজন যোগী তাঁহাকে স্বীয় শক্তির নিদর্শনস্বরূপ কোনও একটী আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে বলেন। মহাত্মা নানক যোগীকে বলেন "আপনার দেখিবার উপযুক্ত কোনও ব্যাপারই আমি দেখাইতে পারিব না। নিজ ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা ভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচারকের আত্মসমর্থন করিবার আর কিছুই নাই। সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু স্রষ্টা চির-অপরিবর্ত্তনীয়।" নানকের জীবনী-প্রণেতা ভাই গুরুদাস বলেন, এই কথা শুনিয়া যোগী নানকের পদপ্রান্তে নিপতিত হন।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটনের পর নানক আর স্বদেশ পরিত্যাগ করিবেন না সংকল্প করিয়া ইরাবতী নদীতীরে কীর্ত্তিপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য কল্যানোরের রাজা তাঁহার বাসের জন্য এই স্থানে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি সংসারের অভাব অশান্তির আর্ত্তনাদ শুনিতে ভালবাসিতেন না, সুতরাং এই স্থানে নির্জ্জনবাসে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন পরম শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী ও পুত্রেরা কল্যানোরে অবস্থান করিতেন এবং সময়ে সময়ে কীর্ত্তিপুরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

নানকের সাধুতার সুখ্যাতি প্রচারিত হওয়াতে নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আসিতেন। এরূপ কথিত আছে, নানক যখন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, তৎকালে শ্রোতৃবর্গ মনে করিত যে, মনুষ্যের এই এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই। সপ্ততি বর্ষ বয়সে তিনি জীবন-লীলা সংবরণ করেন। ইরাবতী-তীরে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিস্তম্ভ স্রোতোবেগে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কীর্ত্তিপুর আজিও পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে—শত সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাগম-স্থানরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ-গণ কীর্ত্তিপুর মঠে নানকের পরিচ্ছদের অংশবিশেষ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। নানক মৃত্যুকালে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিবার ভার আপন পুত্রগণের উপর না দিয়া লেহানা নামক একজন প্রিয় শিষ্যের উপর প্রদান করেন। নানকের মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে অর্জ্জুন মল নামক একজন শিষ্যানুশিষ্য নানকের ধর্ম্ম-মত সমুদয় সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করেন। ইহারই নাম গ্রন্থজী বা আদিগ্রন্থ। নানকপন্থীদিগের ইহাই মূল ধর্ম্মগ্রন্থ।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

না, অতএব কনের বয়স ১৫।১৬র সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে। এদিকে আবার বরের পিতা উৎকণ্ঠার সহিত ১৪ বৎসর অপেক্ষা করেন। পুত্রটি যেই ১৫ বৎসরে পদার্পণ করে, সেই তাহার বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, ঘটনাক্রমে বালিকা-বিবাহ বন্ধ করিয়া মহা অনিষ্টকর বালক-বিবাহ দেশে প্রবল হইল। পিতা ধনলোভে বাল্যসীমা অতিক্রম না করিতে করিতেই পুত্রের বিবাহ দেন। এ দিকে প্রচুর ধনাভাবে কন্যার পিতা উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। কন্যা কুমারী অবস্থাতেই যৌবনসীমায় পদার্পণ করে, পরে সেই বয়ঃস্থা কনের সঙ্গে বালক-বরের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফল ভবিষ্যতে অতি বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। অতএব স্বামীর তখন গৃহবিমুখ ও দুর্নীতি-পর হওয়া বিচিত্র নহে। এদিকে স্ত্রী যথেষ্ট সন্তান সন্ততি লইয়া অন্তঃপুর অশ্রুজলে সিক্ত করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ১৫।১৬।১৭।১৮ বৎসরের কিশোর বালকদের সন্তান-সন্ততিও দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতে দেখা যায়। এ সমস্ত অনিষ্টই এক বরের কর্ত্তৃ-পক্ষদের কর্ত্তৃক সাধিত হয়। তাঁহারা যদি এই "পুত্রের বিয়ের টাকা লওয়া" নামক ঘৃণিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবে কনের পিতাও পরিমিতবয়স্কা কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হন (এবং আমার বিশ্বাস, এই ঘৃণাকর ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে পিতারও বালকবিবাহ দিবার ইচ্ছা নেহাত বলবতী হইবে না); বালকেরাও পত্নী-গলগ্রহরূপ ব্যাধি হইতে পরিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে; বর কনেরও উপযুক্ত বয়সে মিলন হইবে এবং সর্ব্বদিক্ মঙ্গল থাকিবে।

শ্রীঅম্বুজা—

দশা কি হলো?

হায়! দেশের কি দশা হলো?
কনে হল বছর কুড়ি,
বরে চায় গাড়ি যুড়ী,
আরো কত নগদ নগদ,
শুনে সবার প্রাণ শুকালো;
হায় দেশের কি দশা হলো?
হায় দেশের কি দশা হলো!
বড় চালাক বরের পিতা,
মোচে তা দিয়ে কয় কথা,
টেঁকো মাথায় হাত বুলায়ে—
"কত দিবে" বল বল।
"ওহে কনের পিতা কত দিবে বল বল?"
হায়! দেশের কি দশা হলো?
কনের পিতাকে হাতে পেলে
বরের পিতা বেঁধে হালে,
মাঠে মাঠে ঘুরায় ফিরায়,
সবে বলে বলদ ভাল।
হায় দেশের কি দশা হলো?

হিন্দু মরে কন্যা-দায়ে,
পুত্রের পিতা দেখে চেয়ে,
হাঁড়ির মত মুখ ফুলায়ে,—
হায়! ধর্ম্ম রসাতলে গেল!
হায় দেশের কি দশা হলো?
বরের ধনুর্ভঙ্গ পণ,
শুনে কাঁপে ত্রিভুবন—
নগদ নিব হাজার হাজার—
গহনার ফর্দ্দিত পিছে রৈল।
হায় দেশের কি দশা হলো?
হীরা মোহর স্বর্ণ রৌপ্য
রীতিমত মেপে নিব,
খাট আল্‌না অল্প কথা,
শাল বনাত আগে এনে ফেলো;
হায়! দেশের কি দশা হলো?
ডেস্ক বাক্স আর চেন ঘড়ি
পেন আর পেনকাটা ছুরী,
শ্বেত পাথরের আল্‌না চকী,
আয়না ক্রুষটী অতি ভাল।
দেশের গতি হায় কি হলো?
পুত্রের বিয়ে দিয়ে হায়!
পিতা রাজা হতে চায়,
গতিক মন্দ দেখে ধ্বন্ধ,
কনের পিতার প্রাণ শুকালো!
হায়! দেশের কি দশা হলো!!

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

বিবি বেসাণ্টের বক্তৃতা।

বিগত ২৭শে নবেম্বর শাহারাণপুরের স্থানীয় সুযোগ্য মুনসরিম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসাদ সান্যালের যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীমতী আনি বেসাণ্টের শুভাগমন হয়। অত্রত্য টাউনহলে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম্ম বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের জন্য নিম্নে বিবৃত করিলাম. তাঁহারা এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, এখনকার পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষা দান করিতে হইলে কি কি ব্যবহারের প্রয়োজন। তিনি বলেন—

"আজ কাল সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইতেছে, ইহার কারণ কি? ভারতবর্ষের শিক্ষিতসম্প্রদায় লুপ্ত বিষয় সকল উদ্ধার করিতেছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটার মূলে কতিপয় পাশ্চাত্য মনস্বীর যোগদান। তাহা হইতেই এই থিয়সফিকাল সোসাইটির সৃষ্টি। সোসাইটীর গবেষণা-কর্ম্মদ্বারা হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যের উদ্ধার হইতেছে। সোসাইটী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সাহায্য করিতে গিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মূলে গিয়া পড়িয়াছেন এবং সেই নিমিত্ত তাহাকে কুসংস্কার (superstition) মানিতে হইতেছে। অনেকে বলিবেন, কুসংস্কার মানা আবার কি? কিন্তু তাহা না মানিলে চলিবে না। (তিনি বলেন) যখন ধর্ম্মভীরুতা লোকের মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পায়, তখন তাহারা জীবনের সকল কার্য্যকেই ধর্ম্মের সহিত গাঁথিয়া ফেলে এবং তাহাদের জীবনের কোন একটি কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলেই তাহারা বলে এটা অধর্ম্ম হইল। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞানের সন্ধিস্থলে যে একটি ভাব নিহিত রহিয়াছে, সেইটিকে ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া তাহার উপর যথার্থ ধর্ম্মের সোপান গাঁথিয়া লইতে হইবে। সেই নিমিত্ত ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রথম প্রথম সুপারষ্টিসন (superstition) থাকিবেই থাকিবে। সোসাইটিকে সেই জন্য সুপারষ্টিসন্ মানিতে হইয়াছে।*

এককালে যখন হিন্দুদের ধর্ম্মবল ছিল, তখন হিন্দুরা সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতি ধর্ম্মকে আপনার সকল কর্ম্মের সহিত মিশাইয়া লইয়াছিল। তখন উহারা জ্ঞানবান্, বিদ্বান্, বলবান্, কীর্ত্তিমান্, বীর্য্যবান্, শৌর্য্যবান্ ছিলেন। যখন হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তখন বাহুতে বল, গৃহে লক্ষ্মী ও ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্তি ছিল। পরে যখন ক্রমশঃ হিন্দুর ধর্ম্মবল দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল, তখনই তাহাদের বল, বীর্য্য, মেধা একে একে লোপ পাইতে আরম্ভ হইল। বলবান্ হিন্দুর বাহুতে বল নাই, গৃহে লক্ষ্মী নাই, ভূমিতে শস্য আর তেমন উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বে মেধাবী ও প্রতিভাশালী হিন্দুজাতির মস্তিষ্ক হইতে সাঙ্খ্য, বেদ বেদান্ত, দর্শন বিজ্ঞান বাহির হইয়াছে; এখন আর সেরূপ একটীও বাহির হয় না। আসল (Original) পুস্তক আর প্রকাশিত হয় না। প্রতিভা যত দিন দিন কমিতে লাগিল, ততই আসল পুস্তক লেখা বন্ধ হইল, এবং আসল যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কেবল 'টীকা' বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু আজ কাল আর সেরূপ 'টীকা'ও প্রকাশিত হয় না।

ভারতবর্ষে আজিকালি দুই প্রকার লোক দেখা যায়—এক আগেকার কালের পণ্ডিত—ইঁহারা ইংরাজি জানেন না, সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অতি সুন্দররূপে অবগত আছেন; আর এক এখনকার নব্য শিক্ষিত কলেজের ছাত্রগণ—তাঁহারা কেবল দুই চারি পাতা ফিলসফি পড়িয়াছেন, অথচ সংস্কৃত শিক্ষা আদৌ হইতেছে না; ইহাঁদের দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উন্নতি হইবার আশা নাই। আজকাল নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়গণ নিজের ধর্ম্ম হারাইয়া, সামান্য দুই চারিটি ইংরাজি কথা কহিতে শিখিয়া এবং দুই চারি পাতা হার্বার্ট স্পেনসার, মিল, হেগেল, ক্যাণ্ট পড়িয়া আপনার সেই ধর্ম্মটিকে—যাহা তাঁহাদিগকে একদিন জগতের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল—ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং তাঁহাদিগের ভ্রম এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, যদ্যপি কেহ তাহাদিগকে সেই ধর্ম্ম-বিষয়ে কিছু বলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সে বিষয়টি তলাইয়া না বুঝিয়া হাসিয়া

* বিবী বেসাণ্টের সরলতা প্রশংসার্হ। তবে কুসংস্কার সর্ব্বতঃ পরিত্যাজ্য। বা, বো, স।

উড়াইয়া দেন। কিন্তু থিয়সফিক্যাল সোসাইটি এই ভ্রমের আবরণ তাহাদিগের চক্ষু হইতে উঠাইয়া দিতেছেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি তাঁহাদিরে ধর্ম্মের কুটজাল সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সুন্দররূপে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বুঝাইয়া দিতেছেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কাজ বুঝাইয়া দেওয়া। তুমি হিন্দু, তুমি নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখ, নিজনীতিপূর্ণ শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম সকল সুন্দররূপে বুঝিয়া তাহার উপর জীবনের পরিচালনা কর। পৃথিবীর সকল জাতিকে হিন্দু করা থিয়সফিক্যাল সোসাইটির উদ্দেশ্য নয়। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি এতকাল পরে বুঝিয়াছে যে, হিন্দুজাতির ধর্ম্ম যথার্থরূপে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে প্রাচীনগণকে শিখাইলে হইবে না, এখন হিন্দুজাতির বালকগণকে শিখান আবশ্যক; এবং তাহাদিগের বিদ্যার স্তম্ভ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের শিক্ষাদি কিরূপে দেওয়া হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

অতিদূর দেশ দেশান্তর হইতে বালকগণ আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য অতি সুন্দর বোর্ডিং হাউস আছে। বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার দেশহিতৈষী সম্ভ্রান্ত বাবু ভগবান দাস নিজের সকল কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া বোর্ডিংয়ের বালকদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আহার ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি বিনা বেতনে এই সকল কর্ম্ম করেন।

প্রথম—বালকগণ প্রাতে উঠিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করে। যতদূর সম্ভব এই বোর্ডিংয়ে অবিবাহিত ছাত্রগণকে রাখা হয়, এবং নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্র নিম্নশ্রেণীতে পঠদ্দশায় থাকিয়া বিবাহ করিবে, তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। এক কথায় বাল্যবিবাহ নিবারণ ও পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন ইহার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়—বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার অনেক আছে। এই বাল্যবিবাহই হিন্দুজাতির অবনতির এক প্রধান কারণ। হিন্দুজাতি ধর্ম্মকে যখন ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়াছিল, তখনকার তাহাদিগের দৈহিক ক্ষমতার বিষয় তাহাদিগের পুস্তকাদিতে পাঠ করিলে এবং এখনকার রুগ্ন, শুষ্ক, জরাজীর্ণ বালকবালিকাদিগের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিলে মনে হয় হিন্দুজাতির কি অধঃপতন ঘটিয়াছে। আজ পৃথিবীতে যত জাতি, তাহাদের মধ্যে হিন্দুজাতির বালকবালিকাগণ যেমন দুর্ব্বল, এমন আর কোন জাতিরই নাই। তাহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা থাকিলেও তাহার অতি অল্পই প্রকাশ পায়। এই বাল্যবিবাহই তাহাদের উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

তৃতীয়—ব্যায়াম। হিন্দুসন্তানগণের যাহাতে বল বীর্য্য বাড়ে, অঙ্গসৌষ্ঠবাদি সুন্দররূপে পরিপুষ্টতা লাভ করে, তাহার নিমিত্ত ব্যায়ামের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। বোর্ডিংয়ের বালকদিগকে সন্ধ্যার সময় তাহাদিগের শিক্ষকের সহিত ব্যায়াম করিতে হয়।

চতুর্থ—স্কুলের প্রাত্যহিক পাঠাদি আরম্ভের পূর্ব্বে বেদাদি পাঠ হয়, এবং নীতিশিক্ষার জন্য পুরাতন গ্রন্থ ও ধর্ম্মপুস্তকাদি—রামায়ণ, মহাভারত—হইতে তাহাদের সুন্দর সুন্দর চিত্র সকল শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি আরো বলেন, যদি কোন ছেলেকে বলা হয় "তোমরা পিতা মাতার বাধ্য হইবে, তাঁহাদের কথা শুনিবে," তাহা হইলে সে বলিবে "ইহাত মুখের কথা"। এইরূপ নীতিশিক্ষায় কোন ফল হয় না; যদি সেই বালকের সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ নীতি-চরিত্র ধরা যায়, এবং বলা যায় যে, তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনগমন করিয়াছিলেন ও কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তখন সে বালক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ কি করা উচিত, ইহা মুখের কথা নহে। ইংরাজ বালকগণের সম্মুখে নেল্‌সনের নাম করিলে এবং তাহার বীরত্বের কাহিনী শুনাইলে তাহাদের ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে, কিন্তু এ দেশে নেল্‌সনের কথা বালকগণকে আগাগোড়া পড়াইলেও তাহারা সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব এই বালকদিগকে পুরাকালের মহৎ চরিত্র শুনাইলে তাহাদের যত উপকার হইবে, নেল্‌সনের জীবনী আগাগোড়া পড়াইলেও তাহার ফল কিছুই হইবে না।

পঞ্চম—মৃত্তিকা দ্বারা মূর্ত্তি গঠন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাতে যদি একটি বালকও সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে শিখে, তাহাহইলে পৃথিবীতে সে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতে পারিবে।

হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য ছাত্রগণকে হিন্দু আদর্শে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া। কলেজে তিনটি ইউরোপীয় প্রোফেসর আছেন। ইহাঁরা কেহই বেতনভোগী নহেন।

ডাক্তার রিচার্ডসনের নাম বোধ করি আজকালকার বৈজ্ঞানিক জগৎ ভালরূপই জানেন। তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষাদানের ভার লইয়াছেন। এ বৎসর এ দেশের ছোটলাট বাহাদুর হিন্দু কলেজ পরিদর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার 'লেবরেটরি' দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ডাক্তার রিচার্ডসনকে জিজ্ঞাসা করেন, এই সকল যন্ত্রের মূল্য কত? ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন "বালকদিগের দশটি অঙ্গুলি"।

ভারতবর্ষে সকল প্রকার ধর্ম্মের লোকই আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, পার্শি, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, সকলি আছে। যদি তাহারা আপনাদের ধর্ম্ম লইয়া বাদানুবাদ করে, তাহা হইলে রাজ্যবিপ্লব ঘটে।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটি (religion

of tolerance) ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা শিক্ষা দেয়। থিয়সফিক্যাল সোসাইটী সকলকে স্ব-দলভুক্ত ও ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিতেছে যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান। যাহার যাহা ধর্ম্ম আছে, সে তাহাই করুক। পথ যদিও পৃথক্, কিন্তু উদ্দেশ্য এক, এবং শেষ-কালে আমরা যেখানে পঁহুছিব, তাহাও এক। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ কেবল এ সংসারেই হয়, স্বর্গে তাহা হয় না। আমরা এ পৃথিবীতে যে দেবতার উপাসনা করি, এবং নিজ নিজ যে দেবতা লইয়া অপরের সহিত বাদানুবাদ করি, সেই সেই দেবতা-গণ কিন্তু স্বর্গে কখনও আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ করেন না। আমরা সকলেই সত্যের অনুসরণ করিতেছি, সত্য এক বিন্দুর মত মধ্যস্থলে স্থাপিত, আমরা তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে দিক্ দিয়াই হউক না কেন যখন তাহার দিকে ধাবিত হই, তখন দেখিতে পাই যে, আমরা শেষে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার আপনার লক্ষ্য স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

শ্রীশশিমুখী দেবী।

মৃত্যু বা নিভৃত চিন্তা।

মৃত্যু শব্দটী বড়ই ভয়ানক। মানব-মাত্রেই ইহাতে ভীত ও স্তম্ভিত! কিন্তু, মৃত্যু কি? মরে কে? এইমাত্র যে মানব চলিতেছিল, বলিতেছিল, কত কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ সে রোগগ্রস্ত হইল। দারুণ যন্ত্রণা ভুগিয়া অকস্মাৎ প্রাণ হারাইল। তাহার সব ফুরাইল। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ সেইরূপ অটুট রহিল, কিন্তু অসাড়—মৃত! আর নয়নে দৃষ্টি নাই, মুখে হাসি নাই, শরীরে শক্তি নাই; জিহ্বায় কথা বা হৃদয়ে স্পন্দন নাই। সব নিশ্চল! নিশ্চেষ্ট! জড়! অথচ দেহীর দেহের সবই আছে, কিন্তু তাহার ক্রিয়া নাই। শোকাতুরা জননীর হাহাকার, স্ত্রীর কাতরতা, সন্তানের করুণ রোদন, এ সব কিছুই তাহার কর্ণে বা অন্তরে প্রবেশ করে না। এখন সে আত্মা মায়া মোহের অতীত হইয়া অদৃশ্য কোন্ দূরতর স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কে জানে?

মৃত্যুর পর জড় দেহ পড়িয়া থাকে, অথচ তাহাতে কিছুই থাকে না। এ দেহ সে নয়! দেহ পঞ্চ ভূতের সমষ্টিমাত্র। এই ভৌতিক দেহ পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া যায়। জড় দেহকে যে চালাইয়াছিল, সে চৈতন্য কোথায় বিলুপ্ত হয়? এই চৈতন্যের তিরোধানই মৃত্যু! কত মানব এখনি এ জগত ছাড়িতে হইবে, তাহা বুঝে না, জানে না; এবং মৃত্যুর জন্য কিছুমাত্রই প্রস্তুত থাকে না। অতি অতর্কিত ভাবে মানবের নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহার যুক্তের দেহ অবশ করিয়া চৈতন্য অলক্ষিত ভাবে কোথায় চলিয়া যায়! তাই ভাবিতে-

ছিলাম মৃত্যু কি? চৈতন্য অবিনাশী, নিত্য, সত্য, শুদ্ধ। যে মৃত্যুর নামে আমরা ভীত ও কম্পিত, তাহা সুধু দেহত্যাগ বই আর কিছুই নহে। যেমন কাপড় পুরাতন হইলে বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ রক্তমাংসগঠিত দেহ জীবাত্মার বাসের অযোগ্য হইলেই আত্মা স্থানান্তরে গমন করে। ইহাই মৃত্যুনামে সংসারে পরিচিত। সবল সুস্থ দেহও মানবাত্মা ত্যাগ করে, সুতরাং দেহত্যাগ বা মৃত্যুর কর্ত্তা দেহও নয়, দেহীও নয়। মৃত্যু নিত্য সত্য চিন্ময় ভগবানেরই লীলা। তাঁহারই ইঙ্গিতে মানব এ মমতাপূর্ণ সংসার হইতে চলিয়া যায়।

আহা! মানবজীবন কত স্নেহ-ভাল-বাসাপূর্ণ হৃদয় লইয়া, কত উৎসাহ আশা বাসনা লইয়া সংসারে খাটিতেছিল, কে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল? কতকগুলি শক্তি বৃত্তি লইয়া মানব এ জগতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। যেই তাহার কার্য্য শেষ হইল, অমনি মানবের আসা যাওয়ার কর্ত্তা যিনি, সময় বুঝিয়া ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু মানবের কার্য্য শেষ হইল, কি অপূর্ণ রহিল, মানব তাহা বুঝিল না। সেই সচেতন নির্ব্বাক্ ইঙ্গিত মানব উপলব্ধি করিতে পারে না, অথচ যন্ত্রারূঢ় যন্ত্রের ন্যায়, বাজীকরের পুতুলের ন্যায় অবশ ভাবে চলিয়া যায়। কেন আসে, কেন যায়, আমরা বুঝিতে পারি না।

এ সংসার পান্থনিবাস। এখানে আমরা সকলেই পথিক। আমাদের কর্ত্তা চির-মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাই আমরা আসিয়াছি। আবার যখন ডাকিয়া লইবেন, চলিয়া যাইব। তাঁহার স্নেহাকর্ষণ সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি রহিয়াছে। তিনি কেন যে কি করেন, আমাদের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। ঈশ্বর যাহাকে যতটুকু শক্তি ও কার্য্যের পরিসর দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, সে ততটুকু করে। যখন তাহা শেষ হয়, তখনই সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তাহাকে ডাকিয়া লন। আমরা তাহা বুঝি না; তাই কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, সময় অসময়, বালক বৃদ্ধাদি ভাবিয়া নানা ভাবে আকুল হই। কিন্তু মানবের চৈতন্য যিনি, তিনি সর্ব্বদাই বালক যুবক বৃদ্ধ। তিনি নিত্য, সমভাবে নবীন প্রবীণ। তিনি কাহাকেও অসময়ে লন না। যাহাকে যে কয় দিবসের জন্য পাঠাইয়া-ছেন, সে তত দিন মাত্র থাকে।

এ সংসার পান্থনিবাস, এখানে আমরা সকলেই পথিক। এ স্থান আমাদের চির দিনের নয়। আমরা পূর্ব্বেও এখানে ছিলাম না, পরেও থাকিব না। এই সংসার হইতে যাহারা গিয়াছে, তাহারাও আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নাই বা আমাদিগকে সঙ্গেও লয় নাই। আমরাও যখন যাইব, কাহারও জন্য অপেক্ষা করিব না বা কাহাকেও সঙ্গে লইব না। যে যতই কেন প্রিয় হউক না, তাহার সঙ্গে কেবল পথের পরিচয়। এ সংসারের

ভালবাসা কেবল অনিত্য বাসনাময় মোহের বন্ধন। এই সুঠাম সবল দেহ, ইহার পরিণতি ভস্মাঙ্গার! এই শোক, দুঃখ, সুখ, শান্তি, হর্ষ, বিষাদ, সমুদায় কিছুকালের জন্য মাত্র। আমাদের সঙ্গে এ সব কিছুই যাইবে না। এখনকার এই আলো তেজ জল বায়ু আদির সঙ্গেও আমাদের ভৌতিক দেহের সম্বন্ধ মাত্র। এই দেহ পরিণামে পঞ্চে পঞ্চ মিশিয়া যাইবে। এই ভূতময় জগতের সংযোগ বিয়োগ পর্য্যায় দেখা যায়। এই মাটীর দেহ মাটী হইয়া শস্যাদিতে পরিণত হইয়া জীবদেহের পুষ্টি-সাধন করতঃ প্রকারান্তরে পুনরায় দেহ-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু এ নশ্বর বস্তু মানবাত্মার সঙ্গে যাইবে না। চিরদিন একভাবেও থাকিবে না। প্রাকৃতিক নিয়মে সর্ব্বদাই ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি, নূতন, পুরাতন প্রভৃতি নানারূপ পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। চিরস্থির মানবচৈতন্য সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। এ মর জগতের ক্ষণস্থায়ী কোনও বস্তুর সহিতই তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

মৃত্যুই সর্ব্বদা আমাদিগকে এ শিক্ষা দিতেছে যে, এ সংসার অসার! তথাপি আমরা মোহান্ধ হইয়া "আমি," "আমার" ভাবিয়া অস্থির হইতেছি। আমার পিতা, মাতা, ভাই, বোন, পতি, সন্তান, আমার মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, আমার বাড়ী ঘর, সম্পত্তি বলিয়া কতই না দম্ভ করিয়া থাকি। একবারও ভাবিয়া দেখি না আমার কি? প্রতিমুহূর্ত্তে এই দেহ ও জীবনের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, জীবন অসার করিয়া, হৃদয় চূর্ণ করিয়া, জগৎ অন্ধকার করিয়া জীবনের অতি প্রিয় জিনিসগুলি চলিয়া যাইতেছে। মৃত্যু হাতে কলমে সংসারের অসারত্ব বুঝাইয়া দিতেছে। তথাপি আমরা এমনি ভ্রমান্ধ ও জ্ঞানহীন যে, গুরু আঘাতে ভগ্নহৃদয়ে, আবার সেই "আমার" লইয়াই ব্যস্ত। এমন কি আরও পাঁচটা আমার কল্পনা করিয়া অসার চিন্তায় মগ্ন হই। শুভময় জগৎস্বামী মৃত্যুদ্বারা পুনঃপুনঃ আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে, "এ সংসার কিছু নয়! সব অনিত্য অসার!" আরও বলিতেছেন, "এ অসার সুখকল্পনা ত্যাগ করিয়া সত্যপথ অন্বেষণ কর।" আমরা মোহান্ধ মানব সে সত্যকে সত্য জানিয়া, প্রকৃত সত্য উপেক্ষা করিয়া বৃথা সুখ-কল্পনায় ও শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া দিন দিন অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছি। হায়! আমাদের দুর্গতির কি শেষ আছে? মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া আমরা শূন্যে গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে চাই। যদি আমরা স্থির-ভাবে একটু আপনার দিকে তাকাই, তবে আর মন অসার সুখ-কামনায় প্রমত্ত হয় না, সুতরাং শোক দুঃখেও এরূপ অভিভূত হইতে হয় না। আমরা বৃথা সুখ-কামনায় প্রলুব্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতেছি। এই জন্য প্রতিপদক্ষেপেই পতিত হইতেছি এবং আঘাতে, আঘাতে হৃদয় চূর্ণ হইয়া জীবনকে বড়ই সন্তপ্ত ও দুর্ব্বল করিতেছে। মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, এই সংসাররূপ পান্থনিবাসে

আমরা কয়েক দিবসের জন্য আসিয়াছি। কে জানে, কখন কাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার। যত দিন আমি এ জগতে আছি, ততদিন আমার জগৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে। যে মানব যত দিন এ স্থানে আছে, তত দিন আমার তাহারও প্রতি কর্ত্তব্য আছে। আজ যাহার কাল হইবে, কাল আমরা তাহার কি করিতে পারি? কাল আর তাহার প্রতি কাহারও কোন কর্ত্তব্যই থাকে না। আমাদের চিত্ত তৃপ্তির জন্য, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অনেক কান্না কাটি করিতে পারি, সমারোহপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি বা দান করিতে পারি, মৃত ব্যক্তির স্মৃতির জন্য যথেষ্ট শ্রম, যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে মৃত ব্যক্তির কোন অভাবেরই পূরণ হয় না, অথবা ইহাতে তাহার কোন তৃপ্তি নাই। যে যত দিন সংসারে আছে, তত দিন তাহাকে সদ্ব্যবহারে সন্তোষে রাখিতে পারিলে, কোন প্রকারে তাহার ক্লেশের কাজ না করিয়া তাহাকে বিদায় দিতে সর্ব্বদা সমাহিত ও সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে, তবেই উভয় দিকে কিছু তৃপ্তি ও শান্তির আশা থাকে।

কিন্তু আমরা বড়ই মোহমুগ্ধ। সর্ব্বদা মৃত্যুর সহিত পরিচিত হইয়াও আমরা যেন সকলেই অমর এই ভাবে সর্ব্বদা ইচ্ছামত কর্ত্তব্য নিরূপিত করিয়া কার্য্য করিতেছি, একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, পরে ইহার জন্য আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে। বিধাতারই কি এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে, আমরা সময় থাকিতে কিছু বুঝি না। যখন-কার যাহা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত মত করা যায়, তবে দুঃখময় সংসারে কতক শান্তির আশা থাকে। কিন্তু পরি-তাপের বিষয় যে, সময় অতীত না হইলে আমাদের সময়োচিত জ্ঞান জন্মে না। যখন যাহার অভাব হয়, তখনই তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি। তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই বলিয়া অনুতাপে দগ্ধ হই। তখন আর তাহার প্রতীকারের কোনও উপায়ই থাকে না। হায়! যদি সর্ব্বদা সকলের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিতাম, সকলের প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি না করিতাম, তবে এ শোকার্ত্ত হৃদয়ে কতক শান্তির আশা থাকিত। এখন যে দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, তাহার কোনও প্রতীকার নাই।

মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদিগকে বলিতেছে, "এ সংসারে সকলেই অতিথি। অতিথি অবহেলায় চলিয়া না যাইতে যাইতে তাহার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর।" গৃহে কোনও অতিথি উপস্থিত থাকিলে অতিথির সকল অভাব কায়মনোবাক্যে পূরণ করিতে পারিলে গৃহস্থের হৃদয়ে অতুল আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই সংসার-গৃহে প্রত্যেকেই অতিথি। যদি প্রত্যেকেই অতিথি, যদি প্রত্যেকের প্রতি

যথোপযুক্ত ব্যবহারের ত্রুটি না হয়, তবে নানা প্রকার শোক দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইলেও কতকটা প্রবোধ বা শান্তির আশা থাকে। কিন্তু কয়টী মানব মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন যে "আমার জীবনে কোনও গত বিষয়েরই জন্য অনুতাপ নাই এবং আমি আমার জীবনের সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি।" হায়! আমাদের প্রতিপাদক্ষেপেই ভুল ত্রুটি আমাদিগকে জড়াইয়া রহিয়াছে। মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণে এই প্রশ্নের উদয় করিতেছে যে, "মৃত ব্যক্তি সুখে থাকে ত?" কত লোক মৃত্যুসময় দুঃখব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করে ও অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া যায়। আহা! দেহত্যাগের পর কি আর তাহাদের এ মর্ত্ত্য জগতের প্রতি কোনও মমতা থাকে? মরিতেছি ইহাও ত কত লোক বুঝে না? আহা! তাহারা জগৎ ছাড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া জগতের স্নেহ মমতার জন্য কি কাতর হয়? না তাহারা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ইহকালের সমুদায় বিস্মৃত হইয়া চিরশান্তি লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যদি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইত, তবে অনেক শোকদগ্ধ প্রাণের সান্ত্বনার বিষয় থাকিত। কিন্তু ভগবান্ সে পথ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়াছেন। সকলই তাঁহার শুভ ইচ্ছার শুভ বিধান। তিনিই আমাদের প্রবোধ ও শান্তির আশ্রয়।

আমরা যদি শান্তির আশ্রয় ও নিত্য ধন চিনিয়া লইতে উৎকণ্ঠিত হইয়া চেষ্টা করি, তবে সম্ভবত সফলকাম হইয়া প্রাণের হাহাকার দূর করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে আর মৃত্যুকে অত নির্দ্দয় ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইবে না, বরং পরমহিতকারী সুহৃদ বিবেচনায় তাহাকে সুখে আলিঙ্গন করিতে পারিব। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু কখনও ভয়জনক বা নির্দ্দয় ও দুঃখজনক নয়। মৃত্যু পরমকারুণিক পিতার শুভ হস্তের করুণা-প্রসাদ। একমাত্র মৃত্যুই আমাদের মোহনিদ্রায় নিদ্রিত জীবনকে জাগ্রত করিতে সক্ষম। একমাত্র মৃত্যুই অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া চিরসত্য অনন্তের পানে আকর্ষণ করিতেছে।

তাই বলি, আমার চিরসুহৃদ্ মৃত্যু! তুমি আমাকে শৈশবকালাবধি নির্ঘোষিত করিয়া বলিতেছ, "অসার সংসার", কিন্তু আমি এমনি মোহান্ধ যে, তাহাতেও সংসারের অসারত্ব বুঝিয়াও বুঝি নাই। একটি হারাইয়া অপরটিতে অধিকতর জড়াইয়া পড়িতেছি, এবং নির্দ্দয় মৃত্যু আমার কোন্‌টী কাড়িয়া লইবে? সর্ব্বদা এই ভয়ে ভীত হইতেছি। মৃত্যু! তুমি করুণাময় শ্রীহরির শুভ হস্তের শুভ নিদর্শন, মানবজীবনের মঙ্গলের নিমিত্তই ওরূপ মর্ম্মাঘাতীরূপে জগতে আগমন করিয়া মানবগণের হিতসাধন করিতেছ। আমরা বুঝি না, তাই তোমার আগমনে ভীত শোকার্ত্ত হইয়া হাহাকার করি।

আমরা অত্যন্ত ভ্রমান্ধ, তাই তোমার শান্তিময় প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই না, তাহার পরিবর্ত্তে তোমার রুদ্র মূর্ত্তিতে শিহরিয়া উঠি। আমার চিরসুহৃদ্ মৃত্যু! তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর যে, ভবিষ্যতে যখন তুমি আগমন করিবে, আমি যেন তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে পারি। তোমার কার্য্যে অধীর না হইয়া সমাহিতচিত্তে শুভানয়ন্তার ধ্যানে মগ্ন হইতে পারি। তুমি যখন আমাকে আহ্বান করিবে, আমি যেন অবিকৃতচিত্তে সুধাময় শ্রীহরির চরণ স্মরণ করিতে করিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারি!

ইহা পাঠে যদি কোনও শোকার্ত্তহৃদয় পাঠিকা বিন্দুমাত্রও তৃপ্তিবোধ করেন, তবেই আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।

আশু ভ্রাতা ও সন্তান-হারা
জনৈক বিধবা।

নূতন ও পুরাতন প্রভু ও ভৃত্য।

আজকাল অনেকের মুখে নব্য ভৃত্য ও ঝির নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় তাদের আর কাজে আঁঠা নাই, প্রভু প্রভুপত্নী বা তাঁদের সন্তান সন্ততি বা আত্মীয় স্বজনের প্রতি আর টান নাই, প্রভুশক্তিকে আর তত ভয় করে না। কথাটা যে একবারে ভিত্তিশূন্য, তাহা বোধ হয় না। বস্তুতঃ আজকালকার ভৃত্য একরূপ নূতন জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় সে কাজে ফাঁকি দিতে চায়, টাকার প্রতি অথবা লাভের প্রতি বিশেষ আসক্তি দেখায়, আহারাদি ভাল না হইলে রাগ করে, দুই একখানা বেশী কাজ করিতে হইলে বিরক্তি প্রকাশ করে, এমনই চলিয়া যাইবার ভয় দেখায়,—এক কথায় "পানেতে চূণ খসিলে" অনর্থ ঘটাইয়া তুলে। যাঁহাদের চাকর বাকর না রাখিলে চলে না, তাঁহাদিগকে অনেক সময় তাহাদের উৎপাতে তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। উপদ্রবটা সহরে কিছু বেশী। লোকজনের দরকার পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে অনেক অধিক, চাকরি যাইলে সেখানে শীঘ্র নূতন চাকরি জুটাইয়া লওয়া যায়। পল্লীগ্রামে অনেক সময় চাকর মেলেই না, যদি মেলে তাহারা তত মুখর বা অল্পে অসন্তুষ্ট নয়।

একটা কথা উঠিতে পারে—ঝি চাকরের ত দোষ অনেক, কিন্তু নব্য মুনিব বা মুনিবানীর কি কোনও দোষ নাই? সেকালের প্রভু বা প্রভুপত্নী লোকজনকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ করিতেন, একালের তাঁরা কি সেইরূপ করেন? এ প্রশ্নে কেহ কেহ বিরক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা

ভাবেন চাকর মাহিনা খায়, আহার পায়, প্রভুর কাজ তার প্রাণপণে আনন্দের সহিত করা কর্ত্তব্য; যদি সে না করে, তার 'নিমকহারামী' হয়। প্রভু তাহাকে মাহিনা দেন, আহার দেন, আর সে তাঁর নিকট হইতে কি বেশী প্রত্যাশা করিতে পারে? তাঁর আর তার প্রতি অন্য কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? গলদ কিন্তু এইখানেই। প্রভু যদি মনে করিতে পারেন চাকরকে আহার ও মাহিনা দিলেই তার প্রতি তাঁর সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইল, তবে সামান্য নিরক্ষর ভৃত্যের ইহা মনে করা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে সে যাহা পায়, তার উপযুক্ত কাজ সে করে এবং তাহা করিলেই তার কর্ত্তব্যের (যদি তার কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে) শেষ হইল?

কথা হইতেছে এই এখনকার ভৃত্য ও প্রভু দুইই নূতন, কাহারও হৃদয়ে পুরাতন ভাব নাই; কাজে কাজেই উভয়ে উভয়ের ছিদ্রান্বেষী। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ এখন একটা চুক্তিমাত্র দাঁড়াইয়াছে। তুমি ভৃত্য, তোমাকে আমি এই এই দিব এবং তাহার পরিবর্ত্তে আমি এই এই চাই; মন যায়ত চাকরি লইতে পার। ভৃত্য ভাবিল এই এই পাইলে আমি এই এই করিব। যখন সম্বন্ধটা এইরূপ দাঁড়াইল, তখন যে কোন পক্ষই অপর পক্ষের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না, একটু অনুধাবন করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। যেখানে একটা সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্রে দাঁড়ায়, সেখানে দুই পক্ষেরই কেবল নিজের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভাবা অবশ্যম্ভাবী। যাহা কিছু চুক্তির বাহিরে মনে হইবে, কোন পক্ষেরই তাহা করিতে ইচ্ছা হইবে না এবং কখনও এক পক্ষের—কখনও অন্য পক্ষের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে। যেখানে কোন একটা সম্বন্ধ চুক্তির মধ্যে গণ্য হয়, সেইখানে তাহা হৃদয়বিহীন হইয়া পড়ে। চুক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে-আইনের কথা, ইহার ভিতর হৃদয় স্থান পাইতে পারে না।

বর্ত্তমান কালের প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অনেকটা চুক্তির সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মুনীব ও চাকরের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, প্রভুর প্রতি ভক্তি ও ভৃত্যের প্রতি স্নেহ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের এই সম্বন্ধটা একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের হইত, এখন উহা দেনেওয়ালার সঙ্গে করনেওয়ালার সম্বন্ধ মাত্রে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য আজকাল আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যেও কখন কখন প্রভু ভৃত্য আইনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীদের সময়ে কিন্তু এমন ছিল না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ধনীদের গৃহে দূরে থাকুক, অনেক মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের গৃহেও অনেক দিনের পুরাতন চাকর ঝি থাকিত। তাহাদিগকে বাড়ীর পরিবারভুক্ত মনে হইত, বাড়ীর কর্ত্তা বা গৃহিণী যেমন নিজেদের ছেলে-মেয়ের আবদার সাহ্লাদে সহ্য করিতেন, তাঁহাদের আবদারও সেইরূপ করিতেন,

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে পিলেদিগকে তাহারা অবাধে শাসন করিত, কেহ তাহাদিগকে তাচ্ছিল্য বা অনাদর করিত না। তখনকার ভৃত্য "চাকর" বলিয়া এবং ঝি "দাসী" বলিয়া আখ্যাত হইত না, বাড়ীর সকলকার সঙ্গে তাহাদের একটা "গ্রাম-সম্পর্ক" থাকিত। ভৃত্য কেনারাম তখন কর্ত্তা গৃহিণীর "কিনু", তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের "কিনু" দাদা এবং পৌত্র পৌত্রীদিগের "কিনু" জেঠা। তাহাকে চাকর বলিতে কেহ সাহস পাইত না, অথবা তার সম্বন্ধে ওকথা কাহারও মনোমধ্যে উদিত হইত না। চাকর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ঝী সম্বন্ধে তাহাই ছিল। মন্দাকিনী ঝী অনেক সময়ে "মন্দা", "মন্দা" দীদী বা "মন্দা" পিসী বলিয়া অভিহিত হইত। ভৃত্যাকে "ঝী" বলাটা কি সুন্দর ও সহৃদয় প্রথা! পূর্ব্বে সে কন্যাভাবে লালিত পালিত হইত, দাসী ভাবে নয়। আজকাল কিন্তু কোন কোন স্থানে ভৃত্যকে "চাকর" বলিয়া ও ঝীকে "দাসী" বলিয়া ডাকিতে শুনা যায়। আমার চক্ষে এরূপ প্রথা বড় নির্ম্মম ও কদর্য্য বলিয়া ঠেকে। পূর্ব্বে যে শুধু অনেক দিনের ভৃত্য দেখা যাইত, তাহা নয়, অনেক সময় কোন কোন পরিবারের লোক পুরুষানুক্রমে কোন বাড়ীতে ভৃত্য থাকিত। আজ কাল এই সব প্রথা অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে উঠিয়া গিয়াছে বা শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যাইতেছে।

এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ [illegible] দাঁড়াইয়াছে কেন? হৃদয়ের মায়া[illegible]র চিহ্ন উহা হইতে উঠিয়া যাইতেছে কেন? আজ কাল স্বাধীনতার দিন—অর্থনীতির দিন পড়িয়াছে। পুরাতন সবই চলিয়া যাইতেছে। সকল বিষয়েরই ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে। যখন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, মাতা সন্তানের সম্বন্ধ, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বা হইয়াছে, তখন কি করিয়া আশা করা যায় যে, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ পূর্ব্বের ন্যায় অটুট থাকিবে, তাহাতে পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়িবে না? যেখানে সবই পরিবর্ত্তনশীল, সেখানে একটা বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না; হইলে চলিবে কেন? অতি পুরাকালের কথা জানি না, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে স্বাধীনভাবের এত বহুল প্রচার ছিল না, চিরাগত প্রথার প্রভাব খুব ছিল, পিতৃ-পিতামহ যাহা করিয়া আসিয়াছেন, পুত্র পৌত্র তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিতেন। এখন সকল লোকের মন হইতে অল্প বিস্তর এ ভাব চলিয়া যাইতেছে। কাজে কাজেই প্রভু ভৃত্যের পূর্ব্ব সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে এখন স্বাধীনতার দিন উপস্থিত। দেশের পুরাতন ব্যবসা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু নূতন ব্যবসাও কতক কতক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকের চক্ষু কর্ণ ফুটিয়াছে, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে এখন অনেকে অনিচ্ছুক।

সহর অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি করিলে কথাটী বেশ বুঝা যাইবে। কলিকাতা ও তার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাটের কল, কাগজের কল প্রভৃতি অনেক কল হইয়াছে। ইহাতে অনেক লোক কাজ পাইতেছে। কলে কাজ করিলে বেশ দু পয়সা পাওয়া যায়, এবং নিয়মিত ছয় ঘণ্টা কাজ করার পর কলের লোক জন সব স্বাধীন। অতিরিক্ত সময় যদি কখনও কাজ করিতে হয়, তার জন্য অতিরিক্ত পয়সা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সব লোকের দাস্যবৃত্তি প্রধান অবলম্বন ছিল, এখন তাহারা উহা ছাড়িয়া কলে কাজ করিতেছে। দাস্যবৃত্তিতে আয় কম এবং অধীনতা বেশী। গৃহস্থের বাড়ীর চাকর দিন রাত্রির চাকর। একটুকু সময় নিজের বলিতে পারে, ইহা তাহার নাই। কাজেই কলে কাজ পাইলে অনেকে আর দাসত্ব করিতে রাজী হয় না। কলের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ডক জেটী প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

কল কারখানা ছাড়া আরও উপার্জ্জনের নূতন পন্থা কতক হইয়াছে। অল্প দিনের ভিতর দেশে পাট, নীল, গম, চা প্রভৃতির চাষ আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মণ বিজ্ঞানবিদের প্রতিযোগিতায় নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে বটে, কিন্তু পাট চা প্রভৃতির চাষ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাগমের এই নূতন উপায় হওয়ায় লোক নিতান্ত অপদার্থ না হইলে আর দাসত্ব করে না। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বেহার অঞ্চল হইতে চাকরের আমদানী হইত। আজ কাল অনেক বেহারী চা বাগানে গিয়া থাকে। আসাম ব্রহ্মদেশ ত ঘরের কথা হইয়া পড়িয়াছে; কত লোকে পয়সার চেষ্টায় সমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। দেশে রেল বিস্তার হওয়ায় অনেক লোকে কাজ পাইয়াছে ও পাইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে অনেক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ত্ত-বিভাগে এবং গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসাদারদের আফিসে অনেক লোক কুলি পেয়াদা প্রভৃতির কাজ করিতেছে। সকল বিভাগের নাম ধরিয়া উল্লেখ অনাবশ্যক। এমন কথা বলি না যে, যে সব লোক এই সব কাজে ব্যাপৃত, তাহারা সকলেই চাকর-শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। চা বাগান, খনি প্রভৃতিতে অনেক সময় এরূপ লোকে কাজ করে যাহারা কখনও দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিত না বা করিতে পাইত না। নানা রকম ব্যবসায়ের উল্লেখ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য দেখান যে আজ কাল নিম্নশ্রেণীর লোকের উপযোগী নানা কাজের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে দাস্যবৃত্তিতে আয় অনেক কম। খোরাক পোষাক ছাড়া চাকরের মাহিনা জোর ৪ টাকা ও বীর জোর ৩ টাকা। পূর্ব্বে যখন লোকের অভাব কম ছিল এবং আবশ্যক বস্তু সকল অনেক সস্তা ছিল, তখন মাহিনা আরও

কম থাকা সত্ত্বেও লোকের দাস্যবৃত্তিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না। এখন অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, সামান্য লোকেরও জুতাজোড়াটী, ছাতাটী ও কামিজটী না হইলে চলে না, কাজেই অল্প আয়ে সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে লোক পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল, কল কারখানায় সে যদি মাসে ১২।১৪ টাকা উপায় করিতে পারে, দাস্যবৃত্তির ৮।১০ টাকায় কেন সে সন্তুষ্ট থাকিবে?

সকল কথারই আভাস উপরে দিয়াছি। এখন কেবল তাহা একটু বিশদ ভাবে বলা যাইবে। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। আমার বক্তব্যগুলি ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সাজান হইতেছে না, বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকারা দয়াপূর্ব্বক এ কথা মনে রাখিয়া যেন আমার সাজানর দোষ মার্জ্জনা করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন স্বাধীনতার দিন পড়িয়াছে। লোকের চক্ষু ফুটিতেছে, স্বার্থের দিকে বেশী টান হইতেছে, সেই জন্য দাস্যবৃত্তি অসন্তোষকর ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। যদিও খুব ধীরে ধীরে তবু ক্রমে ক্রমে দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রচার হইতেছে। শিক্ষার এক অনিবার্য্য ফল আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধি, নিজ অবস্থায় অসন্তোষ ও আত্মসম্মানের বিকাশ। সাধারণ শিক্ষা সামান্য হইলেও, ইহার বিস্তার বহুল না হইলেও, ইহার ফল ক্রমে ক্রমে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অভাব পূরণের জন্য লোকে নিজের গ্রাম বা মহাকুমা বা জেলা পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ নয়। পূর্ব্বে যাহাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহাদের পুত্র পৌত্রেরা এখন অকুতোভয়ে ঔৎসুক্যের সহিত "সাগর ডিঙ্গে, গিরি লঙ্ঘে" দেশ দেশান্তরে যাইতেছে। "গ্রামে কাজের সুবিধা নাই, চল সহরে যাই; সহরে নাই, চল কলিকাতায় যাই" এইরূপ ভাব অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে সব নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাহা নয়। তবে শিক্ষাবিস্তার হইলে যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের উপরেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-প্রসাদাৎ দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। চোর ডাকাত লাঠিয়ালের ভয় অনেক কমিয়াছে। লোকের স্থানান্তরে যাইবার ব্যাঘাত অনেক অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বিদেশে যাওয়া এক ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। চোর ডাকাতের উপদ্রবের কথা ছাড়িয়া দিলেও পথে লাঠিয়ালের উপদ্রব বেশ ছিল। অনেক জেলা হইতে তাহাদের কিম্বদন্তী আজও তিরোহিত হয় নাই। আজ কাল এই সব উপদ্রব অনেকটা উপশান্ত, কাজেকাজেই লোক অর্থের অন্বেষণে দূরদেশে যাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

আর এক কথা। কিছুকাল পূর্ব্বে দেশে রাস্তা ঘাটের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। অনেক স্থলে রাস্তা বলা যাইতে পারে, এমন কিছু ছিল নাই বলিলে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে রাস্তা ঘাট পুল প্রভৃতি অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। পথিকদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। তাহা ছাড়া চারিদিকে রেলওয়ে ও ষ্টীমার পথ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকেরই মনে থাকিতে পারে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধিষ্ণু লোকবলসম্পন্ন লোকের পক্ষেও গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাওয়া কি বিরাট ব্যাপার ছিল। এখন কিন্তু রেল বা ষ্টীমার যোগে যে সে অবাধে যেখানে সেখানে যাইতেছে। ছয় দিনে লোকে ছয় মাসের পথ গমন করিতেছে। পেটের দায়ে বা অবস্থার উন্নতির চেষ্টায় কত লোক কত কত জায়গায় যাইতেছে। পূর্ব্বে যাহাদের গ্রামের বাহির হইবার উপায় ছিল না, গ্রামে যে কাজ জুটিত তাহা গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, এখন তাহারা অনায়াসে তিন চারি জেলা পার হইয়া দেশান্তরে যাইতেছে। পাঠক পাঠিকারা সকলেই এই সব অবগত আছেন, এ সম্বন্ধে বেশী লেখা তাঁহাদের বুদ্ধির অবমাননা করা ভিন্ন আর কিছু নয়।

যে যে কারণে পুরাতন ও নূতন ভৃত্যের মধ্যে এত প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কতকগুলির কিঞ্চিৎ আভাস উপরে দেওয়া হইল। পুরাতন ও নূতন প্রভুর মধ্যে প্রভেদের কারণ কি তাহার আলোচনা আবশ্যক। বিস্তীর্ণ আলোচনা আমার ক্ষমতাতীত এবং বামাবোধিনীতে স্থানের প্রাচুর্য্য নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইবে।

ভৃত্যকে আমরা যে আর পূর্ব্বের চক্ষে দেখি না, তাহা কতকটা বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে। এখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার। ইংরাজী শিক্ষা প্রচার হওয়াতে ইংরাজী ভাবও আমাদের মনে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। না করাই আশ্চর্য্য। ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চরিত্র ও অর্থনীতি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কাজেই জ্ঞাত ভাবেই হউক আর অজ্ঞাত ভাবেই হউক, আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকসমূহের চরিত্র ইংরাজী ছাঁচে গঠিত হইতেছে। ইংরাজ যাহা ভাল বলেন, আমাদের তাহা ভাল; তাঁহাদের যাহা মন্দ, আমাদেরও তাহা মন্দ। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের পোষাক পরেন, আমরাও তাঁহাদের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাঁহারা ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কন ও চিঠিপত্র লেখেন, আমরাও যতদূর সাধ্য, ঐ সব বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করিতেছি। বাহুল্যভয়ে বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না, পাঠক পাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন। এখন ইংরাজ সমাজে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অর্থনীতির নিয়মে পরিচালিত, তাহাতে হৃদয়ের গন্ধও নাই। অন্যান্য নানা প্রকার চুক্তির মধ্যে উহাও একটা চুক্তিমাত্র। বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিলে

প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার উপর ভারতপ্রবাসী ইংরাজের দেশীয় ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। সকল সাহেবই যে চাকরের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, এমন বলি না; কিন্তু যাঁহারা কুব্যবহার করেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিই কখন কখন সংবাদপত্র দ্বারা জাহির হয়। এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, যে সব ইংরাজ দেশীয় ভৃত্যের প্রতি সুব্যবহার করেন, তাহা প্রায়ই অভাবপক্ষে ভাল, প্রকৃত পক্ষে ভাল নয়। তাঁহাদের কোমল ব্যবহার প্রায় হৃদয়-রস-বিহীন। তাঁদের চাকরেরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জীব, এ কথা তাঁরা কখনও ভুলেন না। তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের চাকরদিগকে এক জীব-শ্রেণীভুক্ত করা তাঁহাদের বিজ্ঞানানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। যাহাহউক এ সব কথা এখন যাউক। আসল কথা হইতেছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও আজ কাল তাঁহাদের ভৃত্যবর্গকে অনেকটা ইউরোপীয় নেত্রে দেখিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদিগকে ইংরাজের ন্যায় তাড়না করেন এবং সময় সময় প্রহারও করেন। তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের ভৃত্যের প্রতি সস্নেহ ভাব আর তাঁহাদের নাই। তাঁহারা আর তাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হন না। তাঁহারা মাহিনা দেন এবং মাহিনার উপযুক্ত কাজ পাইলেন কি না, এই মাত্র দেখেন। অনেকের হৃদয় হইতে ইহার বেশী দেখিবার ক্ষমতাও বোধ হয় তিরোহিত হইয়াছে। অনেকে চাকরকে মানুষের মধ্যে ধরেন না। প্রভু ভৃত্যের পুরাতন সম্বন্ধ যে ইঁহাদের মধ্যে ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে পরস্পরের সম্বন্ধ চুক্তিমাত্রে দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)।

ডুমরাওন ভ্রমণ।

আরায় কার্য্যোপলক্ষে অবস্থানকালে একদিন ডুমরাওনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই নগরটী কলিকাতা হইতে চারিশত এক মাইল দূরে। এখানকার মহারাজাগণ আপনাদিগকে স্বনামখ্যাত বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। আরার সিপাই-বিদ্রোহের সময় ডুমরাওনের মহারাজ ইংরাজদিগকে অনেক সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

ডুমরাওনের নামের উৎপত্তি বিষয়ে একটী মনোহর গল্প আছে। ডুমুরেজিন-

নাম্নী একটী অসামান্যসৌন্দর্য্যসম্পন্না ব্রাহ্মণ-বালিকা বিবাহের পর স্বামিসহ শ্বশুরালয়ে আগমন করিতেছিলেন। এক মুসলমান রাজপুত্র তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া হরণমানসে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত পথরোধ করে এবং ডুমরেজিনকে পাইলে অনর্থক রক্ত-পাত করিবে না, ইহাও জ্ঞাপন করে। মুসলমানের এই ঘৃণিত প্রস্তাবে কুপিতা হইয়া তেজস্বিনী বালিকা স্বয়ং অনুচর-বর্গ সহিত রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হন। সতী রমণীর আশ্চর্য্য পরাক্রমে যবনগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে।

কুসুম ফুটিয়া উঠে
মরুভূ-হৃদয় হতে,
মুঞ্জরয়ে শুষ্ক তরু
সতীর চরণ-পাতে।

সতী রমণীর প্রভাবে অসাধ্য সাধিত হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়।

কিন্তু এই সাফল্যের আনন্দ ব্যসনে পরিণত হইল। এই অসমান সংঘর্ষণ-ফলে ডুমরাজিনের স্বামী হত হন। সতী রমণী মৃত পতি-পদ বক্ষে ধারণ করিয়া অম্লানবদনে চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন। ইহাই সতীত্বের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যে দেশে সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মত্যাগ ও সতীত্বের জ্বলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সে দেশে এরূপ চিত্র বিরল নহে। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থানীয় মহারাজা ঐ সতীদাহস্থানে একটা "মঠ" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই ডুমরেজিনের নামানুসারে স্থানটীর নাম ডুমরাওন হইয়াছে।

সুচারু কানন-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদটী অতীব সুন্দর। বর্ত্তমান মহারাণী বেণী-প্রসাদ কুমারী অতিথিবাসের নিমিত্ত একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মহারাণী বড় কার্য্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী, রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য তিনি সাহেব কার্য্যাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে দেশীয় কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যে তাঁহার স্বাধীন কার্য্যকারিতা, দানশীলতা ও অপরাপর সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে অনেক প্রকার প্রাচীন পুস্তক ও দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমেত কয়েকটী যাদুঘর (Museum) এবং গবর্ণমেণ্টের একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে।

এখানকার "বড় বাগ" নামক উদ্যানটী আরার উদ্যান অপেক্ষা সুন্দর। "ফুলের" মধ্যস্থলে একটী মান-মন্দির আছে। উহার উপরিতলের গৃহগুলির প্রাচীর নানা প্রকার পশুপক্ষীর চিত্রে পরিপূর্ণ। যে দেশের কবিগণ বিপুল কল্পনা ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক "শকুন্তলা" প্রভৃতির ন্যায় মনোহর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে দেশ চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যায় কি জন্য সমধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা বিস্ময়াবহ।

ডুমরাওন ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে

পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া থাকে। মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখে ভারতের তৎকালীন অবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয়। যে অসভ্য বর্ব্বরদিগের হস্তে গ্রীস্, রোম, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য রাজ্যগুলি বিলয় প্রাপ্ত হওয়াতে জগতের উন্নতিস্রোত বহুদিন তরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যাহাদের প্রবল আক্রমণে ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ও সভ্যতা ধ্বংসমুখীন হইয়াছিল, বিক্রমাদিত্য সেই বর্ব্বর বন্য জাতিকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতে সুবর্ণযুগ পুনরানয়ন করেন। ভারতের সেই সুবর্ণযুগের প্রতিভাশালী মহাকবি নবরত্ন-শ্রেষ্ঠ ভারতীর বরপুত্র কালিদাস, যাঁহার অমৃতময়ী বীণার গানে ভারত বিমুগ্ধ, যাঁহার কমনীয় লালিত্যপূর্ণ কাব্যাবলী জগতের এত আদরের দ্রব্য, তাঁহার লীলা-স্থান এখন শ্মশানে পরিণত! বিশ্বধ্বংসী কালের কি অপ্রতিহত গতি!

কালের করাল কর
মুছে ফেলে অবহেলে,
অক্ষয় কীর্ত্তির চিত্র
অতুলিত ধরাতলে।
বসায় 'পাদপ আনি
রম্য হর্ম্ম্যশির' পরে,
সুচারু নগরী-হৃদে
শ্মশান সৃজন করে।

ভুবনমোহন মিত্র।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুটিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণিচ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ১।
ক্বচিদ্‌ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা
ক্বচিল্লীলাসং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো,
হরীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদং ॥২।

এই বৃন্দাবনে গোঁসাইয়ের যাত্রী একদিন থাকে। বৃন্দাবনের মহিমা বর্ণন করা আমার মত ক্ষুদ্র-জীবের সাধ্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ ভক্ত শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদোক্ত উপরিস্থিত শ্লোকদ্বয়ে বিজ্ঞ ভক্তগণ অনুভব করিয়া দেখিবেন শ্রীবৃন্দাবন কিরূপ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের আধার। গোস্বামিপাদগণ স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন "চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন, চর্ম্মচক্ষে ভাসে যেন প্রপঞ্চের সম।" আমাদের মায়াময় চক্ষু, আমরা বৃন্দাবনকে ইতরেতর মায়িক বস্তুর ন্যায় দেখিয়া থাকি। আর প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমনেত্রে এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-পূর্ণ অতুলন বৃন্দাবনধামের স্বরূপ সহিত

বেদ বিধির অগোচর রত্নবেদীর উপর নিজ নিজ প্রাণারামকারী লীলার সময় প্রাণনাথের রাসবিলাসাদি বিবিধ কৌতুক কেলি দর্শন এবং মানসে বিবিধ সেবা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। শুনা যায় চিন্তামণি হস্তে লইয়া যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। তদ্রূপ ভক্তগণ এই বৃন্দবনধাম রূপ চিন্তামণির স্পর্শে আপনাপন অভীষ্ট সেই সচ্চিদানন্দময় হরিকে লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ সহ নিত্যানন্দে মগ্ন হইতেছেন।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত কত ভক্ত সাধু বনদর্শন করিয়া কেহ বা হাস্য, কেহ বা নৃত্য, কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা স্তম্ভন ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ, আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে।" আমাদের মত অল্পবুদ্ধির এই প্রেমা বুঝিবার সাধ্য কোথায়? যাহা হউক এবিষয়ে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বৃন্দাবনের মহিমা, বৃন্দাবনচন্দ্রের মহিমা, ভক্তগণের মহিমা এবং ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য গোস্বামিপাদগণ লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে মহানুভব ব্যক্তিগণ সমুদয় তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়, লবামাত্র সাধুসঙ্গ কৃষ্ণভক্তি হয়।" আমরা গোস্বামিকৃত গ্রন্থসমূহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ বলিয়া মনে করি। এস্থলে আর একটী কথা লিখিতে হইল—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই ভগবান আপন মুখে ব্রহ্মাকে কহিতেছেন যে, "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।" এখন শ্রীবৃন্দাবনবিষয়ক বিজ্ঞানসমন্বিত পরম গুহ্য এবং রহস্যপূর্ণ যে জ্ঞান, তাহা সাধারণের গোচর করা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির একেবারে অসম্ভব। তজ্জন্য এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনধামের বহিরঙ্গে যে যে স্থান দর্শনীয়, পঞ্চক্রোশী পরিক্রমণ অনুসারে সে সমস্ত কোনও গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

প্রথমে শ্রীযোগপীঠ করিব দর্শন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধার মদনমোহন॥
তবে শ্রীগোপীনাথ জগমনোহারী।
বামে শ্রীজাহ্নবী জীউ দক্ষিণে কিশোরী॥
তার পর সর্ব্বস্থান করিব দর্শন।
ক্রমে ক্রমে দেখিব ও সব বৃন্দাবন॥
সরস্বতীকুণ্ড আর দাবানলকুণ্ড।
বলভদ্রকুণ্ড যার প্রতাপ প্রচণ্ড॥
আদিবরাহ আর মদনটের জবাটবী।
সৌভরি আশ্রয় হয় আর মঞ্জুটবী॥
অম্বিকা কানন বড় দেখিতে সুন্দরে।
অক্ষয় কদম্ব হয় কালীদহতীরে॥
ফলপুষ্প তীর্থস্থানে সমর্পিত করি।
দ্বাদশ আদিত্য ঘাটে বন্দনা আচরি॥
পরেতে গোপালঘাট সূর্য্যঘাট আর।
শ্রীযুগল ঘাট বড় দেখিতে সুন্দর॥
মণিতে রচিত ঘাট দেখিতে বিস্তর।

বেহারি ঘাটের হয় মহিমা বহুতর॥
দ্বাপরের তরু শ্রী আমলীতলা নাম।
আপনে শ্রীমহাপ্রভু করিলা বিশ্রাম॥
শ্রীসিঙ্গার বট সে যে অতি রম্য স্থান।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যাঁহা বিরাজমান॥
তবে শ্রীগোবিন্দঘাট পরে চারি ঘাট।
শ্রীভ্রমরঘাট বহু কৃষ্ণ কৈল নাট॥
পরেতে কিশোরীঘাট করি দরশন।
তবে যাব কেশীঘাটে হর্ষযুক্ত মন॥
মণিকর্ণিকার ঘাট অতি গূঢ়তর।
বাঞ্ছাপূর্ণকারী সর্ব্বতীর্থের ঈশ্বর॥
শ্রীরাধারমণ প্রভু রূপ প্রেমময়।
আপনে প্রকাশ হইল ভক্তের ইচ্ছায়॥
শ্রীনিধুবন তার মহিমা অধিকা।
রাজধানী স্থানে রাজা হন শ্রীরাধিকা॥
শ্রীআঁধারিয়া বট করি দরশন।
শ্রীবংশীবটে গিয়া করিব প্রার্থন॥
শ্রীগোপেশ্বর জগতের হিতকারী।
বৃন্দাবনে বাস যেহ দেন কৃপা করি॥
দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র করিলেন লীলা।
কৃষ্ণদাসে কৃপা করি প্রকট হইলা॥
অপূর্ব্ব মন্দিরশোভা সুশ্বেত প্রস্তরে।
এমন মন্দির নাহি ব্রহ্মাণ্ডভিতরে॥
মন্দিরের নাট্যশালা জগমনোহারী।
একমুখে সেই শোভা বলিতে না পারি॥
কিশোর বয়সে প্রকট রত্নবেদিপরি।
দক্ষিণে ললিতা শোভে বামে শ্রীকিশোরী॥
শ্রীপুলিন গোপেশ্বর শ্রীব্রহ্মকুণ্ড বেড়া।
মধ্যে শ্রীমন্দির যেন সুমেরুর চূড়া॥
প্রীত সেবা পরিপাটী সদাই আনন্দ।
প্রেম সেবায় বশ হইয়া প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র॥
শ্রীব্রহ্মকুণ্ড করেন সর্ব্বজীব হিত।
দর্শন স্পর্শন স্নানে জগত পবিত॥
ব্রহ্মকুণ্ডবাসী হন যত সাধুজন।
পরম বৈরাগ্য সব নিত্যসিদ্ধ হন॥
শ্রীগোপীনাথের বাগে হন যতেক বৈষ্ণব।
বৈরাগ্যতা পার হন নিত্যসিদ্ধ সব॥
শ্রীমদনমোহনের বৈষ্ণব আছে যত।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী সব পরম পণ্ডিত॥
পুলিন গভর বন রাধাবাগ নাম।
যাহাতে বিরাজ করেন শ্রীরাধাশ্যাম॥
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড আর কেয়ারিকা কুণ্ড।
তথায় থাকেন বৈষ্ণব প্রতাপ প্রচণ্ড॥
নির্ম্মৎসর নিরপেক্ষ বৈরাগ্যের সীমা।
অন্তর্মনা প্রেমসেবা অতুল মহিমা॥
শ্রীগিরিধারী আর শ্রীগোপাল দেব।
শ্রীচিকনিয়া শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব॥
নিভৃত নিকুঞ্জবন কৃষ্ণের বিলাস।
নিশীথসময়ে সেই স্থানে নিত্য রাস॥
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সদা সীতার সহিতে।
বিরাজ করেন সদা জীব উদ্ধারিতে॥
পূর্ণমাসী ঠাকুরাণী হন সেই খানে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সহকারী রাত্রি দিনে॥
শ্রীরাধা দামোদর শ্রীশ্যামসুন্দর।
গোকুলানন্দ রাধাবিনোদ ব্রজ মনোহর॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী বঙ্কবিহারী রাধাশ্যাম।
বৃন্দাবনচন্দ্র হরি দেব সুখধাম॥
বলরামচন্দ্র শ্রীমুরলী মনোহর।
শ্রীরাধামোহন নন্দকিশোর নটবর॥
কেশব রাধামাধব জানকীরমণ।
সজল চিকণ রাধাবল্লভমোহন॥
গোবিন্দ গোপাল আর নিত্য গোপাল।

চতুর শিরোমণি আর গৌর গোপাল ॥
পুলিনবিহারী আর অনন্ত বিহারী।
ললিতমাধব নৃসিংহদেব মনোহারী ॥
কালীয়দমন আর নর্ত্তন গোবিন্দ।
রাধা ব্রজানন্দ সিঙ্গারবিহারী গোবিন্দ ॥
বৃন্দাবনে রাসলীলা সদাই আনন্দ।
চৌদিকে যুগল মাঝে শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥
শ্রীযমুনা পাটরাণী আছেন বেষ্টিত।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সর্ব্বদা পিরীত ॥
বৃন্দাবনে কত ভক্ত আছেন নির্জ্জনে।
রাধাকৃষ্ণের লীলাতে থাকেন রাত্রদিনে ॥

ইহা ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে ছোট বড় আরও অনেক বিগ্রহ দর্শন আছে এবং জগৎ-শেঠের ঠাকুরবাড়ী, রংজীর বাগিচা, গরুড়স্তম্ভ, যাহাকে লোকে সোণার তাল-গাছ বলে, দর্শনীয় আছে। জয়পুরের রাজার গুরু ব্রহ্মচারীর ঠাকুরবাড়ীও দর্শন-যোগ্য, আর পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার মধ্যে ছোট বাউড়ি ও বড় বাউড়ি নামে সাধু শান্তের বাসযোগ্য ভূগর্ভ-প্রোথিত কুণ্ডা-কৃতি দুইটী আশ্রম বড়ই আনন্দজনক। বৃন্দাবনে ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানলকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী কুণ্ড আছে। বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনের পূর্ব্বদিকে যমুনা পার হইয়া মানসরোবর নামক একটী মনোহর সুরম্য নির্জ্জন স্থান দর্শন করিয়া পাণিঘাটে যাত্রা স্থাপিত হয়। মানসরোবরের ইতিহাস ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চিত্তপ্রসাদ।

বাল্মীকির তপোবন অতিশয় সুশোভন,
পবিত্রতা প্রফুল্লতাময় ;
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি নীচতার লেশ,
সর্ব্বজীবে আনন্দ উদয়।১
কুরঙ্গ শার্দ্দূল সনে ক্রীড়া করে এক বনে,
মৃগপতি সনে যূথপতি ;
ভুজঙ্গ বিপুল-কায় হিংসা নাহি করে কায়,
শিখিসনে তাহার বসতি।২
নিত্য শুনি ঋষিমুখে বৃক্ষশাখে বসি সুখে
পক্ষিগণ করে বেদগান ;
সুরধুনী পুণ্যতোয়া পুণ্যাশ্রম প্রক্ষালিয়া
মন্দগতি সিন্ধু পানে যান।৩

মহর্ষির তপোবন চির-সুখ-প্রস্রবণ
রোগ শোক কেহ নাহি জানে ;
সবে মাত্র একজন সদা নিরানন্দ-মন
চিরানন্দময় এই স্থানে।৪
জনক-তনয়া সতী দুঃখেতে কাতরা অতি,
মূর্ত্তিমতী বিষাদ-রূপিণী,
সুখ-রবি অস্তমিত, চিরতরে নিমীলিত
রঘু-কুল-সর-সরোজিনী।৫
একদা সায়াহ্ন বেলা তরুলতা সাথে খেলা
করিতেছে সন্ধ্যার সমীর ;
কুমুদ-রঞ্জন আসি গগনে উদিল হাসি,
অস্তাচলে চলিল মিহির।৬
বিজন-কুটীরে বসি যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী,

কে ও বামা বিষাদে মগনা ?
সজল করুণ আঁখি, করেতে কপোল রাখি,
শীর্ণকায়া বল্কল-বসনা।৭
পূর্ব্ব লাবণ্যের ভাতি হইয়াছে ম্লানজ্যোতি,
বিদ্যমান চিহ্নমাত্র তার ;
সরলতা কোমলতা মুখচন্দ্রে বিরাজিতা,
সতীত্বের সুচারু আধার।৮
কহে বামা ধীরে ধীরে "এতদিনে বৈদেহীরে
ভুলিলে কি বৈদেহী-বিলাসী ?
রঘুবংশ-চূড়ামণি তুমি করুণার খনি,
চিরদিন জানিত এ দাসী।৯
চিরদিন ছিল জ্ঞান তুমি সীতাগতপ্রাণ,
অন্যে তুমি কভু রত নহ ;
কিবা দিবা কি যামিনী ইহা ভাবি অভাগিনী
সহিয়াছে সন্তাপ দুঃসহ।১০
তোমার সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রজারঞ্জন,
তাহে নাহি দেখি কোন দোষ,
অকাতরে এই প্রাণ দিতে পারি বলিদান
সাধিবারে তোমার সন্তোষ।১১
যদ্যপিও অভাগিনী হইয়াছে কাঙ্গালিনী,
বিনাদোষে চির-নির্ব্বাসিতা,
কিন্তু তব স্নেহরাশি অনশ্বর অবিনাশী
চিরদিন জানিত যে সীতা।১২
ভাবিতাম অহরহ 'দারান্তর-পরিগ্রহ'
কভু নাহি করিবেন রাম,
প্রজারঞ্জনের তরে যদিও ত্যজিলা মোরে,
কিন্তু তিনি মোরে নন বাম।১৩
তাঁর তরে মম প্রাণ শোকানলে দহ্যমান
হয় যথা দিবস রজনী,
মম হেতু অহর্নিশ বিষম-বিষাদ-বিষ
তাঁর (ও) হৃদি দহিছে এমনি।'১৪
কিন্তু আজি ক্রূর বিধি ভাঙি চুরি দিল হৃদি,
শিরে আজি পড়িল অশনি,
কহিলেন তপোধন অশ্বমেধ আরম্ভন
করিয়াছ তুমি রঘুমণি !১৫
অশ্বমেধ অনুষ্ঠান কোন মতে সমাধান
জায়া বিনা কভু নাহি হয়,
করিয়াছ রঘুবর পরিগ্রহ দারান্তর,
ইথে আর নাহিক সংশয়।১৬
দেবরের মুখে শুনি বিনাদোষে রঘুমণি
তেয়াগিলে তুমি জানকীরে,
সেই ক্ষণে এজীবন করিতাম বিসর্জ্জন
প্রবেশিয়া ভাগীরথী-নীরে।১৭
কিন্তু তব পুত্রদ্বয় সেকালে জঠরে রয়,
এই হেতু রাখিনু জীবন ;
দয়া করি তপোধন করি হেথা আনয়ন
কন্যাভাবে করিলা পালন।১৮
থাকি গৃহে কিম্বা বনে, কি শয়নে কি স্বপনে,
তুমি মোর আরাধ্য দেবতা,
অনুকূল কিম্বা বাম যাই হও প্রাণারাম,
ইথে কভু নহিবে অন্যথা।১৯
কেবা হেন ভাগ্যবতী পতিরূপে যে যুবতী
পাইয়াছে তোমার চরণ ?"
এতেক বলিয়া সতী বিষাদে কাতরা অতি,
অশ্রুবারি করেন বর্ষণ।২০
হেনকালে শিশুদ্বয় নিকটে আসিয়া কয়
"শুন মাগো ! অপূর্ব্ব ভারতী—
অশ্বমেধ যজ্ঞতরে নিমন্ত্রিতে মুনিবরে
দূত পাঠাইলা রঘুপতি।২১
আইল সন্দেশবহ নিমন্ত্রণ পত্রসহ,
মুনি তায় কৈলা সম্ভাষণ।

মোরা কৌতূহলবশে গেলাম তাঁহার পাশে
শুনিতে সকল বিবরণ।২২
পূর্ব্বে মহর্ষির ঠাঁই পড়িলাম দুই ভাই
শ্রীরামের অপূর্ব্ব আখ্যান,
অলৌকিক গুণগ্রাম পড়ি তাঁরে ভাবিলাম
অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রধান।২৩
আজি যাহা শুনিলাম সুনিশ্চয় বুঝিলাম
গুণধাম কৌশল্যা-কুমার,
পালিতে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম সাধিতে কর্ত্তব্যকর্ম্ম
ধরাধামে দেব অবতার।২৪
অলৌকিক কর্ম্ম শুনি বিস্ময়-রসে জননি!
অভিভূত হইল হৃদয়,
কি অদ্ভুত পিতৃভক্তি, কি অটল ধৈর্য্যশক্তি,
কি গভীর দাম্পত্য-প্রণয়!২৫
রামায়ণে পড়িতাম কিশোর বয়সে রাম
পিতৃসত্য করিতে পালন,
নির্ভীক অন্তরে বীর শিরে জটা অঙ্গে চীর,
প্রবেশিলা গহন কানন।২৬
সংহতি চলিলা তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ আর
ছায়া যথা দেহানুগামিনী,
রূপে গুণে অনুপমা যেন পদ্মালয়া রমা
প্রণয়িনী জনক-নন্দিনী।২৭
নিবিড় অরণ্যে গিয়া পর্ণশালা বিরচিয়া
নিবাস করিলা তিনজন,
একদা দৈবের গতি দুরাচার লঙ্কাপতি
জানকীরে করিলা হরণ।২৮
ক্ষোভে রোষে রঘুপতি অতিশয় খিন্নমতি
কপিপতি সনে সখ্য করি,
সেতু বাঁধি সিন্ধুনীরে বিনাশিয়া দশশিরে
উদ্ধারিলা জানকী সুন্দরী।২৯
প্রফুল্ল অন্তরে সীতা পতিপাশে উপনীতা,
রাম তাঁয় না কৈলা সম্ভাষ,
ভীতা চমৎকৃতা সতী! ত্যজিলা তাঁহারে পতি
ছল ধরি "পরগৃহে বাস।" ৩০
ক্ষোভে দুঃখে পতিপ্রাণা হয়ে অতি ম্রিয়মাণা
আজ্ঞা দিলা সাজাইতে চিতা,
ভীতি-পরিশূন্য মনে প্রজ্বলিত হুতাশনে
প্রবেশিলা জনক-দুহিতা।৩১
ধৈর্য্যশীল দাশরথি, অন্তরে আকুল অতি,
বাহ্য-দৃশ্যে অটল অচল,
ব্যোমস্পর্শে হুতাশন চমকিত ত্রিভুবন
নাগ নর সুরাসুর দল।৩২
ক্রমে অগ্নি সঙ্কুচিত, ক্রমে চিতা নির্ব্বাপিত,
বিভাবসু হয়ে মূর্ত্তিমান,
সঙ্গে লয়ে শ্রীসীতারে (পিতা যথা তনয়ারে)
রামপাশে হন আগুয়ান।৩৩
জানকীর করে ধরি রামে সমর্পণ করি
কহিলেন 'শুন রঘুমণি!
কি কব অধিক আর চরণ-পরশে যাঁর
সুপবিত্রা হইল ধরণী।৩৪
সে সাধ্বীরে অকারণ কেন কর বিসর্জ্জন,
নিজ দারা করহ গ্রহণ।
সুখে রাজ্যে 'কর গতি', এত বলি সাধ্বীসতী
নিজ স্থানে করিলা গমন।৩৫
আনন্দিত সর্ব্বজন সহসীতা শ্রীলক্ষ্মণ
রণজয়ী শ্রীরঘুনন্দন,
ফিরিয়া আপন দেশে বসি নরপতি-বেশে
উজলিলা রাজ-সিংহাসন।৩৬
শুনিনু দূতের মুখে বিসর্জ্জিয়া নিজ সুখে
ধর্ম্ম-নিষ্ঠ কৌশল্যা-নন্দন,

প্রজারঞ্জনের তরে প্রাণাধিকা মহিষীরে
চিরতরে করিলা বর্জ্জন।৩৭
শুনিয়া দূতের বাণী অন্তরে বিস্ময় মানি,
জিজ্ঞাসিনু মোরা দুই জন—
'করিলা কি রঘুবর পরিগ্রহ দারান্তর
যজ্ঞকার্য্য কারতে সাধন?' ৩৮
কহিলা সন্দেশ-বহ 'দারান্তর পরিগ্রহ
রামচন্দ্র না করিলা আর,
অযোধ্যার অধিপতি সদা একনিষ্ঠমতি,
সীতাগত জীবন তাঁহার।৩৯
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ আর যত গুরুজন
দারান্তর করিতে গ্রহণ
কহিলেন বারম্বার, কিন্তু হেন সাধ্য কার
টলাইবে রাঘবের মন? ৪০
বিচারিয়া মতিমান্ করাইলা নিরমাণ
হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি,
বামে লয়ে মনোরমা জানকীর সে প্রতিমা
যজ্ঞ করিবেন রঘুপতি।' ৪১
ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপ যত্নশীল সেইরূপ
রাজধর্ম্ম করিতে পালন,
দেখাইলা মহামতি দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রতি
অনুরাগ প্রগাঢ় তেমন। ৪২
কর মাতঃ অনুমতি মুনিসহ করি গতি
দর্শন করিতে রঘুরাজে,
বড় মনে আছে সাধ ঘুচাইব বিসম্বাদ
চক্ষু কর্ণ উভয়ের মাঝে।৪৩
কহিলেন তপোধন 'অবিলম্বে বৎসগণ!
জননী নিকটে কর গতি,
অশ্বমেধ দরশনে যাইতে আমার সনে
জননীর লও অনুমতি।' ৪৪
"হিরণ্ময়ী-প্রতিকৃতি নিরমিতা" শুনি সতী
পুলকেতে পূর্ণিত হৃদয়,
সন্তাপ হইল খর্ব্ব অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-গর্ব্ব
হৃদয়েতে হইল উদয়।৪৫
পরিহার-দুঃখভার না রহিল চিতে আর,
সূর্য্যোদয়ে যথা তমোরাশি,
বুঝিলেন—সীতাপতি সদা সীতা-গত-মতি,
স্নেহ তাঁর নিত্য অবিনাশী।৪৬
সযতনে শিশুদ্বয়ে নিজ অঙ্কে তুলে লয়ে
স্নেহে করি মস্তক চুম্বন,
অনুমতি দিলা সীতা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা
যজ্ঞস্থলে করিতে গমন।৪৭
লভি মাতৃ-অনুমতি হরষিত-মতি অতি
নমি তাঁর যুগল চরণে,
শীঘ্রগতি দুই ভাই চলে মহর্ষির ঠাঁই,
অশ্বমেধ যজ্ঞ-দরশনে।৪৮

ই।

ভারতীয় পুণ্য নদী।

(৪৮০ সংখ্যা—১১৭ পৃষ্ঠার পর।)

ভৈরোঘাটীতে ভাগীরথী জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত পুষ্টাবয়বে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীকণ্ঠের উচ্চতা

সমুদ্রতল হইতে ২০,২৯৬ পাদ। ইহার শিখরদেশ সাহারণপুর হইতে দৃষ্ট হয়। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মন্দিরের ন্যায় মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র। সাহারণপুর হইতে সরল রেখায় ৫৩ ক্রোশ দূর। যুক্তধারা এইরূপে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে নিম্ন দেশে প্রবাহিত হইতেছে। কিছু দূরেই বাদেরি (Batheri) গ্রাম, ভাগীরথীর দক্ষিণ উপকূলে অবস্থাপিত। স্রোত হইতে ইহার উচ্চতা ৩০০ পাদ। অদূরে পার্ব্বতীয় প্রবাহ —রিতল নদী ভাগীরথীতে নিপতিত হইতেছে। রিতল গ্রামও অধিক দূরবর্ত্তী নহে। গ্রামটী ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দর, একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বসানুদেশে প্রতিষ্ঠিত। পুতধারা নিম্নদেশ বিধৌত করিয়া কলকলরবে প্রবাহিত হইতেছে। ভৈরোঘাটী হইতে সার্দ্ধ ছয় ক্রোশ দূরে প্রাচীন সুখী গ্রাম ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলে সমুচ্চ পর্ব্বতের ঢালু দেশে স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শিনী নীহারমণ্ডিতা পর্ব্বতমালা। এখানকার দৃশ্য অতি চমৎকার। সহস্রপাদ নিম্নে কন্দরনিবদ্ধা স্রোতস্বতী কল্লোলনাদে ফেন-বুদ্‌বুদ্ উদ্গিরণ করিতে করিতে হিমালয় ভেদ করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা ন্যূনাধিক ১২০০০ পাদ। গ্রামটী ৮৮৬৯ পাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভাগীরথী ৭৬০৮ পাদ উচ্চে প্রবাহিত। সুখী হইতে বক্রগতি প্রবাহ দক্ষিণপশ্চিমবাহী হইয়া অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে উতল গ্রামে অবতরণ করিতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণবাহী হইয়া সার্দ্ধসপ্ত ক্রোশ দূরে সুরত গ্রামে প্রবাহিত হইতেছে। সুরত হইতে দক্ষিণপূর্ব্ববাহিনী হইয়া সার্দ্ধ চারি ক্রোশ দূরে ভাগীরথী জলকর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। জলকর ভাগীরথীর অন্যতম প্রবল উপনদী। হৈমবতের তুহিন-গলিতধারা দক্ষিণাভিমুখে দশ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর অঙ্কমধ্যে মিলিত হইয়াছে। জলকর সঙ্গমের চারিক্রোশ নিম্নেই পবিত্র বিলং সঙ্গম।

বিলং ভাগীরথীর প্রধান উপনদী। ইহা দৈর্ঘ্যে জাহ্নবী অপেক্ষাও বৃহৎ এবং পবিত্রতাতেও তাহার ন্যূন নহে। ইহার উৎপত্তি-স্থান চিরনীহারালয় হৈমবতের গভীর কন্দর। মূল পর্ব্বত হইতে বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহা তীরী নগরের সন্নিহিত ভাগীরথীর বাম অঙ্কে নিপতিত হইতেছে। বিলং সঙ্গম. ২২৭৮ পাদ উচ্চ। সঙ্গমস্থলের আড়াই ক্রোশ ঊর্দ্ধে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বিলংয়ের পরিসর ৬০।৭০ পাদ। বিলং সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। মালারা জালদ্বারা মৎস্য ধৃত করিয়া সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকে। জাহ্নবী রিতল, জলকর ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় প্রবাহ দ্বারা পরিপুষ্ট। ভাগীরথী বিলং সংযোগে সমধিক পরিপুষ্ট ও প্রবল হইয়া মহাবেগে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতেছে।

বিলং সঙ্গমের কিঞ্চিৎ নিম্নেই তীরী নগর। তীরী একটী সামান্য নগর বা

গ্রাম। ইহা ভাগীরথীর বামকূলে প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রের সমতল হইতে ২৩২৮ পাদ উচ্চ। নিম্নস্থ ভাগীরথীর উচ্চতা ২২৭৮ পাদ। তীরীতে গাড়োবাল রাজার প্রাসাদ ও তৎপারিষদদিগের কয়েকটী গৃহ আছে। অলকানন্দার উপর শ্রীনগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাজা তীরী নগরে থাকিতেই ভালবাসেন। প্রাসাদটী সামান্য অট্টালিকা মাত্র, কিন্তু অতি সুন্দর স্থানে নির্ম্মিত। তীরীর কিঞ্চিৎ নিম্নেই কৌড়িগুলা গ্রাম। তথায় ভাগীরথীর উপর এক দৃঢ় সেতু নির্ম্মিত আছে। এখানে ভাগীরথীর পরিসর অধিক না হইলেও বর্ষাকালে ভীষণ আকার দৃষ্ট হয়। সেতুর দৈর্ঘ্য ১৩৮ পাদ। তীরী আলমোরা হইতে ৬১ ক্রোশ দূর।

পবিত্র বিলং সঙ্গমের এগার ক্রোশ দূরে ভীমা ভাগীরথী দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া পুণ্যতোয়া অলকানন্দার বাম বক্ষে নিপতিত হইতেছে। ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থানই পুণ্যপ্রদ দেব-প্রয়াগ।

উদাসীনের চিন্তা।

চারুশীলা ভবনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ভবনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়া সরকারী কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং সচ্চরিত্রতার জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত। তাঁহার একমাত্র কন্যা চারুশীলা যাহাতে সদ্‌গুণ-বিভূষিতা হইয়া নামের সার্থকতা করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। একদিন তিনি চারুশীলাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া বলিলেন "মা! এখন তোমার বয়স বার বছর, আমি তোমায় একটি কথা বলিব। সে কথাটি এই—"তুমি বিদুষী হও আর নাই হও, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু সর্ব্বদা যে কাজ সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে সাধন করিবে। ইহাতে কেহ প্রতিবাদী হইলে গ্রাহ্য করিবে না; কারণ যাহা সাধু তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য। সাধু কাজের অনুষ্ঠানে ঈশ্বর প্রীত হয়েন, সুতরাং তাঁহাকে প্রীত করিতে যাইয়া যদি মানুষকে দুঃখিত করিতে হয়, তাহ'তে নিবৃত্ত হইবে না; কারণ তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।" পিতৃদেবের এই উপদেশ চারুশীলার হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিল। তদবধি সে যাহা ভাল বুঝিত, সৎ বলিয়া জানিত, প্রাণপণে তাহা করিতে চেষ্টা করিত।

চারুশীলা ষোড়শ বর্ষে উত্তীর্ণা হইল। পিতা তখন একটি সুপণ্ডিত পাত্র দেখিয়া কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। চারুশীলা মনোমত স্বামী পাইয়া আনন্দে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। প্রথম প্রথম উভয়ে বিলক্ষণ শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন, উভয়ের মতের

কোনও সংঘর্ষণ নাই। স্বামী যাহা করিবেন ইচ্ছা করিতেছেন, স্ত্রী অবাধে তাহার অনুসরণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে পত্নী যাহা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিতেছেন, পতি তাহার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। বাহিরের লোক তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া একবাক্যে বলিতেন "আহা! উভয়ের কি একাত্মভাব, যেন দুইটি জলধারা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এদের গৃহ কি শান্তিপূর্ণ স্থান, উভয়ের মধ্যে একটু মতের পার্থক্য নাই, এঁরাই জগতে প্রকৃত সুখী।" ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন সমালোচকগণ বর্ত্তমান দেখিয়া বিচার করেন, তাই অনাগত কাল অনেক সময় তাহাদের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, ভবিষ্যৎ তাহা মিথ্যা বলিয়া দেখাইয়া দেয়। মানব-জীবনে এতাদৃশ ভ্রান্তি অহর্নিশি ঘটিতেছে। চারুশীলা ও তাহার স্বামী সম্বন্ধেও প্রতিবেশিগণ এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। যত দিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় নাই, যত দিন নব প্রেমের নবমাধুরী উভয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যত দিন উভয়ের রুচিবৈচিত্র্য খেলা করিবার সুযোগ পায় নাই, তত দিন উভয়ের বেশ মিলন ছিল, যেন দুইটি আত্মাই এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইল। উভয়ের রুচি, শিক্ষা, আশৈশব-পোষিত সংস্কার তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সুতরাং উভয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও এত গুলি প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিতেছেন না।

সমস্যাটি চারুশীলার স্বামীর একজন বন্ধুর সহিত পরিচিত হওয়া লইয়া। চারুশীলার স্বামী সুপণ্ডিত লোক ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়া অনেক অসৎসঙ্গী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহারা আবার ইংরাজী ধরণের বন্ধু (friend) নামে আখ্যাত। চারুশীলার স্বামী উচ্চ শিক্ষিত যুবক, সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু অনেক সময় বিচার করিতে অক্ষম বলিয়া সীমা অতিক্রম করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহার মতে বাড়ীতে বন্ধু-নামধারী ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত হইলেই তাহার সহিত স্ত্রীর পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে, তাহার চরিত্র সাধু হউক আর নাই হউক; এরূপ পরিচয় না হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতায় অবমাননা করা হয়। চারুশীলার স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণাটা অন্যরূপ। তিনি তাঁহার পিতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে. "It is better to be alone than to be in bad company" অসৎ সঙ্গ করা অপেক্ষা একা থাকা ভাল। হউন না কেন স্বামীর সঙ্গী, কিন্তু তিনি যদি অসচ্চরিত্র হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ করাও বিপজ্জনক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক কখনও অসৎ পুরুষের সঙ্গ করিবেক না। এই ধারণা হইতে তিনি স্বামীকে বলিলেন

"আমি এতাদৃশ পুরুষের নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি না।" স্বামী বলিলেন "স্ত্রী স্বামীর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ও বিশ্বাস করিবেন। স্বামী যদি কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ না করেন, বা কোনও কার্য্যকে মন্দ না ভাবেন, তা হলে স্ত্রীর তাঁহার বাধ্য হইতে কি আপত্তি?" চারুশীলা বলিলেন "সতীত্ব জিনিশটা ঐশ্বরিক, ইহা স্বর্গীয় পদার্থ, স্বামীর মতামতের উপর নির্ভর করে না। স্বামী যদি অবিবেচক হয়েন কিংবা স্ত্রীকে অসৎ পথে নামাইতে কুণ্ঠিত না হন, তাহলেও স্ত্রী কেবল মাত্র ঈশ্বরের দিকে তাকায়ে সতীত্ব রক্ষা করিবেন এবং যে আচরণ সতীত্ব রক্ষার বিরোধী, সে আচরণ প্রাণান্তেও করিবেন না।"

স্বামী—এইটা তোমার ভাবুকতা (sentimentalism)। আমি তোমার সর্ব্বস্ব। তোমার সতীত্ব তোমার ধন নহে, উহা আমারই জিনিশ, উহা যদি আমি ডুবাতে চাই, তোমার বলবার কি অধিকার আছে?

চারুশীলা—আমার সতীত্ব কোনও মানুষের দেওয়া সম্পত্তি নহে। আমায় ঈশ্বর বলেছেন "এই লও তোমার সতীত্ব, এ ধন কখনও হারাইও না, মৃত্যুর পর আমার জিনিশ আমার নিকট নিয়ে আসবে, অর্থাৎ পতির প্রতি যেমন ঐকান্তিক প্রেম দেখাবে, তাহা হইতে আমার প্রতিও ঐকান্তিক প্রীতি ও ভক্তি কর্ত্তে শিখবে।" আমি তোমার কথায় এ ধন হারাতে পারি না, এখন তুমি একে ভাবুকতা বলে নিন্দা কল্লে নাচার।

স্বামী—এতাদৃশ উত্তর শুনিয়া উত্ত্যক্ত হইয়া বলিলেন "ভাল, জিজ্ঞেসা করি আমি যা কর্ত্তে বলি, তা কর্ব্বে কি না? সতী নারীর লক্ষণ এই, সতী নারী প্রাণান্তেও পতিকে অসন্তুষ্ট কর্ব্বে না।"

চারুশীলা এই যুক্তি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাহার পিতৃদেব-প্রদত্ত উপদেশটি মনে পড়িল। তখন বলিলেন "পতির উপরে সতীর ঈশ্বর রয়েছেন। যদি পতি এমন কোন কাজ কর্ত্তে বলেন যা ঈশ্বর ভালবাসেন না, তিনি সে কাজ প্রাণান্তেও কর্ব্বেন না।"

স্বামী—আমি এতক্ষণ যুক্তি করে ভাল করি নাই। তোমাদের মত স্ত্রীলোকদের তর্ক করে বুজিয়ে উঠা ভার। তোমাদের নিকট যুক্তির চেয়ে বলই বেশী কার্য্যকর। জান আমি তোমার স্বামী এবং প্রভু, তোমার পিতা আমাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা করে দিয়েছেন, এখন আমার যা খুসী তা তোমার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কর্ত্তে হবে।

যে স্বামী পূর্ব্বে কখনও স্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী ছিলেন না, প্রত্যুত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে চারুশীলার মতেই মত দিয়া কাজ করেছেন, সে স্বামীকে সে দিন ওরূপ প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত দেখিয়া চারুশীলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কোন রূপেই মনকে

প্রবোধ দিতে পারিলেন না। তিনি অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে স্বামী পত্নীর তাদৃশ শোকের ভাব দেখিয়া বিরক্তচিত্তে বহিঃপ্রাঙ্গণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তার পর দুই দিন চলিয়া গেল, স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা নাই। শান্তির গৃহে বিষাদের ছায়া পতিত হইল। দাস-দাসীগণ হঠাৎ তাদৃশ কুজ্ঝটিকার আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। চারুশীলা সুখ দুঃখের ভাগী পিতৃদেবকে সমস্ত কথা লিখিয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পিতা অনেক করিয়া চারুশীলাকে বুঝাইয়া লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয় আর যোড়া লাগিল না। তিনি কিছুতেই তাদৃশ প্রভুত্বপ্রিয় একদেশদর্শী অবিবেকী স্বামীর প্রতি পূর্ব্বানুরাগ অটুট রাখিতে পারিতেছেন না। মনের এরূপ অবস্থা লইয়া একত্র বাস করা বিড়ম্বনা, তাহাতে উভয়ের শান্তি নষ্ট হইবে। সকল কথা ভাঙ্গিয়া লিখিয়া তিনি পুনরায় পিত্রালয় যাইতে অভিলাষিণী হইলেন। পিতা দেখিলেন স্বামী স্ত্রীতে মতবৈষম্য জগতে বিরল ঘটনা নহে। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই কিছু না কিছু ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে বিবাহ-সূত্র শত-করা নিরানব্বই স্থলে ছিন্ন হইবার কথা। আবার ইহাও দেখা যায় কিছুদিন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিলে দাম্পত্য কলহের শান্তি হয়। দুইটী মেঘ ঘর্ষণে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু সেই বজ্রাঘাতের পর আবার উভয়ে মিলিয়া শান্তভাবাপন্ন হয়। চারুশীলার পিতা কন্যাকে সে সকল কথা লিখিয়া ধীর ও সহিষ্ণু হইয়া পতি-গৃহেই বাস করিতে বলিলেন। চারুশীলার স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টান্তে নিজেও ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইলেন। তিনি শান্তভাবে বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন, স্ত্রীর বিবেক ও ধর্ম্মের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন। তিনি সরল ভাবে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা ও প্রেমের ভাব বর্দ্ধিত হইল—গৃহবিবাদের শান্তি হইল। প্রীচ।

মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানী ব্যক্তি ও অসভ্য জাতিগণের বিশ্বাস।

এপিক্‌টিটাস নামক গ্রীক দার্শনিকের মত এই—"আত্মার সম্পর্কীয় শরীরই একমাত্র ধ্বংসশীল পদার্থ এবং এই ধ্বংসশীল শরীর ধারণ আত্মার পক্ষে শব-বহন মাত্র।" প্লেটো বলিয়াছেন, "যদি ঈশ্বর আছেন, স্বীকার করিতে হয়, তবে

মৃত্যুর পর যে পরলোক আছে, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।" রোমান বাগ্মিপ্রবর সিসিরো মৃত্যুর সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসপূর্ণ কথা বলিয়াছেন—"আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস যদি আমার ভ্রান্তিকর হয়, তবে আমি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত এই ভ্রান্তি পোষণ করিব এবং আমি এই অভিলাষ করি যে, যে ভ্রান্তি পোষণ করিয়া আমি আনন্দ প্রাপ্ত হই, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা যেন কেহ আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে না পারে।"

সক্রেটিস তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে এথেনিয়ান জনসাধারণ ও বিচারকগণকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—"এখন অন্য প্রকারে মৃত্যুর স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। এ প্রকারে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব মৃত্যু যে মঙ্গলকর, তাহা বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। সম্পূর্ণ ধ্বংসাবস্থা কিম্বা সম্পূর্ণ চৈতন্যহীনাবস্থা অথবা আত্মার অন্য জগতে প্রস্থান ব্যাপার, ইহার নামই ত মৃত্যু। আচ্ছা, ইহাই যদি অনুমান করা যায় যে, মৃত্যুর অবস্থা একটা সম্পূর্ণ চৈতন্যহীন ও স্বপ্নহীন নিদ্রার অবস্থা, তবে ত ইহাকে মহা লাভকর বিষয় বলিয়া গণনা করা উচিত। কেননা তখন অনন্ত কাল ত একটি স্বপ্নহীন রাত্রি মাত্র হইবে, সে রাত্রির ত আর প্রভাত হইবে না, অনন্ত শান্তি ত তখন আমাদের করায়ত্ত হইবে। আর দেহ-ত্যাগান্তে আত্মার যদি অন্য জগতে প্রস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সমস্ত মৃত আত্মীয়দিগের সহিত যদি সেখানে বাস করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই প্রযুক্ত হে বিচারকবর্গ! মৃত্যুর এই যথার্থ স্বরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হও। আর ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সাধু ব্যক্তির ইহলোকে কিম্বা পরলোকে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে না। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, মৃত্যু আমার পক্ষে একরূপ মঙ্গলকর বিষয়। এই জন্যই আমার দণ্ড-দাতা ও অভিযোক্তাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে না। আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি মৃত্যুর পথে যাইতেছি ও তোমরা জীবনের পথে যাইতেছ। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ উৎকৃষ্টতর, তাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই অবগত আছেন।"

ইহুদীয় ধর্ম্মবেত্তা সলোমনের উক্তি এই—"অজ্ঞানীরাই মৃত ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া মনে করে। কিন্তু মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ অনন্ত অমরত্বের আশার পূর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" গ্রেগ নামক ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"মৃত্যুর পর ঈশ্বর আমাদিগকে এমন এক স্বর্গ প্রদান করিবেন, যথায় নির্ম্মল পবিত্রতা ও চিরস্থায়ী স্নেহ বিরাজ করিতেছে। তথায় এরূপ এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ আমরা পাঠার্থ প্রাপ্ত হইব, যাহার পত্রের পর পত্রের আর অন্ত থাকিবে না; এবং যাহা পাঠ করিবার দক্ষতাও সতত আমাদিগের

অনুগামী হইবে। তথায় মহিমান্বিত কার্য্য করাই আমাদের জীবনেব প্রধান ব্রত হইবে; আর সে মহিমান্বিত কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত গুণেরও আমরা অধিকারী হইব। পরলোক এমনি এক স্থান যথায় এই জীবন ও মৃত্যুর গভীর সমস্যারও পূরণ হইবে।"

মেলি-নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির উক্তি এই—"হে শোকার্ত্ত! শোক করিতে নিবৃত্ত হও। যে মরিয়াছে মনে করিতেছ, তাহার মৃত্যুও হয় নাই, কিম্বা সে নিদ্রিতও নহে। কেবল মাত্র জীবনের স্বপ্ন হইতে সে জাগরিত হইয়াছে। আমরা (জীবিতেরাই) ঝটিকাময় পার্থিব স্বপ্নের মধ্যে বিলীন হই, তদ্ভূতা ছায়াময়ী মূর্ত্তি সকলের সহিত অলাভকর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছি। সে আমাদের এই পার্থিব নিশীথের ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে। ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, কষ্ট ও অশান্তি তাহাকে আর যন্ত্রণা প্রদান করিতে কিম্বা স্পর্শ করিতে পারিবে না। পার্থিব মালিন্যের সংক্রামতা হইতে সে নিরাপদ হইয়াছে।" অন্যত্র বলিয়াছেন—"জীবন বহুবর্ণবিশিষ্ট কাচপাত্রের ন্যায়। যদবধি মৃত্যু ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলে, ততদিন ইহা আপনাতে প্রতিবিম্বিত অনন্তের শ্বেত রশ্মিসমূহকে আপনার বিচিত্র বর্ণসমূহে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়া থাকে।" মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার ইনিয়াড নামক কাব্যে পরলোক-ভূমিকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন:—"হে মানব-দৃষ্টির অগোচর পরদেশ ভূমি! তোমার নীরব রাজ্যের গূঢ় রহস্যাত্মক বিস্ময়কর বিষয়ের বর্ণনা করিতে আমায় শক্তি প্রদান কর।" সেক্সপিয়ার মৃত্যুকে জীবনরূপ অন্ধকারময় মেঘের রাজ্য হইতে আত্মার উত্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুসভ্য জাতিগণের ন্যায় অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও মৃত্যুর পর পরলোক সম্বন্ধে উন্নত বিশ্বাসের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমানগণ তাহাদের পরাজিত গথ, ভেণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে অতি উন্নত মতের প্রাবল্য দর্শন করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন স্পানিয়ার্ডগণ আমেরিকা আবিষ্কার করে, তখন তাহারা আমেরিকার সম্পূর্ণ নগ্নকায় অসভ্যগণের মুখে আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে অকপট বিশ্বাসের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আফ্রিকার অতি অসভ্য বন্যগণকে কেহ মানুষের আত্মা আছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এই উত্তর প্রদান করিয়াছিল—"এই বিশাল জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এ তত্ত্ব যেরূপ অখণ্ড সত্য, মৃত্যুর পর যে পরলোক আছে, তাহাও তেমনি নিঃসন্দেহ বিশ্বসনীয়।"

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

করমেতিবাই।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন, "ভক্তিই মানবের সার সম্পত্তি।" রমণীর হৃদয় মায়ার আধার হইলেও যখন ভক্তির ভাবে উন্মাদিত হয়, তখন তাঁহারা মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারিণী হইতে কুণ্ঠিত হন না। ভগবানের জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখের আশায় জলাঞ্জলি দেন, ভাল খাইব কি ভাল পরিব এবম্বিধ চিন্তায় ব্যাকুল হন না। শ্রীহরিই একমাত্র বস্তু, আর সকল অবস্তু জ্ঞানে তাঁহার আরাধনাকেই তাঁহারা জীবনের ব্রত করেন। ভারতবর্ষে যে সকল মহিলা সাধুজনানুমোদিত জীবন যাপনপূর্ব্বক ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, করমেতিবাই তাঁহাদিগের অন্যতমা।

দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত খজেল গ্রামে পরশুরাম নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রাজ-পুরোহিত ছিলেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠা-পরায়ণ ও বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। করমেতিবাই তাঁহারই কন্যা। বাল্যকালে তিনি স্বসম্প্রদায়সম্মত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পিতার নিকট পাঠ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পিতার ধর্ম্মানুপ্রাণিত মধুর জীবন দর্শনে জীবনের উষাকালেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর জন্মিল।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "কাশীর দিকে যত অগ্রসর হইবে, কলিকাতা তত পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে—পূর্ব্ব দিকে যতই যাবে, পশ্চিম দিক্ ততই দূরবর্ত্তী হ'বে—ভগবানের দিকে যতই এগুবে, সংসারাসক্তি ততই কমিয়া আসিবে।" যৌবনাগমে সাধারণ মানবগণ ভোগলিপ্সু হইয়া থাকে। তাহাদের মন তখন বাহ্য বস্তু ও বাহ্য ব্যাপারেই আসক্ত হইবে। করমেতিবাই বাল্যাবধি ধর্ম্মানুরাগিণী। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহার ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। যৌবনে পদার্পণ করিলে সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি বাহ্যবস্তু লইয়া মত্ত হইলেন না। হরিকথায়, হরিচিন্তায়, হরিগুণগানে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। হরিই তাঁহার মনঃপ্রাণ অধিকার করিলেন। সংসারে ধন ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। পূর্ণানন্দময়ের চরণলাভের জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কন্যার এই ভাব দর্শনে পিতামাতার হৃদয়ে আশঙ্কা জন্মিল। সংসারী করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা করিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব কিন্তু বুঝে না যে, দীনবন্ধু হরি যাঁহার সংসার বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকে আবার সংসারে আবদ্ধ করিবে কে? কিয়ৎকালের পর তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে

লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। সংসারে মজিলে তিনি সে ধন পাইবেন না যাহার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল, এই ভাবিয়া তিনি স্বামিগৃহে যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন। ভগ্নমনোরথ হইয়া ভৃত্যেরা ফিরিয়া গেল।

ঈশা বলিয়াছেন, "যে চায় সেই পায়।" গীতায় আছে, সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া যে শ্রীভগবানের শরণাগত হয়, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। যেখানে প্রাণের ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা, এবং অনুরাগের ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হয়, সেইখানেই ভগবান্ সহজ-লভ্য হন। প্রাণের টান, হৃদয়ের আবেগ এবং অন্তরের প্রেম না থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। পিত্রালয়ে ভগবদারাধনা করিতে করিতে করমেতি-বাই ভগবানের প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুরাগের ঐকান্তিকতা জন্মিলে তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবন-গমনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহাকে কে যেন বলিল—"আর না, এই সময়।" সেই অলক্ষিত মর্ম্মস্পর্শী দৈববাণী তাঁহার প্রাণকে আকুল করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুকোমল শয্যা কণ্টকসম বোধ হইল। শ্রীহরির চরণবন্দনাপূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে বহির্দ্বারের নিকট গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। অনন্যোপায় হইয়া তিনি সকাতরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গৃহের ছাদের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। যেখানে প্রকৃত অনুরাগ, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি-দানও দৃষ্ট হয়। ভগবান্ অনুরাগী ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাহাকে বিপদ আপদ হইতে মুক্ত করেন। প্রহ্লাদ অনলে, সাগরজলে, হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হইলেও, বিষভক্ষণ করিলেও শ্রীহরির কৃপায় সর্ব্ববিপন্মুক্ত হইলেন। ভগবৎ-প্রসাদে অগ্নির দাহিকা শক্তি লুপ্ত হইল; বিষ অমৃতে পরিণত হইল; সাগরজলে তিনি ভাসমান হইলেন; হলাহল নিষ্ফল হইল। করমেতিবাই অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেও শ্রীহরির কৃপায় তাঁহার অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। তিনি দুঃখস্পর্শের অনধিগম্য হইলেন। তখন বৃন্দাবনের পথ অতি দুর্গম ছিল—প্রশস্ত রাজপথ ছিল না—রেলরোড ছিল না। স্থানে স্থানে হিংস্রজন্তুপূর্ণ গভীর অরণ্য বিদ্যমান ছিল। একে অবলা ও কুলবালা, তাহাতে বৃন্দাবনের পথ দেখায় এরূপ লোকও তাঁহার কেহ ছিল না; সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বলও ছিল না। এইরূপ অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বৃন্দাবনাভিমুখিনী হইলেন।

প্রভাত হইলে এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইল যে, করমেতিবাই কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। পরশুরামের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এ কথা যে শুনিল, সে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর পরশুরাম রাজার নিকট গিয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে রাজা অবিলম্বে তাঁহার কন্যার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

এদিকে করমেতিবাই একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত কতিপয় রাজানু-চরকে প্রান্তরের অপর পার্শ্ব দিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি একটী মৃত উষ্ট্রের গলিত শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। তিনি উষ্ট্রগর্ভে তিন দিন যাপন করিলেন। অনন্তর তিনি বহুকষ্টে অনেক দিনের পর বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন। তথায় সাধুসঙ্গে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড-তীরস্থিত বনমধ্যে ভগবানের ধ্যানারা-ধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। যাঁহার গৃহে ভোগ্যবস্তুর অভাব ছিল না, তিনি ভূমি-শয্যা সার করিলেন; স্বভাবজাত ফল মূল তাঁহার খাদ্য হইল। স্বর্গীয় বল যখন মনুষ্যের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তখন তাহার এইরূপ ভাবান্তর হইয়া থাকে। রাজার ছেলে বুদ্ধদেবকে এবং শচীনন্দন নিমাইকে কে বৈরাগী করিল? নরহন্তা মলকে কে সর্ব্বত্যাগী ও ঈশার পদানত করিল? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রূপ-সনাতন ও রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা কিসের জন্য সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইলেন? হা ধর্ম্ম! তোমার কি মোহিনী শক্তি!!!

চতুর্দ্দিকে প্রেরিত রাজানুচরেরা কর-মেতিকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পরশুরাম আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। তথায় তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না। একদিন তিনি একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষশিরে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরস্থিতা ধ্যানমগ্না কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, অশ্রুধারা তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীহরির ধ্যানে তিনি নিমগ্না!! তাঁহার এই ভাব দর্শনে পরশুরাম তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে করমেতিবাই সমীপবর্ত্তী পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গৃহে আনিতে পারিলেন না। তাঁহার কাকুতি মিনতি অরণ্যে রোদনে পরিণত হইল।

পরশুরাম গৃহ-প্রত্যাগত হইলে রাজা তাঁহার নিকট করমেতিবাইর মহাভাব ও বৈরাগ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অবিলম্বে বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক তথায় করমেতি-বাইকে দেখিয়া তিনি ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। দীনতার প্রতি-মূর্ত্তি করমেতিবাইও রাজার প্রতি যথা-যোগ্য ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বাসোপযোগী কোন গৃহ নাই

দেখিয়া রাজা তাঁহার জন্য একটী গৃহ-নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিলে করমেতিবাই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, — "বাসগৃহে আমার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহা নির্ম্মাণ করিতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বিনষ্ট হইতে পারে।" রাজা অনেক অনুরোধ করাতে করমেতি শেষে তাঁহার প্রস্তাবে মত দিলেন। তাঁহার অনুমতি পাইয়া রাজা বৃন্দাবনে তাঁহার জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মানবচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী বিজন বনমধ্যস্থিত সেই নিভৃত কুটীরে তিনি ভগবানের প্রেমে নিমগ্ন হইলেন।

যে প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা—প্রেম ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হয় না। সেই মধুর মধুর মধুর—অতি মধুর, অতি পবিত্র ও অতি সুন্দর প্রেমের প্রভাবে প্রেমিকা করমেতিবাইর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, তাঁহার হৃদয় বিমলানন্দে পরিপ্লুত হইল। প্রেমানুরঞ্জিত দিব্যচক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তিনি দেখিলেন যে, প্রেমাধার হরি বাহ্যজগতে বিরাজমান—তরুতলায়, চন্দ্রতারকায়, ফলফুলে, পাহাড়ে ও নদীতে বিশ্বরূপী নারায়ণ বিদ্যমান। আবার চক্ষু নিমীলন করিয়া তিনি অন্তরের অন্তরে তাঁহারই প্রকাশ অনুভব করিলেন। গীতায় আছে:—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

করমেতিবাই এইরূপ গভীর আধ্যাত্মিক প্রেমযোগে যুক্ত হইয়া অন্তরে বাহিরে হরিদর্শন করিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্ম সার্থক করিলেন। শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৮)

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য আর সংসারে মুহ্যমান হয় না। যিনি চরমকালেও এই অবস্থায় স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানাচার্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-শিক্ষার্থী অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দান প্রসঙ্গে বলিলেন যে, যখন তুমি সমাধিস্থ হইয়া অটল ভাবে পরমেশ্বরে স্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগফল—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া অর্জ্জুন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তাহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকার?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি সপ্তদশটী শ্লোকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এক্ষণে উপরি-উক্ত

মহাবাক্যে তাঁহার উপদেশের উপসংহার করিতেছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মী স্থিতি যোগীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এবং সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাই প্রার্থনীয়। সকল ধর্ম্মাচার্য্য ভিন্ন ভিন্নভাবে এই অবস্থাটী আদর্শরূপে শিষ্যদিগের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট "নির্ব্বাণ," মহর্ষি ঈশার 'self-surrender." আত্মসমর্পণ, যাহাতে পিতা পুত্রের একত্ব, শ্রীচৈতন্যের "যুগলমিলন" এবং প্রাচীন ঋষিদিগের আত্মা ও পরমাত্মার গাঢ় যোগে "অধ্যাত্মযোগ," এসকলই এক কথা। জীব যখন এই ব্রাহ্মী স্থিতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সে তন্ময় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী; ব্রহ্মপ্রেমে পরিপূর্ণ এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হয়। ব্রহ্মশক্তি মানব-আত্মাতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সে আত্মহারা হইয়া যায়। এইরূপ দেবভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয় মন প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত এবং তাঁহার আনন্দ-সুধারস-পানে নিরত। সংসারের ক্ষুদ্র ধন মান সুখসম্পদ তাহার নিকট তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য; সুতরাং তাহারা তাহাতে আকৃষ্ট বা বিমুগ্ধ করিতে পারে না। যাহারা নিত্য সত্য ভূমানন্দ পরমেশ্বরকে আপনাদিগের নির্ভরস্থানরূপে প্রাপ্ত হয় না, তাহারাই সংসারের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং ইহার ক্ষুদ্র অসার মলিন কামনার দাস হইয়া মোহমায়ায় জড়িত হয়। তাহারা দুঃখ হইতে কঠিনতর দুঃখে, অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকারে, ভয় হইতে মহাভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যিনি মনোগত সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সংসারের সুখ দুঃখ, শুভাশুভ যাঁহার নিকট সমান, যিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়মধ্যে বাস করিয়াও পরম সংযমী, যিনি আত্মজয়ী, দেবপ্রসাদে যিনি সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার এবং পরমাত্মাকে লইয়া যিনি আত্মসন্তুষ্ট, এরূপ ব্যক্তির মোহে মুহ্যমান হইবার সম্ভাবনা কি?

ব্রহ্মযোগ প্রথম বয়স হইতেই সাধনীয়। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী, তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করেন এবং সুশিক্ষা, সাধুসঙ্গ ও তপস্যার দ্বারা পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান অভ্যাস করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকৃপা তাঁহাদের সহায় হইয়া অচিরে তাঁহাদিগকে সিদ্ধমনোরথ করে। তাঁহারা ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া জীবনকে ধর্ম্মের জীবন এবং সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিয়া চিরদিন পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করেন এবং মরণকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা জীবন্মুক্ত, ইহকাল ও পরকাল তাঁহাদিগের নিকটে তুল্যানুতুল্য। কিন্তু ঈশ্বরের অপার ও আশ্চর্য্য কৃপা, ইহাতে কাহারও নিরাশ হইবার কথা নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদিগের বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা বিফলে বা পাপের সেবায় গত হইয়াছে, তাহারাও বৃদ্ধবয়সে যদি অনুতপ্ত হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত

ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দয়াময় পরমেশ্বর তাহাদিগের সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকেও চরণাশ্রয় দান করেন। ব্রহ্ম-কৃপাগুণে যুগে যুগে কত জগাই মাধাই এইরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। একটী প্রবাদবাক্য আছে—"তপ কর জপ কর মর্‌তে জান্‌লে হয়।" মানুষ মৃত্যুকালে যদি সমুদায় সংসার-মায়া ভুলিয়া তদ্‌গত-চিত্ত হইতে পারে, তাহাতেই সে পরম-গতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য গীতার উপদেষ্টা এই পরম আশাকর বাক্য বলিয়া যোগা-ধ্যায় শেষ করিতেছেন যে, অন্তকালেও এই ব্রহ্মস্থিতির অবস্থা হইলে, তাহাতেই জীবের মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইবে।

পাশ্চাত্য গ্রাম্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

(৪৮৩ সংখ্যা—২১৮ পৃষ্ঠার পর)।

একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে—লোকে যে পরিমাণে সভ্যতা ভব্যতা শিখে, সেই পরিমাণে কবিত্বহীন হইয়া পড়ে। তাঁহারা কবিতার বিষয় আন্দোলন করেন বটে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কষ্ট-কল্পনায় ও অসাধারণ বাগ্‌-বৈচিত্রে তাঁহা-দিগের পুস্তকগত ভাব ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে চাহেন। সহরের ইংরাজদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ন্যায় শীতল বাহ্যাড়ম্বর অতি অল্প দেখা যায়। একটী শোক-পরায়ণতার বাহ্য দল গঠন করা হয়। শোকসূচক গাড়ী, শোকসূচক ঘোড়া, শোকব্যঞ্জক পালক, ভাড়া-করা শোক-কাতরী লোক ইত্যাদি সকলই থাকে, বোধ হয় যেন শোককে সকলে মিলিয়া বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছে। "একটী কবর খনন করা হইয়াছে"—জেরেমি টেলার(Jeremy Taylor) বলেন, "সুতরাং গভীর শোকো-চ্ছ্বাস উঠিয়াছে, পাড়ায় পাড়ায় কথাবার্ত্তা চলিতেছে। দিনকত গত হইলে তাহারা কখনও—আর কখনও এ পরলোকগত ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করিবে না।" হর্ষ-কোলাহলপূর্ণ নগরে শীঘ্রই আমরা পূর্ব্বতন সঙ্গীদিগের কথা বিস্মৃত হইয়া যাই। নূতন নূতন লোকের নিত্য আমদানী, এবং নিত্য নূতন নূতন আমোদরাশি তাহার স্মৃতিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলে এবং পরস্পর—শৃঙ্খলিত স্মৃতি-উদ্দীপক দৃশ্য ও সঙ্গিসমূহও নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গভীর ভাবে চিত্তাকর্ষণ করে। মৃত্যুর কুঠার গ্রামের চতুর্দ্দিকে একটু বেশী স্থানে আঘাত বিস্তারিত করে এবং গ্রাম্য জীবনের শান্তিময় একতার মধ্যে এক-জনের মৃত্যুঘটনা একটী লোমহর্ষণ ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবিশ্রান্ত শব্দায়-মান সমাধি-ঘণ্টাধ্বনি প্রতিকর্ণে বাজিয়া

উঠে; দিগন্তব্যাপী শোক পর্ব্বতকন্দর ও উপত্যকাপথ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে এবং সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে বিষাদ ঢালিয়া দেয়।

পল্লীগ্রামে এরূপ ঘটনা স্বাভাবিক। মৃত ব্যক্তি যে চিরপরিচিত পথগুলির সাথী ছিল, সে পথে তাহারই কথা মনে হয় এবং প্রত্যেক নির্জ্জন দৃশ্য—প্রকৃতির প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। পূর্ব্বজাগরিত প্রতি-ধ্বনিতে তাহার স্বর শুনিতে পাই, তাহার চিরবিহরিত কুঞ্জমধ্যে যেন তাহারই নিশ্বাস-ধ্বনি পাই। কাননমধ্যস্থ উচ্চ-ভূমিতে বসিয়া কিংবা উপত্যকাপথের সৌন্দর্য্যরাশির ভিতর থাকিয়া তাহার বিষয় চিন্তা করি। আনন্দপূর্ণ উজ্জ্বল প্রভাতের সজীবতায় তাহার প্রভাময় হাস্য ও অপরিসীম হর্ষ দেখিতে পাই; এবং যখন শান্তিময়ী সন্ধ্যা তাহার সঞ্চিত ছায়ারাশি ও গভীর নিস্তব্ধতা ঘনীভূত করিতে থাকে, তখন কত সময়ের বিশ্রম্ভালাপ ও অনুরক্ত হৃদয়ের বিষণ্ণতার কথা স্মৃতিপথে আসিয়া ক্ষণেকের তরে আঁধার হৃদয়ে বিজলি বিকাশ করে।

বাসভূমি হবে প্রতি নিরজন স্থান,
অশ্রুরাশি বরিষণ হবে নিয়মিত;
ভালবাসি, যতদিন রবে দেহে প্রাণ,
কাঁদি তবে, যতক্ষণে করুণামূর্চ্ছিত।

পল্লীগ্রামে মৃত ব্যক্তির স্মৃতি বহুদিন জাগরিত থাকিবার আর একটী কারণ এই যে, বিয়োগবিধুর ব্যক্তিদিগের ঠিক চক্ষের উপর প্রিয়জনের সমাধিগুলি বিরাজিত থাকে। উপাসনা করিতে যাইবার সময় এই সমাধিগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; পারত্রিক কার্য্যানু-ষ্ঠান করিতে করিতে যখন হৃদয় কোমল হইয়া উঠে, তখনও তাহারা চক্ষের উপর ভাসে। রবিবারে যখন চিত্ত পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে এবং বর্ত্তমান আমোদ প্রমোদ ও স্নেহভাল-বাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতীতের গম্ভীর চিন্তায় রত হয়, তখনও সমাধিগুলি চক্ষের উপর দেখিতে পাই। উত্তর ওয়েলসের (North Wales) কৃষকেরা ঐ দারুণ দুর্ঘটনার পর হইতে কয়েক রবিবার তাহাদিগের মৃত পরিজনের সমাধিস্থানের উপর নতজানু হইয়া উপাসনা করে। যে সকল স্থানে পুষ্প বর্ষণ ও পুষ্প বৃক্ষ রোপণের সুন্দর অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, ইষ্টার, হুইটসানটাইড এবং অন্যান্য পর্ব্বোপ-লক্ষে যখন নূতন ভাবে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়েই ঋতুরাজ আপনার গত জীবনের সঙ্গীটীর কথা মনোমধ্যে উজ্জ্বল-রূপে জাগাইয়া দেয়। খুব নিকটস্থ কুটুম্ব ও সুহৃদ্‌ দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হয়, কোনও ভৃত্য, নীচ অথবা অর্থলোভী ব্যক্তি নিযুক্ত হয় না। এ সম্বন্ধে কোনও প্রতিবেশীর সাহায্য লইতে হইলেও লোকে অপমানকর বোধ করে।

এই সুন্দর গ্রাম্য অনুষ্ঠানটীর উপর প্রবন্ধ লিখিবার কারণ এই যে, ইহা প্রণয়ের একটী পবিত্র সম্মানসূচক শেষ

নিদর্শন। শ্মশান প্রকৃত ভালবাসার অগ্নি-পরীক্ষা-স্থল। এইখানেই পাশব অনুরাগের স্বাভাবিক উত্তেজনার উপর মানবের স্বর্গীয় প্রেমের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। প্রথমোক্তটী কেবল আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের অবিচ্ছেদ উপস্থিতিতে সজীব রাখিতে পারা যায় না; কিন্তু যে প্রেম প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া গিয়াছে, তাহা দীর্ঘ স্মৃতির উপর জীবিত থাকে। যে সৌন্দর্য্যরাশি নয়নকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার অপগমে ইন্দ্রিয়াসক্তি অবসন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং সমাধিপ্রস্তরের বীভৎস সীমা হইতে উহা দারুণ বিরক্তির সহিত ফিরিয়া আইসে। কিন্তু প্রকৃত ও পবিত্র প্রেম শ্মশান হইতে পূত হইয়া একটী স্বর্গীয় অগ্নিশিখার ন্যায় শোকবিধুর ব্যক্তিদিগের হৃদয় পবিত্র ও আলোকিত করিতে থাকে।

স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে।*

নিষ্ঠাবতি,

আমি এই সন্ন্যাসভূমি কাটোয়ায় আর তুমি কোথায়? বিশ্বাসবলে তুমিও সন্ন্যাসিনী সাজিয়া আমার নিকটে। বিজ্ঞান বলে ও দিকের খবর আমরা কি জানি, অমর আত্মা কোথায় থাকিবে, দেশ কালকে অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা, এ সকল চিন্তা বৃথা। অজ্ঞেয় যাহা, তাহা চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে। এ কথা সত্য নয়। ভগবানের মত অজ্ঞেয় কি, তিনিও বিশ্বাসীর অতি নিকটে, তাঁহার কোলে আশ্রয় লওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি শ্রবণ করি; আমি বলি, তিনি শ্রবণ করেন। যেন সমুদয় জড় জগৎ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ। এ সকল প্রতীয়মান হয়, প্রকৃত বিশ্বাসের সাধনায়। অন্যের কি হয় তাহা বলিতে পারি না, আমার সঙ্গে বিশ্বাস আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইল, উজ্জ্বল হইল, সন্দেহ দূরে গেল। এখন যদি কেহ বলে যে তোমার ঈশ্বর অজ্ঞেয়, কিনা অবতার না হইলে, ঈশ্বরদর্শন কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে মনে মনে বলিয়া ফেলি, প্রভু ক্ষমা কর, ইহারা জানে না ইহারা কি বলিতেছে। যখন দেখিতেছি যে এমন অজ্ঞেয় পুরুষ, পরমজ্ঞেয় ও সহজ হইলেন, তখন জ্ঞেয় আত্মা, কেন বিশ্বাসীর নিকট অজ্ঞেয় থাকিবে তাহা জানি না। কিন্তু তপস্যা আবশ্যক, তোমার মত নিষ্ঠা প্রয়োজন। এখন তোমার নিষ্ঠার কথা একবার বলি। ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সাল প্রাতঃকালে উপাসনার আয়োজন হইল। আচার্য্যের স্বর্গারোহণ-দিন প্রতি বৎসর ৮ই জানুয়ারীতে নিষ্ঠার সহিত উপাসনা, হবিষ্যান্ন আহার, নিজেও করিবে, আমারও সহায়তা করিবে। কেন, ঐ দিনে নিষ্ঠার কারণ কি? কেশবচন্দ্র কে, যে তাহার জন্য ৮ই জানুয়ারী এত নিষ্ঠার প্রয়োজন? তোমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ হইয়াছিল, মৃদু মন্দ হাসিয়া সেই যে তিনি বলিলেন, আর কি ভুলিতে পারিব? এ কথাগুলি তোমার প্রাণে বিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি ভুলিতে পারেন না, আর তুমি কিরূপে ভুলিবে? সামান্য আত্মীয়ার জন্য বৎসর বৎসর লোকে কত কি করিয়া থাকে, আর এমন উপকারী বন্ধুকে বৎসরান্তে মায়ের কোলে দর্শন করা তোমার নিকট অধিক কি হইল? শেষ রাত্রিতে মাতৃস্তোত্র পাঠ হইল, নামগান করা হইল, অতি প্রত্যূষে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধেয় উ-বাবু মহাশয় বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন। বাহিরে কেন বসিলেন জানি না, বোধ হয় তোমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না সেই জন্য। আহারের সময় তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি ধরিয়া বসিলেন, হবিষ্যান্ন ভিন্ন অন্য অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং তোমার নিজের অংশ হইতে তাঁহাকে আহার করাইলে এবং জন্মের মত আত্মীয় করিয়া লইলে। আমি জানিতাম না যে তিনি তোমাকে এত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তোমার স্বর্গারোহণের পর উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বামাবোধিনীতে তোমার বিষয় যেরূপ সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর কেহ সেরূপ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এটী তোমার সেই এক দিনের নিষ্ঠার গুণে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক যখন হরিগুণ গান করিলে, সকলেই যোগদান করিয়া সুখী হইল। উপাসনার গৃহে সকলেরই স্থান হইত, ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম ধর্ম্মপিপাসু হইলেই হইল। উপাসনার গৃহে অবগুণ্ঠন ছিল না। যাহার অত্যন্ত কুদৃষ্টি, সেও স্থান পাইত। তোমার বিশ্বাস ছিল উপাসনার গৃহ এত উচ্চ স্থান, এখানে কেহ কাহারও মন্দ করিতে পারে না। তবে যাহারা চঞ্চল, তাহাদের লজ্জা রক্ষার্থে স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে। এইরূপে ১২ই জানুয়ারী মাইজী ও মহারাজ উপাসনায় যোগ দিলেন। ইহারা হিমাচলবাসী নেপালরাজ্যের লোক। মতিহারীতে ইঁহাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ইঁহারা উচ্চ শৈবধর্ম্মাবলম্বী, গীতা পাঠ করিতেন, আহার বিচার করিতেন না, জাতি মানিতেন না। ইহাঁদের বড় মিষ্ট স্বভাব ছিল। মাইজী মহারাজের শিষ্য নহেন, মহারাজ তাঁহার গুরু ভাই, কিন্তু গুরু মহারাজের হুকুম ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। মহারাজ উপাসনা শুনিয়া বলিলেন, "হোতা", "হোতা"। এ কথা দুটীর অর্থ তুমি বুঝিলে। ইহা আশ্বাসবাণী, "হবে", "হবে" কোন শৈব কোন ব্রাহ্মকে বলিতে পারে কিনা জানি না।

* স্বর্গগতা শ্রীমতী অঘোরকামিনীর উদ্দেশে তাঁহার স্বামী কতকগুলি পত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই অন্যতম। বা, বো, স।

তোমার নিষ্ঠার সুখ্যাতি এই সময় ছুটিয়াছিল। কোথায় হিমাচল, কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় উড়িষ্যা, রেলপথে যাইতে হইলেই বাঁকীপুরে অনেকেই এক বার থাকিয়া যাইতেন। ১৪ই জানয়ারি ১৮৮৯ সদাসিও রাম ও লছমন প্রসাদ তোমার গৃহে অতিথি হইলেন। উপাসনার আয়োজন হইল, লছমন প্রসাদ উপাসনা করিলেন। ঐ সময় লছমন প্রসাদ ভদ্র পোষাকের বিষয় একটী জীবন-কাহিনী বলিলেন। প্রচারক হইবার পূর্ব্বে তিনি মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিতেন, এক সময়ে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সিপাহীর বেশে হ্যাঙ্গার ঝুলাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনের জমাদার তাঁহাকে প্লাটফরমে যাইতে দিল না। এখনও সময় হয় নাই, এখনও কালা আদমীর প্রবেশাধিকার নাই। একটু পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিলাতী পোষাকে সুসজ্জিতা হইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিলেন ও নিজ স্বামী মহাশয়কেও ডাকিয়া লইলেন। এটী পোষাকের গুণ—এখানে চলে, ধর্ম্মজগতে নিষ্ঠার আধিপত্য। যাঁহার নিষ্ঠা আছে, তাঁহার সর্ব্বত্রই গতিবিধি। ভরসা হয় যে, তোমার নিষ্ঠায় আমারও স্বর্গ প্রবেশে অধিকার জন্মিয়াছে। হে নিষ্ঠাবতি! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও যেন আমার নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্য।

গার্হস্থ্য আশ্রমের নিকট সকল আশ্রমবাসিগণ (অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ভিক্ষু প্রভৃতি) উপকৃত হইয়া থাকেন। এইজন্যই সর্ব্ববিধ আশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ। সমগ্র মানবের হিতসাধনই এ আশ্রমের প্রধানতম কর্ত্তব্য—ইহা জীবনের মহাশিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান।

নারীহৃদয় স্বভাবতঃ করুণা ও মমতার আধার স্বরূপ। সংসারে কোমলতর বৃত্তিগুলি অর্থাৎ দয়া, প্রীতি, স্নেহ, পবিত্রতা, প্রেম প্রভৃতির বিকাশ করিয়া গুরুজনবর্গের সেবা এবং সন্তানগণকে সদ্‌ভাবে পরিচালিত করিয়া, তাহাদিগের হৃদয় উচ্চ আদর্শে পূর্ণ করিয়া. সংসারে ও সমাজে অমৃতস্রোত প্রবাহিত করাই গার্হস্থ্য জীবনে নারী জাতির কর্ত্তব্য। পতিগৃহ-গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্ব উপদেশ দিতেছেন,—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

অর্থাৎ গুরুজনের সেবা ও সপত্নীদিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিবে, পতিকর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও তাঁহার হিতসাধনে বিরত হইবে না, সংসারে সর্ব্বথা উদারতা প্রকাশ করিবে, সুখসম্পদে গর্ব্বিতা হইবে না, এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিলে রমণীগণ সুগৃহিণী-পদের যোগ্যা হন, নতুবা তাঁহারা কুলের কণ্টক স্বরূপ হন।

মহর্ষীর এই অমূল্য উপদেশাবলী রমণীজীবনে প্রতিপালিত হইলে সংসারে কোনরূপ অশান্তির উদ্যম হইতে পারিবে না। বলিতে পার ইহা পুরুষ জাতির স্বার্থসাধনের পরিচায়ক—কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঠিক্ তাহা বোধ হয় না। বস্তুতঃ এই নিয়ম কেবল আইনের বাধ নহে, সংসারে সুখলাভের ইহা মুখ্য উপায়। তাই বলিয়া কেবল মাত্র ঐ কয়টী বৃত্তির অনুশীলনেই নারীজীবন যাপিত হইতে দেওয়া সমাজের উচিত নহে। ঐ সকল কর্ত্তব্যসাধন নারীজীবনের মহান্ কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু চরম সীমা নহে; তাহাদিগকে আরও উচ্চ অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যতদিন তাহারা সে উচ্চতা প্রাপ্ত না হইবে, তত দিন সমাজে অধিকতর সুসন্তান লাভের সম্ভাবনা নাই। পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির শক্তির বহু প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের আত্মার অনুশীলনে অধিকার নাই, তাহারা কেবলমাত্র পুরুষ-

জাতির ক্রীড়নক বিশেষ হইয়া থাকিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, নারীজাতি জ্ঞানরাজ্যের পবিত্র প্রকোষ্ঠে কত দূর নীত হইয়াছিলেন। কি শাস্ত্র, কি কাব্য, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই রমণীগণের অপরিসীম প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ তাঁহাদের পতিনিষ্ঠতা, গুরুজনভক্তি, সাংসারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান আধুনিক রমণীদিগকে দর্প করিয়া দেখাইবার সামগ্রী। তাঁহাদিগের আত্মা সম্যক্‌রূপ অনুশীলিত হইত বলিয়াই—তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও জীবনকে এরূপ মধুময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

রমণীহৃদয় বড়ই বেগশালী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই বেগবত্তা যে দিকে পরিচালিত করা যায়, সেই দিকেই তীব্র ভাবে নিয়োজিত হয়। ভাল দিকে দাও, অমৃতময় ফল ফলিবে—মন্দ দিকে দাও অধোগতির চরম সীমায় নীত হইবে। তাহারা সুশিক্ষিতা হইলে সংসার শান্তিময় হইবে—রমণীর তেজস্বিতা, রমণীর একাগ্রতা সংসারকে বহু পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। নারীজাতিকে অশিক্ষিতা করিয়া রাখিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ত্রুটি ঘটে। নারী জাতির শিক্ষাহীনতাই যাঁহারা সংসারের সুখ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত—তাঁহারা নিজেদের এবং ভাবী বংশধরগণের সুখের পথে কণ্টক রোপণ করেন মাত্র, কারণ

নারী জাতি অশিক্ষিতা হইলে তদীয় সংসর্গে সুশীল স্বামীও দুঃশীল হইয়া পড়েন; পুত্র মাতৃহস্তেই গঠিত, কিন্তু উচ্চ আদর্শের অভাবে তাঁহাদের চরিত্র বিকৃত হয়—গৃহের অন্যান্য সহযাত্রিগণ অধঃপতিত হন। রমণীরা যতই জ্ঞানরাজ্যে আরূঢ় হইতে পারিবেন, সংসারও ততই উন্নত হইবে। প্রত্যেক সংসার উন্নত হইলেই—সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে রমণী জাতি গৃহিণী ও জননী, সে জাতিকে কদাচ অশিক্ষিত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সংসারে গুরুজনবর্গের সেবা, দাসদাসী প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার প্রভৃতি কার্য্যের সহিত স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা এবং নিয়মিতরূপে আত্মার অনুশীলন করা নারী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংসারের সমাজের ইষ্টানিষ্ট গভীর ভাবে অনুভব করিয়া কবিতা বা চিত্রাদির সংযোগে তাহা উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া সমাজের সমক্ষে উপনীত করিয়া সমাজকে উন্নতিপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করা রমণীর উচিত। রমণীহৃদয় স্বতই শিল্পময়—রীতিমত সেই প্রবৃত্তির অনুশীলন করিলে ভারতে এক নবীন যুগ উপস্থিত হইতে পারে, ভারত আবার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে। রমণীগণ কেবল আহার নিদ্রা, রাঁধা বাড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিলে অথবা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চাকরী করিতে ছুটিলে সমাজের উন্নতি হইবে না। তাহাদের আত্মার অনুশীলন, দেবানুরক্তি, কঠোর সংযম, আত্মত্যাগ, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। নারীজীবন এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও তাঁহাদের গৌরবে সমাজ উজ্জ্বল হইবে। নারীজাতির এই অমূল্য গুণাবলী তাহাদের বংশধরগণে সংক্রামিত হইয়া সংসারে অমৃতস্রোত বহিয়া যাইবে। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

"বঙ্গ দ্বিধা হও।"

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা রাজপুরুষ লর্ড কর্জন মন্ত্রসভায় অনেক দিন স্থির করিয়াছিলেন বঙ্গদেশকে ছেদন করিয়া দুই খণ্ড করিতে হইবে—পূর্ব্ব বঙ্গ আসাম-ভুক্ত হইবে, পশ্চিম বঙ্গ মান্দ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের কোন কোন উপবিভাগ লইয়া বর্দ্ধিত-কলেবর হইবে। যুক্তি এই—বঙ্গদেশ যেরূপ বৃহদাকার ও বহুসংখ্যক প্রজার বাসস্থান হইয়াছে তাহাতে ইহার শাসন একজন শাসনকর্ত্তার অসাধ্য, দুইজন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহার দুই ভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিলে সর্ব্ববিধায় সুবিধা হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টকে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের কলেবর বর্দ্ধিত

করা হয়, তাহাতে শ্রীহট্টবাসীরা যে অধিক সন্তোষ বা উন্নতি লাভ করিয়াছেন, বোধ হয় না। তৎপরে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যোড়া দিবার কথা হয়; ইহাতে চট্টগ্রামবাসীরা প্রতিবাদী হন এবং আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনর ও তৎকালীন হাইকোর্টের জজেরা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহার অবৈধতা প্রতিপন্ন করেন। কেহ যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বর্ত্তমান শাসনকালে সেই প্রস্তাব হইয়াছে; কেবল চট্টগ্রাম নয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং আবশ্যক হইলে বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলাও আসামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই রাজমন্ত্রণা প্রচার হওয়া অবধি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বস্থানে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উঠিয়াছে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভ সকল এ সম্বন্ধে তারের খবরে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বড় লাট এই আন্দোলনের বাড়াবাড়ি দেখিয়া স্বয়ং দলবলসহ চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ পরিদর্শনে যান এবং গোলযোগের শান্তি করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু দেশবাসীরা বলিতেছেন "দোহাই রাজন্, দোহাই ধর্ম্ম, আমাদিগকে বিভক্ত করিবেন না, তাহাতে আমাদের সকল বিষয়ে ক্লেশ ও অমঙ্গল হইবে।" রাজপ্রতিনিধি তারস্বরে বলিতেছেন, "এ অবুঝের কথা। বঙ্গ দ্বিধা হও, আমি সব জানিয়া শুনিয়া বলিতেছি ইহাতে তোমার সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি ও মঙ্গল হইবে।" রাজপুরুষের বাক্যে দ্বিধা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আর বাক্যে তর্ক-বিতর্ক, ক্রন্দন বা আন্দোলন করিয়া কি হইবে? কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, বড় শাসনকর্ত্তা বঙ্গকে দ্বিখণ্ড কেন, শতখণ্ড করিলেও তাঁহার ইচ্ছা বা ক্ষমতার প্রতিরোধ করা কি দেশবাসীদের সাধ্য? আমাদের বড়লাটের উপর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যদি দেশবাসীদের মনোভাব ও স্বার্থ বুঝিয়া প্রতিবিধান করেন ত রক্ষা, নচেৎ বঙ্গ নিরুপায়।

রুষ-জাপান যুদ্ধ।

রুষিয়া বহুদিন সাইবিরিয়া অর্থাৎ তাহার আসিয়াস্থ রাজ্যকে বিস্তারিত করিয়া ক্রমে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছেন। তাহার প্রসার এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট রুসিয়া ও ইংলণ্ডের আধিপত্যের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে বাধ্য হন। রুষ তাতার, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি অধিকার করিয়া অবশেষে চিনের সাম্রাজ্যভুক্ত মেঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হন। মেঞ্চুরিয়া তাঁহার করতলগত হইয়াছে এবং সাইবিরিয়া হইতে রেলওয়ে

তাহার উপর বিস্তারিত হইয়াছে। কোরিয়া লইয়া জাপান ও রুষে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহারাই পরিণাম বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ।

তিন চারি মাস ধরিয়া জাপান ও রুষিয়ার মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু রুষিয়া কোরিয়ায় প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন এবং জাপান কখনও তাহা করিতে দিবেন না, এই সহজ প্রশ্ন মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। রুষিয়া আদত কথা ছাড়িয়া নানা স্তোক-বাক্যে জাপানকে শান্ত করিবার প্রয়াসী হন এবং একদিকে স্পষ্ট উত্তর দেন না, অন্যদিকে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। জাপান আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া গত ৮ই জানুয়ারি রাত্রিকালে নৌ-সৈন্য লইয়া রুষিয়ার পোর্ট আর্থর হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং তাহার বড় বড় জাহাজ ভগ্ন বা জলমগ্ন করিয়াছেন। বেডিবষ্টকের নৌযুদ্ধেও রুষিয়া পরাস্ত হন। ইহার ফলে রুষিয়ার নৌবল নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। রুষীয় শাসনকর্ত্তা আলেকসিয়া আর্থর বন্দর পরিত্যাগ করিয়া ৩০০ মাইল দূরে হার্ব্বিন বন্দরে আড্ডা করিয়াছেন, জাপানীরা কোরিয়ার রাজধানী সিওল অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিয়া স্থলযুদ্ধের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমরে উভয় পক্ষ কতক কতক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঠিক্ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, জাপান ও তাহার সপক্ষ জাতিরা জাপানের বাহাদুরীর প্রশংসা ও রুষিয়ার কাপুরুষতার গ্লানি করিতেছেন। রুষিয়া ও তাহার পক্ষীয়েরা অন্যরূপ বলিতেছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাপানের বন্ধু, ফ্রান্স রুষিয়ার বন্ধু। অন্যান্য জাতি কতক এদিক, কতক ওদিক অথবা স্পষ্টভাবে কিছু ধরা দিতেছেন না। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে, জাপান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, রুষিয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করেন, ইহাতে রুষিয়ার ক্ষতি অধিক ও জাপানের অল্প হইয়াছে। জাপানের আর এক সুবিধা এই যে, জাপান আপনার ভূমিতে বসিয়া যুদ্ধের আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতেছেন, রুষিয়াকে সহস্র মাইল দূর হইতে বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। রুষ সম্রাট্ যুদ্ধের দুঃসংবাদ প্রথমে পাইয়াই আর্ত্ত-স্বরে জগৎকে জানাইয়াছেন—"আমার বিশ্বাসঘাতী শত্রু অন্ধকারে আমার বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়াছে এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে আমার কেল্লা ও জাহাজ সকল বিনষ্ট করিয়াছে।" পরে তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রজা সকলকে সসজ্জ হইতে আদেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "আমার প্রস্তুত হইতে কিছুদিন যাইবে, কিন্তু রুষিয়ার গৌরবোপযোগী শতগুণ বৈরনির্য্যাতন করিব।" ইতিমধ্যে তিনি কোন কোন সেনাপতিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই যুদ্ধ বর্ত্তমান যুগের যে এক মহা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইবে এবং ইহার ফলে পৃথিবীতে বহুদিনব্যাপী অশান্তি ও অনিষ্ট হইবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমরা রুষিয়ার জন্য দুঃখিত যে, রুষিয়া এত বড় সমৃদ্ধিশালী হইয়া একটু লোভ-সম্বরণ ও ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। আমরা জাপানের জন্য শত দুঃখিত যে, জাপান অল্পকালমধ্যে ঈশ্বরপ্রসাদে এবং নিজ অধ্যবসায়ে এক মহাজাতিরূপে গঠিত হইয়া আসিয়ার আশা ভরসা ও নির্ভর-স্থল হইতেছিল, যুদ্ধসংঘর্ষণে বলক্ষয় করিয়া বিধাতার ইচ্ছা এবং পূর্ব্বাঞ্চল-বাসীদের আশা বুঝি পূর্ণ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য সংবাদ-পত্র সকল বলিতেছেন, "জাপান যদি পরাস্ত হয়, চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; যদি জয়ী হয়, জয়ফল অতি অল্প ভোগ করিতে পারিবে—তাহার ব্যয়ে অপর জাতিরা লাভবান্ হইবে।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই যুদ্ধের শান্তি হউক এবং জাপান আপনার উপার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি ও বল আসিয়ার উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করুন্।

পালামৌর বন্যজাতি।

অদ্য "বামাবোধিনীর" পাঠক ও পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যে প্রদেশের বন্য জাতির বিবরণ আলোচনা করিতে উপনীত হইয়াছি, উহা বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছোট নাগপুর বিভাগের একটি জেলা—নাম পালামৌ। পালামৌর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত শোণ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত, দক্ষিণ প্রান্তে লোহারডাগা, পূর্ব্ব প্রান্তে হাজারি-বাগ। উক্ত জেলার পরিমাণফল ৪৯৪৫ বর্গ মাইল। স্থানটী পর্ব্বতময়, এবং তথাকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম। পালামৌ পার্ব্বত্য দেশ বলিয়া তথায় শীত ঋতুতে শীতাধিক্য ও গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া থাকে—বৃষ্টির পরিমাণ বড়ই কম, গ্রীষ্মের উত্তাপে, অনাবৃষ্টিতে ও মৃত্তিকার সহিত অধিক পরিমাণে বালি এবং প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রিত থাকায় ফসল সন্তোষজনক হইতে পারে না।

শীত ঋতুতে অতিশয় শীত হেতু অধিক পরিমাণে তুষার বা পালা পতিত হওয়ায় সম্ভবতঃ স্থানটীর পালামৌ নামকরণ হইয়াছিল—কেহ কেহ অন্যরূপ কারণও নির্ণয় করিয়া থাকেন—অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমুদায় লিখিলাম না।

পালামৌ পূর্ব্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল। পালামৌর রাজা চেরো-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। চেরোগণ আপনাদিগকে চন্দ্র-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যজ্ঞোপবীতধারী এবং পশ্চিম-দেশীয় ক্ষত্রিয়জাতির শাখা বলিয়া গণ্য। স্বাধীন পালামৌ-রাজের বংশ-তালিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা বহু পূর্ব্বে কামাউন সর্দ্দারবংশীয় ছিলেন এবং আরা জিলার ভোজপুরীদিগকে আক্রমণ করতঃ তাহাদের রাজাকে আরা হইতে বিতাড়িত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিবাদে আরার রাজসিংহাসন অধিকারের পর কোন এক বলশালী জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিতাড়িত হন; এবং ২৫০ বৎসর পরে পুনরায় পালামৌ আক্রমণ করেন। পালামৌরাজ সিরগুজা-নামক অরণ্যে পালাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় এই চেরো-সম্প্রদায় পালামৌতে আসিয়া বাস ও রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। চেরো-সম্প্রদায়ভুক্ত এই পালামৌরাজের অধীনে ১০।১২ হাজার সৈন্য ছিল। অদ্যাপিও পালামৌর হেড কোয়াটার ডাল্টনগঞ্জের পার্শ্বে প্রবাহিত কোয়েল নদীর অপর পার্শ্বে ভগ্নরাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদ হইতে ১০ ক্রোশ ব্যবধানে গভীর অরণ্যে দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। দুর্গটী এক্ষণে হিংস্রজন্তুর বাসস্থান হইয়াছে। পালামৌর বর্ত্তমান রাজা হেড্ কোয়াটার হইতে ৪ মাইল দূরে চৈনপুরে থাকেন। তিনি পালামৌ স্বাধীনরাজবংশীয় নহেন। শুনা যায়, ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ কেহ, উক্ত স্বাধীন রাজার দেওয়ান ছিলেন। রাজা তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ দুই একটী গ্রাম ও কিছু জমি দান করিয়াছিলেন। সেই সমুদায় জমি ও গ্রাম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তিনি একটী জমিদারশ্রেণীভুক্ত হন। পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পালামৌ ইংরাজাধিকার-ভুক্ত হইলে সেই দেওয়ান, পরে জমিদার বংশীয় চৈনপুরাধিপতি প্রথমে রায় বাহাদুর, পরে রায় সাহেব, ও এক্ষণে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। চেরো-সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধিপতি সাহাবাদনিবাসী, জাতিতে রাজপুত, নাম রাজা ভগবৎ দয়াল সিংহ। পালামৌ ইংরাজাধিকারে আসিলে ইহাকে সব-ডিবিজন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে, ১লা জানুয়ারিতে মাজিষ্ট্রেট ডাল্টন সাহেব আসিয়া আদিমবাসী-দিগকে সম্পূর্ণ বর্ব্বরাবস্থায় প্রাপ্ত হন। নরনারী সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায়, কেহ কেহ বৃক্ষাদির ত্বক্ পরিধান করতঃ লজ্জা নিবারণ করিতেছিল। তিনি অনেক চেষ্টায় ইহাদিগকে সভ্য করিয়া যান।

তখন ইহার নাম ডাল্টনগঞ্জ হয় ও ইহা তৃতীয় শ্রেণীর জেলায় পরিণত হয়। হইা একজন ডিপুটী কমিশনর (Deputy (Comissioner) দ্বারা শাসিত। পূর্ব্বে ডালটনগঞ্জ ঘোর অরণ্যপূর্ণ ছিল। জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইবার পর সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণের আবির্ভাব হইল। তখনও প্রায় সর্ব্বত্রই হিংস্রজন্তু প্রভৃতি বিচরণ করিত। রাত্রিকালে গৃহপ্রাঙ্গণে বিড়াল, কুকুরের ন্যায় তাহা-দিগকে বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে দেখা যাইত। কেহ রাত্রিতে গৃহ হইতে বাহির হইতে সাহসী হইতেন না। সন্ধ্যা হইবা-মাত্র সকলেই গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গৃহে আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতেন। আত্মরক্ষার্থে সকলকেই বন্দুক রাখিতে হইত। অদ্যাপিও গ্রীষ্মা-ধিক্য হইলে সময় সময় নগরপ্রান্তে চিতা, নেকড়ে, ও ভল্লুক ইত্যাদি দেখা দেয়। অত্রত্য প্রাচীন জনৈক উকীল (যিনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথমে এ স্থানে পদার্পণ করেন) বিস্তর জায়গা জমি করিয়াছেন। তিনি গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন, ও বহুকাল হইতে আছেন বলিয়া একপ্রকার এদেশীয় হইয়া গিয়া-ছেন। তিনি বহুপূর্ব্বে অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া এক রয়েল টাইগার বধ করতঃ তাহার একটী শাবক লইয়া আইসেন। প্রথমতঃ শাবকটীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, পরে বড় হইয়া হিংস্র-স্বভাব প্রাপ্ত হইলে উহাকে পিঞ্জারাবদ্ধ করেন। তখন রেল-গাড়ীর সুবিধা ছিল না বলিয়া বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে গো-শকটে করিয়া উহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসেন। হাওড়া ষ্টেশনে আসিবামাত্র অনেকগুলি সাহেব একত্র হইয়া উহা ক্রয় করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি উক্ত সাহেবদিগের মধ্যে একজনের নিকট ৩৫০৲ টাকা লইয়া বিক্রয় করেন, আজকাল আর রয়েল টাইগার বড় দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

সুখের জীবন।*

(১)

ধন্য তার জন্ম কর্ম্ম শিক্ষা দীক্ষা আর,
যে নহে কখনো অপরের ইচ্ছাধীন;
সাধু চিন্তা দৃঢ় বর্ম্মে আঁটা হৃদি যার,
সরল সত্যের সেবা করে নিশি দিন।

(২)

যে নহে কখনো তার রিপুদের দাস,
আত্মা যার মৃত্যু তরে প্রস্তুত সতত,
বাঁধে না যাহার চিত্ত সংসারের পাশ—
লোকের প্রশংসা নিন্দা যার পদানত।

* Translated from "The Happy Life".

(৩)

আকস্মিক ঘটনায় যদি কোন জন
বাড়ে কিম্বা পাপাচারে, হিংসে না তাহায়।
তোষামোদ-তীব্রাঘাত সহে না কখন,
বুঝে না রাজ্যের বিধি—বুঝে সত্য ন্যায়।

(৪)

যে যা বলে তাতে নাহি ভ্রূক্ষেপ যাহার,
বিবেক যাহার দৃঢ় আশ্রয়ের স্থান,
স্তাবক যাহার বিত্তে নহে অংশিদার,
ধ্বংসে যার ঘটে নাক অনর্থ মহান্।

(৫)

প্রাতঃ সন্ধ্যা ঈশ্বরের যে করে ভজন,
সংসারের লোভে নয়—তাঁর কৃপা আশে,
নির্দ্দোষ দিবস যেই করয়ে যাপন
ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা সাধুবন্ধু সহবাসে।

(৬)

সে নীচ দলের লোক নন তিনি কভু,
আশায় উত্থিত—ভয়ে পতিত আবার,
নাহি ভূমি, তথাপিও আপনার প্রভু,
কিছু নাই তথাপি সকলি আছে তাঁর।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪৮৪ সংখ্যা ২৫০ পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধ, সিদ্ধি, সিদ্ধিদ, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি-বিধাতা, সিদ্ধেশ্বর, সিধা, সীমা, সীমাতীত, সীমান্ত, সু, সুকৃৎ, সুকৃৎ-বন্ধু, সুকৃতি-বিধাতা, সুখ, সুখকর, সুখকারী, সুখদ, সুখদাতা, সুখময়, সুখাকর, সুখাধার, সুখাবহ, সুখালয়, সুখস্বরূপ, সুখী, সুখে দুঃখে সমবন্ধু, সুগতিবিধাতা, সুচতুর, সুচরিত, সুচিন্ত্য, সুচারু, সুচেতা, সুজন, সুজনবন্ধু, সুতীক্ষ্ণদর্শী, সুদীনসখা, সুদুর্লভ, সুধাধার, সুধাময়, সুধাসিন্ধু, সুধী, সুধীর, সুধীন্দ্র, সুনন্দ, সুনামা, সুনীতিগুরু, সুন্দর, সুন্দরতম, সুপণ্ডিত, সুপর্ণ, সুপ্ত-পরিদর্শক, সুপ্তিহীন, সুফলদাতা, সুবল, সুভদ্র, সুমতি-দাতা, সুমধুর, সুমনা, সুর, সুরনরন্দন, সুরপতি, সুলভ, সুললিত-রূপ, সুলক্ষ্য, সুশাসক সুশোভন, সুযুপ্ত-বন্ধু, সুহৃদ্, সুহৃত্তম, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মশক্তি, সূক্ষ্মদর্শী, সূবী, সূরীন্দ্র, সৃজন-কর্ত্তা, সৃজনলয়কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টিধর, সৃষ্টিরক্ষক, সৃষ্টিপালক, সেই সত্য, সেরা, সেবক, সেবক-বৎসল, সেবনীয়, সেব্য, সোমেন্দ্র, সৌজন্যগুরু, সৌভাগ্যদাতা, সৌভ্রাত্রবর্দ্ধক, সৌম্য।

নূতন সংবাদ।

১। ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি স্থাপন ও ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ ১৩ই ফেব্রুয়ারী সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার ভিত্তিস্থাপন এবং তাঁহার পত্নী পারিতোষিক বিতরণ করেন। অপার-সার্কুলার রোডে "কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স ও সার্জ্জন্স" বিদ্যালয়ের বাটী শুদ্ধ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড বিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। কুমারী কার্পেণ্টারের স্মরণার্থ তথায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ হল হইবে। গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

২। ছোটলাট শ্যামবাজারে অনাথাশ্রমেরও গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কুমার মন্মথ নাথ মিত্র ইহার জন্য একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কতক জমি আবার ক্রয় করাইয়া দিবেন।

৩। বড়লাট কুর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন "বিশ্ববিদ্যালয়াবলী আইন দ্বারা উচ্চ শিক্ষার বলিদান করিবেন না, কিন্তু সুনিপুণ ডাক্তারের ন্যায় ইহার রোগ সকল নিষ্কাসিত করিয়া ইহাকে চিরজীবিনী করিবেন। "ফলেন পরিচীয়তে।"

৪। বড়লাট চট্টগ্রাম ঢাকা ও ময়মনসিংহ পরিদর্শন করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার যুক্তি সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

৫। গত ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে বালিকা-বিদ্যালয় সকলের ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস শ্রীমতী এ সি মেরী মুরাটের উদ্যোগে সূচি-শিল্প-প্রদর্শনী সভা হইয়াছিল। ছোটলাট-পত্নী উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের সুন্দর সূচিকার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি স্বর্ণ রৌপ্য পদক বিতরিত হইয়াছে।

৬। পুটিয়ার রাণী হেমন্ত কুমারী রাজসাহী কলেজে বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়নার্থ একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং অধ্যাপনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে বার্ষিক ১৬০০ টাকা দিবেন। ৫ টাকার ছাত্রবৃত্তি কয়েকটীও প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

৭। ভূপালের বেগম মদিনায় গিয়া অত্যাচারী আরবদের হস্তে বিপন্ন হইয়াছিলেন, মক্কায় সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

৮। ১৮৭৬ সালে নেটালে ভারতবাসীর সংখ্যা ১০,৬২৬ ছিল, ১৯০২ সালে ৭৮,০০৪ হয়, এক্ষণে আরও বাড়িয়াছে।

৯। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে রুষ জাপানে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। প্রথম দুই জলযুদ্ধে জাপানীরা জয়ী হইয়াছেন, এবং শুনা যায় রুষিয়ার নৌবল অর্দ্ধেক খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন। রুষিয়া কোন কোন স্থলে জাপানীদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। জাপান সম্পূর্ণ প্রস্তুত, রুষিয়া এখনও অপ্রস্তুত। উভয় পক্ষের বলাবল এইরূপ প্রকাশিত—

রুষ	জাপান
স্থলসৈন্য ৪৫ লক্ষ	৬ লক্ষ
তোপকামান ৫০০০	৭০০
রণতরী ৬১	৫০
নৌসৈন্য ৯৪০০০	৬০০০০

১০। প্রেসিডেন্সী জেল—যাহাকে হরিণবাড়ী বলে, তাহার উত্তরে "বিক্‌টোরিয়া স্মৃতিমন্দির" নির্ম্মাণার্থ স্থান ঘেরাও হইয়াছে। জেলখানা উঠিয়া গিয়া একটী উদ্যান হইবে। স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণে ৭।৮ বৎসর যাইবে, কিন্তু তথায় যে সকল দ্রব্য রক্ষিত হইবে, ইতিমধ্যে তাহার প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে।

১১। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে নূতন পার্লেমেন্ট্ খুলিয়াছে।

১২। কাবুলের আমীর হবিবুল্লার সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সর্দ্দার উমারজানের ঘোরতর মনোবাদ হইয়াছে, ইহাতে একটী শোচনীয় বিগ্রহঘটনার সম্ভাবনা।

১৩। লর্ড কর্জন চট্টগ্রামে গিয়া আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে খুলিয়াছেন।

১৪। আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, বঙ্গমাতার অশেষ-গুণভূষিত সুপুত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় গত ২৩এ ফেব্রুয়ারি মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে, ৭১ বৎসর বয়সে, কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি বাগ্মিতা, কি লিপিপটুতা, কি বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধান, কি দেশহিতৈষিতা, কি ধর্ম্মবিশ্বাস, একাধারে সকল গুণের আধার ছিলেন। ইহাঁর অভাবে সমগ্র ভারত মহাক্ষতিগ্রস্ত! এ অভাব শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কর্ম্মফল — শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। একটী বালককে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা, মাসী ও মেসো বাবুয়ানা ও সাহেবিয়ানা শিক্ষা দিয়া তাহাকে বিগড়াইয়া দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা হয়। গল্পটী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

২। সচিত্র কবিতা-কোরক—শ্রীরমেশ-চন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক ১৪টী কবিতা আছে। লেখকের শক্তি আছে, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন।

৩। নব শিক্ষা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠ্য —শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৶০ আনা। গদ্যে ও পদ্যে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে এবং ইহাতে ব্যাকরণ শিক্ষার পাঠ আছে। পুস্তক-খানি বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্র গৃহীত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হই।

৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—মূল্য ২৲। পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

নীরব।

নীরব হইতে বড় হয়েছে বাসনা,
নীরবে সাধিব আমি সকল সাধনা।
নীরবে করিব সদা হরিগুণ গান,
নীরবে করিব হৃদে হরিরূপ ধ্যান।
সংসারের যত কিছু দুঃখ আর ভয়,
নীরবে সহিয়া যেন করি সব জয়।
জীবনের কাজ সব নীরবে বুঝিব,
প্রাণ দিয়ে সদা তাহা নীরবে সাধিব।
যখন আসিবে দেব তব আবাহন,
নীরবে তোমার কাছে করিব গমন।
অতি ভয়ঙ্কর সেই মৃত্যুর যাতনা,
তুমি থাক প্রাণে, আর রবেনা ভাবনা।
তব পদে নিবেদন ওহে দয়াময়!
নীরবে আমার যেন সব শেষ হয়!

শ্রীসুমতি মজুমদার, বাঁকিপুর।

বিদায়ী পূর্ণিমা।

এই হেমন্তের শশী,
এই পূর্ণিমার নিশি,
রজত জ্যোছ্না মাখা,
আছিল ধরায়।
এই দিনে এইখানে,
শেষ দেখা তার সনে,
এমনি সময়ে সে যে
নিয়েছে বিদায়।
বলিতে গো বুক ফাটে,
তিন বর্ষ প্রায় কাটে,
সকলি আসিল ফিরে,
সে গেল কোথায়?
হেমন্ত আসিল ঘুরে,
পূর্ণিমা আসিল ফিরে,
মাস, বর্ষ, বার তিথি
ফিরিল ত্বরায়।
সে কি আর আসিবে না?
আর ফিরে চাহিবে না?
জনমের মত ফেলে
গেল খেলাঘর!
সেই বিদায়ের রাতি,
হেমন্ত পূর্ণিমা তিথি,
হৃদয়ে রহিবে গাঁথা,
যুগ যুগান্তর!

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

যায় দেবী যায়॥*

যায় দেবী যায়,
পাপ ধরা পরিহরি,
স্বর্গপথ আলো করি,
শূন্যে ফুটাইয়া ফুল সৌন্দর্য্য ছটায়।
ওই দেবী যায়। ১
যায় দেবী যায়,

* রংপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস।

স্বর্গ সুরবালাগণ,
করি নব আয়োজন,
খেলিতে নূতন খেলা ডাকিছে তাঁহায়,
ওই দেবী যায়। ২
যায় দেবী যায়
স্বর্গে আছে সতী কুঞ্জ,
প্রেম প্রীতি পুঞ্জ পুঞ্জ,
তাহে শোভে ক্ষমা, ধৃতি অপূর্ব্ব শোভায়,
ওই দেবী যায়। ৩
যায় দেবী যায়,
মুদিত নয়ন-পত্র,
মলিন মুখ পবিত্র,
ধূলায় লুটায় কায় হায় হায় হায়,
ওই দেবী যায়। ৪
ওই দেবী যায়,
অন্তঃসত্ত্বা সতী নারী পুত্র পৌত্র কোলে করি
শিয়রে দেবতা স্বামী তুলসীতলায়,
ওই দেবী যায়। ৫
ওই দেবী যায়,
সীমন্তে সিন্দুর দাগ, চরণে অলক্ত রাগ,
পিধানে নূতন সাড়ী, কৃষ্ণ নাম গায়,
ওই দেবী যায়!
যে নারী সধবা মরে, সপ্ত স্বর্গে স্বর্ণঘরে
তার স্থান, দেবপুরে পুণ্যের মেলায়,
ওই দেবী যায়। ৭
যায় দেবী যায়,
পতি পুত্র থুয়ে সতী, চলিল অমরাবতী,
মোরা কবে স্থান পাব সে পদছায়ায়,
ওই দেবী যায়।৮

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাসী।

স্মৃতি।

কি গভীর বেদনায়,
হৃদয় দহিছে হায়!
প্রকাশে নীরব ভাষা,
যেন প্রাণে কি পিপাসা।
অব্যক্ত সে ভাব গূঢ়,
কল্পনিতে হই মূঢ়।
যেন কারে প্রাণ চায়,
খুজিয়াও নাহি পায়।
পাই পাই তারে ধরি,
ধরিতে পড়িছে সরি।
প্রাণে প্রাণে দেখা হয়,
আবেশে বিহ্বলময়।
আনন্দে শিহরে প্রাণ,
সচকিতে হয় আন।
চির-পরিচিত সেই,
কিছুতেই ভুল নেই।
সেই প্রীতি প্রাণচোরা,
সে প্রেমে চিত বিভোরা।
সে প্রিয় না হবে যদি,
দাস্য সখ্য মধুরাদি,
পঞ্চ ভাবে কেন প্রাণ,
স্ফুরিছে ধরিছে তান।
মোহন মাধুরী সেই,
এই সেই ওই এই।
স্বরগে মরতে দেখা,
দিতেছ, দিওহে সখা!

জীবনে মরণে হাত,
ধরে থেক সাথে সাথ।
যদি পুনঃ জন্ম লই,
জন্মি যেন নারী হই।
পুনঃ সে পাইয়া সখে!
ঘুচাইব মনোদুঃখে!
না হয় জনম যদি,
যথা তথা নিরবধি,
মুক্তি বা স্বর্গের পথে
থেক সখে সাথে সাথে॥

শ্রীঅম্বিকা সেন।

ব্যর্থ আশা।

সারা জীবন ব্যর্থ আশায়
নীরব ভাষায় কাটিয়া গেল।
হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া নীরবে
নীরবে বহিল আঁখির জল।
উষায় যখন মেলিনু নয়ন
আধ ঘুম ঘোরে আধেক জাগি,
তখনি চাহিতে করেছিনু ভুল
জানিনাক কোন্ সুখের লাগি।
তার পরে ধীরে প্রভাত হইল,
তীব্র রবি-করে জাগিনু যবে।
সুপ্ত আঁখি মেলি চাহিয়া বুঝিনু,
সেই স্মৃতিটুকু ভুলিতে হবে।
প্রফুল্ল মুকুল নীহারজড়িত
ছিল ভুলে বটে তরুর গায়।
অরুণকিরণে,—প্রেমসিক্ত মুখ
মুছাইতে হবে, ধরার দায়।
সেই অভিজ্ঞতা, মুকুলিত প্র. .
বাজাইল কত করুণ বাঁশি,
নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিনু
নীলিমার মাঝে হাসিছে শশী।
বিহ্বলকারী মৃদুল জ্যোৎস্না
স্নিগ্ধ পরশে আবরি স্নেহে,
ছিন্ন মুকুল কুড়াইয়া লয়ে
জড়াল আদরে হৃদয় গেহে।
শুকাইয়াছিনু, শুকাইতেছিনু,
পথে পড়েছিনু ধূলির মাঝে,
সারাটী জীবন লুটাতাম বনে
নীরবে কাঁদিয়া মলিন সাজে।
করুণা-ধারায় কাতরহৃদয়
ধুইয়া আদরে টেনেছে কোলে।
ভুল-নিমগন হৃদয় আমার
তবু ভ'রে থাকে আঁখির জলে।
দেবের প্রসাদ—চির-আকাঙ্ক্ষিত
সে আশা আমার অনেক দূরে।
নিয়তি-বেদনে, মরতমাঝারে
বাজে কি বাজনা বেদন সুরে।
কতদূর আর জীবনের পথ,
কোথায় তাহার হইবে শেষ?
কোথায় আমার চির-ঈপ্সিত,
সুখ-সাধনার অমিয় দেশ?
এস চির-বাঞ্ছিত চির-আরাধ্য!
নিবাও প্রাণের সকল জ্বালা,
কর মুকত জীবন, খুলে দাও ফাঁস,
পরিত্যক্ত এ মলিন মালা॥

শ্রীসরসী দাসী।

করুণা সুন্দরী।

(কোনও বান্ধবকন্যার জন্মদিনে)

আয় আয় আয়,
ভরিয়া রেখেছি বুক প্রীতিমমতায়।
না আসিতে ধরাধামে আগেই তোমার নামে

আমরা গেঁথেছি মালা বেলা যূথিকায়;
তোমারি তোমারি তরে চে'য়ে আছি সকাতরে,

কাতরা চাতকী সম দূর নীলিমায়।
আশার মন্দির গড়ি কতই যতন করি
স্নেহের তোরণদ্বার বাঁধিয়াছি তায়;
উন্মুক্ত করি সে দ্বার, কর প্রাণ অধিকার,
আয়রে! সোণার যাদু ধরাধামে আয়।১

আয় আয় আয়
আদরে রাখিব তোরে ফুল বিছানায়;
মা রেখেছে সযতনে অমৃত পূরিয়া স্তনে,
দেববালিকার মত পিয়া'তে তোমায়;
বুকের উপরে তব গড়িবে কুটীর নব,
লাগিবে না কাদা ধূলা ও কোমল গায়।
যা আছে সকলি দিব, কোলে নিব কাঁখে নিব,

অবিরাম মহোৎসবে রহিবে হেথায়।
সুখে থাকি দুখে থাকি চাঁদমুখে রাখি আঁখি,

জুড়াব তাপিত প্রাণ তব করুণায়;
আয়রে সোণার মেয়ে ধরাধামে আয়।২

আয় আয় আয়,
বহা'তে অমৃতগঙ্গা পাষাণ হিয়ায়;
আয়রে করুণারাণী প্রেমের প্রতিমাখানি
জুড়াইতে মরুভূমি করুণা-ছায়ায়।
দেখ, ধূমকেতু সম ছুটিছে জীবন মম
এ মহা অনন্ত মাঝে কেন্দ্রহীন প্রায়।
এস তুমি মধ্যবিন্দু প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
বেড়াইব চারি দিকে ঘিরিয়া তোমায়।
আয়রে সোণার মেয়ে ধরাধামে আয়।৩

আয় আয় আয়!
নন্দন সুরভি মাখি সুকোমল গায়,
স্বর্গের সংবাদ দিতে আয় যাদু পৃথিবীতে,
লিখিতে জীবনগ্রন্থে নবীন অধ্যায়।
শিখাতে নিষ্কাম ধর্ম্ম, শিখাতে প্রেমের মর্ম্ম,
আপনা সঁপিয়া দিতে অপরের পায়।
যতই থাকি না কাজে, জাগিবে হৃদয়মাঝে
সতত তোমার কথা বিভুপ্রেম প্রায়,
আয়রে করুণারাণি! ধরাধামে আয়।৪

আয় আয় আয়!
হাসিমুখে হাসাইতে আমা সবাকায়।
আছি মোরা পথ চেয়ে, আয়রে সোণার মেয়ে,

"করুণা সুন্দরী" নামে ডাকিব তোমায়।
চির-কৃপাময়ী সাজে সাজিও সংসারমাঝে,
যাচি এ করুণা ভিক্ষা বিধাতার পায়।
হ'য়ে চির-গুণবতী, হও তুমি আয়ুষ্মতী,
তিন কুল হোক আলো তোমার প্রভায়।
আয়রে! সোণার মেয়ে, ধরাধামে আয়।৫

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

Registered No. C. 134

No. 487-88. March & April, 1904.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত

৪১ বর্ষ। ৪৮৭-৮৮ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচী পত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২১
২। কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুসিয়ার সম্বন্ধ ৩২৩
৩। প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রভু ও ভৃত্য ... ৩২৫
৪। আমার দাদা (পদ্য) ... ৩৩১
৫। পত্র ৩৩৩
৬। মিলন (পদ্য) ৩৩৫
৭। নবীন ভারতী ৩৩৮
৮। শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব ... ৩৪২
৯। ঈশ্বরের নামাবলী... ... ৩৪৭
১০। রসায়ন তত্ত্ব—কার্ব্বণ ... ৩৪৮
১১। বিধবা-বিবাহের উপসংহার... ৩৫২
১২। ভারতীয় পুণ্যনদী ... ৩৫৭
১৩। রেল হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের অপকারিতা ... ৩৬৩
১৪। নলিনীর শিক্ষা ৩৬৪
১৫। পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতীর স্মারক কীর্ত্তি ... ৩৬৯
১৬। পালামৌর বন্যজাতি ... ৩৭১
১৭। বিজ্ঞান-রহস্য ৩৭৩
১৮। নূতন সংবাদ ৩৭৪
১৯। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ৩৭৬
২০। বামারচনা—
বাসন্তী নিশায়—প্রান্তরে .. ৩৭৯
নীহারে সিক্ত শুষ্ক গোলাপ ৩৮১
২১। ১৩১০ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮১

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

করুণা সুন্দরী।

(কোন ও বান্ধবকন্যার জন্মদিনে)

আয় আয় আয়,
ভরিয়া রেখেছি বুক প্রীতিমমতায়।
না আসিতে ধরাধামে আগেই তোমার
নামে
আমরা গেঁথেছি মালা বেলা যূথিকায় ;
তোমারি তোমারি তরে চে'য়ে আছি
সকাতরে,
কাতরা চাতকী সম দূর নীলিমায়।
আশার মন্দির গড়ি কতই যতন করি
স্নেহের তোরণদ্বার বাঁধিয়াছি তায় ;
উন্মুক্ত করি সে দ্বার, কর প্রাণ অধিকার,
আয়রে ! সোণার যাদু ধরাধামে আয়।১

আয় আয় আয়
আদরে রাখিব তোরে ফুল বিছানায় ;
মা রেখেছে সযতনে অমৃত পূরিয়া স্তনে,
দেববালিকার মত পিয়াইতে তোমায় ;
বুকের উপরে তব গড়িবে কুটীর নব,
লাগিবে না কাদা ধূলা ও কোমল গায়।
যা আছে সকলি দিব, কোলে নিব কাঁধে
নিব,
অবিরাম মহোৎসবে রহিবে হেথায়।
সুখে থাকি দুখে থাকি চাঁদমুখে রাখি
আঁখি,
জুড়াব তাপিত প্রাণ তব করুণায় ;
আয়রে সোণার মেয়ে ধরাধামে আয়।২

আয় আয় আয়,
বহা'তে অমৃতগঙ্গা পাষাণ হিয়ায় ;
আয়রে করুণারাণী প্রেমের প্রতিমাখানি
জুড়াইতে মরুভূমি করুণা-ছায়ায়।
দেখ, ধূমকেতু সম ছুটিছে জীবন মম
এ মহা অনন্ত মাঝে কেন্দ্রহীন প্রায়।
এস তুমি মধ্যবিন্দু প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
বেড়াইব চারি দিকে ঘিরিয়া তোমায়।
আয়রে সোণার মেয়ে ধরাধামে আয়।৩

আয় আয় আয় !
নন্দন সুরভি মাখি সুকোমল গায়,
স্বর্গের সংবাদ দিতে আয় যাদু পৃথিবীতে,
লিখিতে জীবনগ্রন্থে নবীন অধ্যায়।
শিখাতে নিষ্কাম ধর্ম্ম, শিখাতে প্রেমের মর্ম্ম,
আপনা সঁপিয়া দিতে অপরের পায়।
যতই থাকি না কাজে, জাগিবে অন্তরমাঝে
সতত তোমার কথা বিভুপ্রেম প্রায়,
আয়রে করুণারাণি ! ধরাধামে আয়।৪

আয় আয় আয় !
হাসিমুখে হাসাইতে আমা সবাকায়।
আছি মোরা পথ চেয়ে, আয়রে সোণার
মেয়ে,
"করুণা সুন্দরী" নামে ডাকিব তোমায়।
চির-কৃপাময়ী সাজে সাজিও সংসারমাঝে,
যাচি এ করুণা ভিক্ষা বিধাতার পায়।
হ'য়ে চির-গুণবতী, হও তুমি আয়ুষ্মতী,
তিন কুল হোক আলো তোমার প্রভায়।
আয়রে ! সোণার মেয়ে, ধরাধামে আয়।৫

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা দত্ত।

Registered No. C. 134

No. 487-88. March & April. 1904.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত

৪১ বর্ষ। ৪৮৭-৮৮ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সূচী পত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২১
২। কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুসিয়ার সম্বন্ধ ৩২৩
৩। প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রভু ও ভৃত্য ... ৩২৫
৪। আমার দাদা (পদ্য) ... ৩৩১
৫। পত্র ৩৩৩
৬। মিলন (পদ্য) ৩৩৫
৭। নবীন ভারতী ৩৩৮
৮। শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব ... ৩৪২
৯। ঈশ্বরের নামাবলী... ... ৩৪৭
১০। রসায়ন তত্ত্ব—কার্ব্বণ ... ৩৪৮
১১। বিবাহ-বিভ্রাটের উপসংহার... ৩৫২
১২। ভারতীয় পুণ্যনদী ... ৩৫৭
১৩। রেল হওয়ায় তীর্থক্ষেত্রের অপকারিতা ... ৩৬৬
১৪। মহিলার শিক্ষা ৩৬৬
১৫। পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতীর স্মারক কীর্ত্তি ... ৩৬৯
১৬। পাশ্চাত্যের বস্তুজাতি ... ৩৭২
১৭। বিজ্ঞান-রহস্য ৩৭৩
১৮। নূতন সংবাদ ৩৭৪
১৯। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ৩৭৬
২০। বামারচনা—
বাসন্তী নিশায়—প্রান্তরে .. ৩৭৯
নীহারে সিক্ত শুষ্ক গোলাপ ৩৮১
২১। ১৩১০ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮১

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১নং আউটনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-পক্ষেই

বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়।

বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ ইহাতে আরাম হয়, অথচ ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন যাহার আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-অপরিষ্কারে, ধাতুদৌর্ব্বল্যে, অগ্নিমান্দ্যে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, সর্দ্দি, কাশিতে, হাত-পা-চক্ষুজ্বালায়, মাথা-ধরায় ও ঘোরায়, ঠাণ্ডা লাগায়, রাত্রি জাগায়, পথ-শ্রমে, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা তাহার মহৌষধ।

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর, অমাবস্যা-পূর্ণিমার বাতজ্বর, বিষমজ্বর, ঘুষঘুষেজ্বর, দোকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা মহৌষধ। বিজয়া বটিকা আজ সর্ব্বত্র আদৃত, ইংরাজ নরনারীও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৬	।৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১।৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৩৪	৪।০	।০	৶০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

সতর্কতা। বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। গ্রাহকগণ সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া যায় না।

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়্ গ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭৯নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 487-88. — March & April, 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৭-৮৮ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির—গত ৩রা মার্চ্চ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সূচনা উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মিউসিয়ম বাটীতে এক উৎসব হয়, তাহাতে স্থপতি সার উইলিয়ম এমার্সন বাটীর নক্সা প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনও সময়োচিত বক্তৃতা করেন। বাটীটী ব্রিটিশ শাসনের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি হইবে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে ৮ বৎসর এবং অন্যূন কোটি টাকা লাগিবে।

প্রদর্শনী—উক্ত স্মৃতিমন্দিরে যে সকল জিনিষ রাখিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইতেছে। প্রদর্শনী কিছু কাল চলিবে।

তিলকের খালাস—গত ৩রা মার্চ্চ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রী গঙ্গাধর তিলক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী এ সংবাদে আনন্দিত।

পুসা কৃষিকলেজ—গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বঙ্গের ছোট লাট স্থানাদি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভারতের কৃষির উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্ট চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। বর্ণার্ড কভেণ্ট্রি সাহেব এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরিদর্শিকা—বিবী লিলিয়ান ব্রুক ভারতীয় শিক্ষার শ্রেণীস্থ হইয়া বঙ্গদেশের স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেস হইলেন। গবর্ণমেণ্ট

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদিরোগের মহৌষধ।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি সকল রকম রোগ-পক্ষেই
বিজয়া বটিকা মহৌষধ।

কুইনাইনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকা সেবনে সে জ্বর সহজেই দূর হয়।

বিজয়া বটিকার আর এক মহৎ গুণ এই—প্রাণ-সঙ্কট রোগ ইহাতে আরাম হয়, অথচ ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

ডাক্তার এবং কবিরাজে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন যাহার আশা ছাড়িয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, এমন অনেক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সহজ শরীরেও সেবনীয়।

আপনার জ্বর নাই, প্লীহা নাই, যকৃৎ নাই, আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে।

কোষ্ঠ-অপরিষ্কারে, ধাতুদৌর্ব্বল্যে, অগ্নিমান্দ্যে, গা-হাত-পা কামড়ানিতে, শর্দ্দি, কাশিতে, হাত-পা-চক্ষুজ্বালায়, মাথা-ধরায় ও ঘোরায়, ঠাণ্ডা লাগায়, রাত্রি জাগায়, পথ-চলায়, গুরুভোজনে, জলে ভেজায়—অসুখ বোধ হইলে, বিজয়া বটিকা তাহার মহৌষধ।

ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়াজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর, আমাবস্যা-পূর্ণিমার বাতজ্বর, বিষমজ্বর, ঘুষঘুষেজ্বর, দৌকালীন-জ্বর, সকল প্রকার জ্বরে বিজয়া বটিকা মহৌষধ। বিজয়া বটিকা আজ সর্ব্বত্র আদৃতা, ইংরাজ নরনারীও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। বিজয়া বটিকার সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র আছে।

বটিকা	সংখ্যা	মূল	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১॥৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৷৵০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

সতর্কতা। বিজয়া বটিকার অধিক কাটতি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ জাল বিজয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া লোক ঠকাইতেছে এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। গ্রাহকগণ সাবধান! নিম্নলিখিত দুইটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা পাওয়া যায় না।

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান—প্রথম,—আদিম স্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭৯নং হারিসন রোড, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 487-88. March & April, 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৭-৮৮ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিক্‌টোরিয়া স্মৃতিমন্দির—গত ৩রা মার্চ্চ বিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সূচনা উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মিউসিয়ম বাটীতে এক উৎসব হয়, তাহাতে স্থপতি সার উইলিয়ম এমার্সন বাটীর নক্সা প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনও সময়োচিত বক্তৃতা করেন। বাটীটী ব্রিটিষ শাসনের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি হইবে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে ৮ বৎসর এবং অন্যূন কোটি টাকা লাগিবে।

প্রদর্শনী—উক্ত স্মৃতিমন্দিরে যে সকল জিনিষ রাখিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইতেছে। প্রদর্শনী কিছু কাল চলিবে।

তিলকের খালাস—গত ৩রা মার্চ্চ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র গঙ্গাধর তিলক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী এ সংবাদে আনন্দিত।

পুসা কৃষিকলেজ—গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বঙ্গের ছোট লাট স্থানাদি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভারতের কৃষির উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্ট চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। বর্ণার্ড কভেণ্ট্রি সাহেব এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরিদর্শিকা—বিবী লিলিয়ান ব্রুক ভারতীয় শিক্ষার শ্রেণীস্থ হইয়া বঙ্গদেশের স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস হইলেন। গবর্ণমেণ্ট

বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অধিক টাকা দিবেন এবং পরিদর্শিকার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন, ইহা বড় আশার কথা।

রুষ-জাপ যুদ্ধ—মার্চ্চ মাস হইতে জাপানীরা আবার অদম্য বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা কোরিয়ার রাজধানী সিওল হস্তগত করিয়াছেন, পিংইয়াম নগর অধিকার করিয়া তথায় বহুসৈন্য সমাবেশ করিতেছেন এবং পোর্ট আর্থর বন্দর ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া রুসদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। রুসেরাও অসমসাহসে যুঝিতেছেন, কিন্তু এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

প্রধান সেনাপতি—ভূতপূর্ব্ব ভারতের প্রধান সেনাপতি সার পাউয়ার পামরের মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জঙ্গী-লাট লর্ড কিচেনার সুস্থ হইয়া ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিতেছেন।

নূতন আইন—গত ৪ঠা মার্চ্চ "অফিসিয়াল সিক্রেটস্ আক্ট" অর্থাৎ আফিসের গুপ্ত কথা প্রচারের বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা দ্বারা সংবাদ পত্র সকল শঙ্কাকুল হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়াবলী-বিধিও ব্যবস্থাপিত হইল। বঙ্গবিভাগ ও প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ব্যবস্থা এখনও বিবেচনাধীন।

টাউন হলে বিরাট সভা—বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদার্থ গত ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, সভাপতিত্ব এবং অনেক বিজ্ঞ লোক বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্মৃতি-মেডাল—(১) ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরী কলেজের অধ্যাপক বাবু সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০০ টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে "উমেশ চন্দ্র মুখর্জি মেডাল" নামে মেডাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় স্ত্রীলোককে প্রদত্ত হইবে।

(২) স্বর্গীয় বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ তাঁহার পুত্র বাবু সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে ১০০০ টাকা দিয়াছেন, ইহা হইতে স্মৃতি মেডাল প্রদত্ত হইবে।

বেতন বৃদ্ধি—সিংহলের গবর্ণর বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা পাইতেন, এক্ষণ হইতে ৯৬ হাজার টাকা পাইবেন।

হিন্দুসংখ্যা হ্রাস—গত সেন্সসের গণনায় হিন্দুসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ৫০ লক্ষ কমিয়াছে। ৬ লক্ষ হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে, আরও অধিক মুসলমান হইয়াছে, দুর্ভিক্ষে অনেকে মরিয়াছে। হিন্দু জাতির যেরূপ অবনতি হইতেছে, তাহাতে সুসংস্কৃত না হইলে আর উন্নতির আশা নাই।

আমেরিকা যাত্রী ছাত্র—বিক্রমপুরের সুধীন্দ্র বসু কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য শিখিতেছিলেন। ওয়াসিংটন গালডেট কলেজের অধ্যক্ষ বিনা বেতন ও বোর্ডিঙ ব্যয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হওয়াতে গত ৮ই মার্চ্চ তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। মূকবধির-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ যামিনী বাবু ঐ বিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা লইয়া আইসেন।

জাপানের জন্য চাঁদা—যুদ্ধ-হত জাপানীদিগের বিধবা ও অনাথ সন্তান-দিগের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। বোম্বাইয়ের জাপানী রেসিডেণ্ট সোসাইটী ইতিমধ্যে ৩০,৮৮৩৷০ চাঁদা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার সরকার স্মৃতি-সভা—বঙ্গ-দেশের নানা স্থানে এইরূপ সভা হইতেছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে যে সভা হয়, তাহাতে সহরের অনেক গণ্য মান্য লোক মিলিত হন। রেবরেণ্ড ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভা-পতির কার্য্য করেন এবং ডাক্তার গুরু-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর প্রভৃতি প্রস্তাবক হইয়া বক্তৃতা করেন।

সূর্য্যগ্রহণ—গত ১৫ই মার্চ্চ যে সূর্য্য-গ্রহণ হয়, বেলা ১০টা হইতে প্রায় ১॥ পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি দেখা গিয়াছিল। অর্দ্ধগ্রাস হইয়াছিল।

কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুসিয়ার সম্বন্ধ।

সম্প্রতি জাপান ও রুষিয়ার মধ্যে যে মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহার নিমিত্ত কারণ কোরিয়া। এই যুদ্ধের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে কোরিয়ার ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া আবশ্যক। জাপানের ভূতপূর্ব্ব বৃটিষ কন্সল জে এইচ লংফোর্ড "নাইন্টিনথ সেনচুরি" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

অতি প্রাচীন কালের জনশ্রুতি এই যে, জাপান বার বার কোরিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়া জয় করে এবং কোরিয়ার রাজা জাপানের অধীনতা স্বীকার করেন। তৎপরে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন হীদেযীষ জাপানের উপর একাধিপত্য স্থাপন করেন, তখন তিনি কোরিয়ার এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত ধ্বংস করেন। এ সময় চীনেরা কোরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী জাপানকেই বরণ করে। এই সময় হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত কোরিয়া নিয়মিতরূপে জাপানকে কর প্রেরণ করিত, অথচ চীন সম্রাটের আনুগত্যও স্বীকার করিত। ১৮৭১ সালে কোরিয়া বিদ্রোহী হইয়া জাপানকে কর-প্রদানে অস্বীকৃত হয় এবং চীন জাপানকে সভ্যতা-ত্যাগী ও বিজাতীয় আচারব্যবহারাবলম্বী বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এ সময় জাপান অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। আভ্যন্তরিক

রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহার ধনাগার শূন্য হইয়াছিল। তাহার সামরিক বিভাগ নূতন ভাবে গঠিত হইতেছিল। এ জন্য জাপান রাজ্যনাশ ও অপমান সকলই সহ্য করিয়া গেলেন—মনে মনে সংকল্প রহিল ভবিষ্যতে ইহার প্রতিশোধ লইবেন। ১৮৭৫ সালে কোরিয়ানেরা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। একখানি জাপানি (গণ বোট) নৌকা তাহাদিগের কেল্লার ধার দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাহার উপর গোলা বর্ষণ করিল।

জাপানিরা আর সহ্য করিতে পারিল না, জাতীয় ভাবে উত্তেজিত হইয়া এক বৃহৎ যুদ্ধযাত্রা করিল। কোরিয়ানেরা ভয় পাইয়া বিনাযুদ্ধে সন্ধিস্থাপন করিল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে জাপানি প্রজাদিগের বাস ও বাণিজ্যের জন্য কোরিয়া দুইটি বন্দর ছাড়িয়া দিল। ইউরোপীয় জাতি সকল সুযোগ পাইয়া বাণিজ্যের অধিকার চাহিল। অবশেষে কোরিয়া সমগ্র পৃথিবীর অবাধ বাণিজ্যস্থান হইল। জাপানের প্রতি কোরিয়ানদের বিদ্বেষভাব ঘুচিল না। সিওল নগরে জাপানিদের যে ছাউনি ছিল, তাহারা তাহা পোড়াইয়া দিল। জাপানি মন্ত্রী সদল বহুকষ্টে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরে পলায়ন করিলেন। এক বৃটিষ রণতরী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইল। জাপান সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়া সিওল নগরে ছাউনি স্থাপিত করিলেন। ১৮৮১ সালে চীনও এইরূপ অধিকার পাইয়া জাপানিদিগের ব্যবস্থার সমর্থন করিলেন। পরবর্ত্তী ৯ বৎসর কোরিয়াতে নানাপ্রকার গোলযোগ হয়। এই গোলযোগ নিবারণার্থ চীনমন্ত্রী লিহংচং বৃহৎ একদল সৈন্য পাঠান। জাপানিরাও সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন। জাপানিরা রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন এবং শাসনপ্রণালী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কোরিয়ার উপর চীনের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিলেন। চীন-জাপান যুদ্ধ ইহারই অব্যবহিত ফল। জাপানিরা জল ও স্থল যুদ্ধে চীনকে পরাস্ত করিয়া সন্ধিগ্রহণে বাধ্য করেন। এই সন্ধির একটী নিয়ম এই যে, চীনেরা কোরিয়ার উপর কোনও দাবী দাওয়া রাখিবে না। কোরিয়ার রাজা ও রাণী নামে রাজা, জাপানি প্রভুদিগের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের মনোবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। জাপানি সৈন্যদিগের উত্তেজনায় একটী শোচনীয় বিদ্রোহ ঘটিল। বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাণী ও তাঁহার কতকগুলি আত্মীয়কে হত্যা করিল। রাজা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া রুসিয়া ছাউনির আশ্রয় লইলেন। রুসিয়া তখন কোরিয়া হইতে বহুদূরে ছিল; চীনের পতনে মেনচুরিয়া অধিকারের আশায় রাজাকে অভয়দান করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। রাজা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য রুসিয়াকে কোরিয়ার রক্ষকরূপে বরণ করিলেন। জাপান মনে মনে বিরক্ত হইয়া স্তম্ভিতভাবে উপস্থিত

ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। পরে রুসিয়ার সহিত কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইবার সন্ধি বন্ধন করিলেন। ১৮৯৬ সালের সন্ধিতে স্থির হয় যে, যে পর্য্যন্ত কোরিয়াতে শান্তি স্থাপিত না হয়, রুসিয়া ও জাপান আপনাপন কুঠি (Settlement) রক্ষার্থ সিওল ও প্রধান প্রধান দুই বন্দরে আটশত করিয়া সৈন্য রাখিতে পারিবেন এবং তদ্ব্যতীত জাপান চিন-সংগ্রামকালে প্রস্তুত আপনার টেলিগ্রাফ লাইন রক্ষার্থ দুইশত পুলিস সৈন্য রাখিতে পারিবেন। এ সময় রুসিয় প্রজা ও কুঠি কোরিয়াতে ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু জাপানের ২৩ হাজার প্রজা ছিল এবং ইহার বিদেশীয় বাণিজ্যের বারো আনা তাহারই হস্তে। ১৮৯৮ সালের সন্ধিতে উভয়েই কোরিয়াকে স্বাধীন রাখিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। রুসিয়া আরো স্বীকার করেন যে, জাপান ও কোরিয়ার মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত করিবেন না। ১৮৯৬ সালে রুসিয়া মেন্‌চুরিয়ার সীমায় কোরিয়ার পার্শ্বে কাষ্ঠ কাটিবার অধিকার পান। সেই সূত্র ধরিয়া রুসিয়া ইয়ালো নদীর উপত্যকা অধিকার করেন এবং কোরিয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া রাস্তা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ নির্ম্মাণ এবং রুসিয়ার কার্য্যের সহায়তার জন্য ভূমি গ্রহণ বা অন্য যে কোন উপায় আবশ্যক তাহা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ইয়ালু নদীর মুখের নিকট একটী রুসিয় কেল্লা ও তাহাতে কামানশালা স্থাপিত হইল। জাপানের ভয় হইয়াছে রুসিয়া মেনচুরিয়া গ্রাস করিয়া কোরিয়াও গ্রাস করিবেন। কোরিয়া হারাইলে জাপানের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বিলুপ্ত হইবে। জাপান এইজন্য কোরিয়া হইতে রুসকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। ইহা হইতেই বর্ত্তমান রুস-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রভু ও ভৃত্য।

(গত প্রকাশিতের শেষ)।

উচ্চশ্রেণীর লোকের ভৃত্যের প্রতি পূর্ব্বভাব লোপের আর একটী কারণ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকার পারিবারিক বন্ধন এখন বড় শিথিল হইয়া গিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা এখন অনেকটা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে এবং তার চেয়ে অনেক দিন আগেও ব্যবসা বা চাকরির জন্য লোকের বিদেশে যাওয়া বড় কম ছিল। দুই দশ জন লোককে অবশ্য যাইতে হইত, কিন্তু তাঁহারা মুষ্টিমেয় ছিলেন। ইংরাজশাসন বদ্ধমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা কর্ম্ম

কাজের বিস্তার হইল, ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি নানা স্বাধীন ব্যবসার সৃষ্টি হইল এবং উদরান্নের জন্য অনেক লোককে পৈতৃক বাটী ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে হইল। সময় যত যাইতেছে, এই প্রথা তত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথম প্রথম ইহাতে পারিবারিক বন্ধন তত শিথিল হয় নাই, কারণ ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে বিদেশে যাইলেও স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। যাঁহারা বিদেশে থাকিতেন, সুবিধা পাইলেই তাঁহারা দেশে আসিতেন। পূজার সময় বোধ হয় অল্প লোকের ভাগ্যেই বাড়ী না আসা ঘটিত এবং যাঁহারা কার্য্যগতিকে আসিতে পারিতেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করিতেন। মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য পরিজনবর্গ পথ চাহিয়া থাকিতেন। "বাবু"রা বাড়ী আসিতেছেন, ইহাতে বাড়ীর লোক জনেরও আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। যাঁহার বাড়ীর প্রতি টান আছে, বাড়ীতে যাঁহার যাওয়া আসা আছে, তাঁহার বাড়ীর ভৃত্য ভৃত্যার প্রতিও টান থাকে। বিজয়ার দিন যখন পূর্ব্বে সকল আত্মীয় স্বজন মিলিয়া উৎসব করিতেন, সে উৎসবের অংশ ভৃত্যেরাও পূর্ণ মাত্রায় পাইত। প্রৌঢ়বয়স্ক অনেকেরই মনে থাকিতে পারে, বাড়ীর বা পাড়ার পুরাতন ভৃত্যদের সহিত তাঁহারা কত আগ্রহের সহিত বিজয়ার কোলাকুলি করিয়াছেন।

কিন্তু এখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে সব লোককে আজকাল বিদেশে থাকিতে হয়, তাঁহারা অনেকেই পরিবার লইয়া থাকেন। নিতান্ত যাঁহাদের অবস্থায় কুলায় না, তাঁহারাই কেবল পরিবার "দেশে" রাখিতে বাধ্য হন। ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যই হউক, আর নিজের স্বচ্ছন্দের জন্যই হউক, পরিবার সঙ্গে রাখার প্রথাটা এখন বহুল প্রচলিত। এই প্রথার এক অবশ্যম্ভাবী ফল "দেশের" প্রতি মমতার হ্রাস। এখন আর লোকে ছুটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন না। ছুটী হয় ভালই, নতুবা চারা কি? বাটী যাইবার এখন আর তত আগ্রহ অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যাহাদের জন্য বাড়ী যাওয়া, তাহাদের সকলেই বা অধিকাংশ যখন সঙ্গে রহিল, তখন আর বাড়ীর জন্য, গ্রামের জন্য মন কেমন করিবে কেন? এই কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বাড়ীর ভৃত্যদের প্রতি পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহাও এই সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। অবস্থাটা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকে বৎসরান্তে পূজার সময় একবার বাড়ী যাওয়াও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাহার অর্থের অনাটন, কাহার আলস্য, কাহার বা দেশের ম্যালেরিয়ার ভয়। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, তাঁহাদিগের অনেককে পূজার সময় হাওয়া খাইতে যাইতে দেখা যায়। যাঁহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া সহরে থাকিতে হয়, সেখানে অবশ্য তাঁহারা অবস্থানুযায়ী লোকজন রাখেন, কিন্তু সহরে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ

চুক্তিমাত্র, উভয়ের মধ্যে মমতা জন্মান অসম্ভব। প্রভুর একটু অসুবিধা হইলেই চাকর বদলান এবং চাকরের একটু পানেতে চুণ খসিলেই সে চলিয়া যায়। কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের মধ্যে কতক অংশ গবর্ণমেণ্টের চাকরি করেন। যাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী, তাঁহাদিগের কতক অংশকে আবার এ জেলা ওজেলা ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সেই জন্য তাঁহাদিগকে অনেক বার লোকজন বদলাইতে হয়। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় গেলেন, পুরাতন লোকজন কেহ সঙ্গে গেল না, নূতন স্থানে আবার নূতন লোক রাখিতে হইল। ইঁহাদের ও ইঁহাদের ভৃত্যদের মধ্যে কোনরূপ স্নেহবন্ধন এক প্রকার অসম্ভব বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এক প্রকার শেষ হইল। আরও অনেক কথা বলিবার থাকিতে পারে এবং আছে বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা আমার ক্ষমতাতীত। আমার বিদ্যা শেষ হইয়াছে। তবে একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক। উপরে অনেক সামাজিক, অনেক মানসিক পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের কি ফল আমার ক্ষমতানুসারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমার মত এই যে, এই সব পরিবর্ত্তনের গতি মন্দের দিকে বা ইহার সব মন্দ। ইহা আমি কখনই বলিতে পারি না। বরং আমার বিশ্বাস যে, অনেকগুলি পরিবর্ত্তন ভালই। দুই একটার কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নিম্নশ্রেণীর লোকের মনে যে আত্মসম্মানের বোধ জন্মিতেছে, তাহা একটা সামাজিক মঙ্গলের লক্ষণ। অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ তাহারা যে দূরদূরান্তরে যাইতেছে, তাহাও একটা বিশেষ সুলক্ষণ। অপর দিকে শিক্ষিত বা উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক যে বিদেশে যাইতে হইলে এখন প্রায় পরিবার সঙ্গে লইয়া যান, এই নূতন প্রথাটী সুবিবেচিত বলিয়া মনে হয়। ইহা যে সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। অবস্থাপন্ন বা মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোক যে স্বাস্থ্যোদ্দেশে আজকাল সুবিধা পাইলেই স্বাস্থ্যকর স্থানে যান বা যাইবার চেষ্টা করেন, তাহাও মঙ্গলময় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে সকল পরিবর্ত্তনেরই—বস্তুতঃ সকল জিনিষেরই দুই দিক্ আছে। মর জগতে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন ভাল নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমায় কতকগুলি সামাজিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের দুই একটা কুফলের কথা বলিতে হইয়াছে। একটা প্রথা বা অবস্থার নানা ফল, কতকগুলা সু, কতকগুলা কু। একপ্রকার ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাকে হয় বড় মন্দ, নয় বড় ভাল মনে হইবে। মোটের উপর উহা ভাল কি মন্দ স্থির

করিতে হইলে উহার কুফল বেশী কি সুফল বেশী, ইহাই দেখিতে হয়। এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে কোন একটা প্রথার বা পরিবর্ত্তনের ফল যদি সু অপেক্ষা কু বেশী হয়, তাহা হইলেও অনেক সময় সমাজ উহা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

প্রবন্ধ কতকটা বড় হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা কথা বলিয়াই ইহার উপসংহার করিব। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বিষয়ে বর্ত্তমান কালে যে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার কি কোনও প্রতীকার আছে? সমাজনীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা যায়, তাহা আর প্রায় ফিরে না। একটী প্রথা বা অবস্থা কারণসমবায়ের ফল। সমাজ সদা পরিবর্ত্তনশীল। কোন সমাজে পরিবর্ত্তনের গতি দ্রুত, কোন সমাজে মৃদু এইমাত্র প্রভেদ। সেই জন্য এক সময়ে বা এক সমাজে যে কারণসমষ্টি উপস্থিত থাকে, অন্য সময়ে বা অন্য সমাজে ঠিক্ সেই কারণসমষ্টির উপস্থিতি এক প্রকার অসম্ভব। কাজে কাজেই কোন একটী বিশেষ প্রথা বা অবস্থা একবার চলিয়া গেলে আর তাহা প্রায় ফিরিয়া আসে না, এবং একটা প্রথা বা অবস্থা চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত সুফল ও কুফল চলিয়া যায়। প্রথা বা অবস্থা অন্তর্হিত হইল, কিন্তু আমরা তার সুফলগুলিকে তার সঙ্গে যাইতে দিব না, ইহা একবারেই অসম্ভব। অবস্থাবিশেষে এক সমাজে আতিথেয়তা বড় প্রবল হয়। যদি তাহার অবস্থান্তর হয়, সেই সঙ্গে আতিথেয় প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। প্রবৃত্তিটী খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্কীর্ণ মানবহৃদয়ে প্রবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক প্রবৃত্তিকে, তাহা সুই হউক আর কুই হউক, স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। অবস্থাবিশেষে সমাজ নিষ্ঠুরতা-পূর্ণ হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক, সেই সমাজেরই লোক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি করিয়া এত নিষ্ঠুর ছিল বুঝিতে অক্ষম হইবে। এই সব কারণে আমার মনে হয় যে, যে অবস্থায় আমাদের সমাজে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কে বেশ একটু মধুরত্ব ছিল, অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরত্বের নিকট আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে। যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিবার নয়।

উপরে যে উত্তর দেওয়া গিয়াছে, তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে, অনেকের ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে। আমার নিজের উত্তর যদি ভুল হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইব, কিন্তু আমারত উহা ভুল বলিয়া মনে হয় না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আমরা সকলে যদি চেষ্টা করি, তাহা হইলে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ যে চুক্তিমাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে, হৃদয়ের ছায়া উহা হইতে যে একবারে চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা কতক নিবারিত হইতে পারে। আমাদিগের নিজকে এরূপ

শিক্ষা দিতে হইবে যে, আমরা যেন কখন ভুলিয়া না যাই যে, আমাদের লোকজন আমাদেরই ন্যায় মানুষ, জন্তু নয়, কল নয়। তাহাদের সুখ দুঃখ আছে, অভাব আকাঙ্ক্ষা আছে এবং সেই সকলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদের অধীন, তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার—তাহাদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ মনুষ্যত্ব-বিহীনতার চিহ্ন। সকলের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের পক্ষে ভালবাসা যে এক প্রধান সহায়, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। কবি বলিয়াছেন:—

কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট,
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?

* * * *

ধরা চায় সরল হৃদয়-রস।

এই অমূল্য কথাগুলি যদি আমরা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখি, তাহা হইলে হৃদয়ের শিক্ষা অনেক সময় সহজ হইয়া পড়িবে। ভাল ব্যবহার চাই, ভাল কথা চাই, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমরা যদি আমাদের অনুচরবর্গের প্রতি স্নেহনেত্রে দেখিতে আরম্ভ করি, আমাদের ছেলে মেয়ের পক্ষে উহা অনায়াসসাধ্য হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে যাইতেছিলেন। পথে তাঁর পূর্ব্ব-পরিচিত রামধন মুদিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে 'রামধন খুড়া' বলিয়া তার কাছে উপস্থিত হইলেন। রামধন তার দোকানের সম্মুখে ঘাসের উপর চট বিছাইয়া দিল, বিদ্যাসাগর তার উপর বসিয়া তার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। তার পর সেই দিকে যাইলেই তিনি তার সংবাদ লইতেন। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন। সকলের পক্ষে বিদ্যাসাগর হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব তাঁর এই সহৃদয় ভাব অনুকরণ করিতে পারিলে কি একটু ভাল হয় না? একজন ইংরাজ মুনীব তাঁর দেশীয় ভৃত্যবর্গকে যে চক্ষে দেখেন, সে চক্ষু আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

আর এক কথা। দেশকাল পাত্রভেদে ব্যবহারের তারতম্য হওয়া উচিত। নিম্নশ্রেণীর লোকের এখন আত্ম-সম্মান বোধ জন্মিতেছে। তাহাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার এরূপ হওয়া উচিত যে, ঐ আত্ম-সম্মান বোধে আঘাত না লাগে। তাহাদের চাল চলনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের স্বচ্ছন্দ বোধ বেশী হইয়াছে, এ কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এমন লোক অনেক আছেন, একজন চাকর জুতা পরিলে বা পিরাণ গায়ে দিলে তাঁহাদের গায়ে তপ্ত জলের ছড়া পড়ে। এরূপ হইলে আজকাল চলিবে কেন?

চাকরদের বেতন সম্বন্ধেও মুনীবদের বিবেচনা করার সময় হইয়াছে। একজন ঝির ২।৩ টাকা বা একজন ভৃত্যের ৩।৪ টাকা বেতন কম বলিয়া মনে হয়। ঝির বাড়ীতে তার ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় স্বজন আছে, চাকরের পরিবারবর্গ আছে। আজ কালকার দিনে সামান্য বেতনে তাহাদের

চলা অসম্ভব। কাজে কাজেই তারা সহজে চাকরি করিতে চাহে না। প্রভু-শ্রেণীকে অনেক উপদেশ দেওয়া গেল। মাত্রা বেশী হইলে তাঁরা চটিয়া যাইবেন। ভৃত্যশ্রেণীকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত কি? উচিত হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, কারণ তারা যে বামাবোধিনী পাঠ করে, অদ্যাবধি আমি সে প্রমাণ পাই নাই। তবে আমার বিশ্বাস মুনিবেরা তাহাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করিলে ও সহানুভূতি দেখাইলে অল্পে অল্পে তাঁহাদের প্রতি তাহাদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। ভাল পরিবারের মধ্যে থাকিতে পাইলে তাহাদের মনের ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন হইবে। সকল কাজের আরম্ভই কঠিন এবং একটা সৎ-কার্য্যের আরম্ভ শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরই করিতে হইবে।

বামাবোধিনীর পাঠিকাবর্গকে দুই একটী কথা বলিয়া সত্য সত্যই প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব। যে সব বিষয়ে হৃদয়ের প্রাধান্য, তাহাতে স্ত্রীলোকের অগ্রসর হওয়া দরকার। যদি প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের উন্নতি করিতে হয়, যদি উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের ইহাতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বাড়ীর গৃহিণীর যদি চাকরদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহারে আপত্তি থাকে, প্রত্যেক হাতে যদি তিনি উহার প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে কর্ত্তা বেচারীকে দায়ে পড়িয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে, পুত্র কন্যারা তাঁর সস্নেহ আচরণের অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং তাঁর কোমল ব্যবহার চাকর চাকরাণীকে আজ হউক কাল হউক বা দশ দিন পরেই হউক বশীভূত করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে। আমার পরিচিত এক হিন্দু পরিবারের কর্ত্তা ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ও বড় সেক্‌সপিয়ার-ভক্ত ছিলেন। অনেক সময় সন্ধ্যার পর কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে পরিবারবর্গকে তিনি সেক্‌স্‌পিয়ার অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। মুখে মুখে অনুবাদ কালে যদি কখন তিনি "দাসী" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার গৃহিণী তখনই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন "আহা 'দাসী' শব্দটা বড় রুক্ষ, উহা ব্যব-হার কর কেন, 'ঝি' শব্দ বেশ কোমল, উহা ব্যবহার করা উচিত।" আমার মনে হয় এই গৃহিণীর ছেলেপিলেরা বাল্য-কাল হইতেই পরিজনের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতে অনভ্যস্ত হইয়াছিল। সকল সুশৃঙ্খল সংসারে গৃহিণীর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। তিনি যদি কোন আচরণের প্রতিবাদ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ভরসা কাহারও হয় না। মনে করিলে গৃহস্বামিনী বাড়ীর সকলকে উপরি-উক্তরূপে সংযত করিতে পারেন। সেই জন্য বামাবোধিনীর পাঠিকাসকলকে আমার সানুনয় নিবেদন প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধের উৎকর্ষসাধনে তাঁহারা বিশেষরূপে যত্নবতী হউন।

দ।

আমার দাদা।*

১

দাদা! চলিলে কোথায়?—
মহা সর্ব্বনাশ করি
এ সর্ব্বস্ব পরিহরি,
জননী, ভগিনী, জায়া, পুত্র, কন্যা তা'য়;
সুখময় ঘর বাড়ী,
সাধের সাগরদাঁড়ী
অবহেলে সব ফেলি ধূলামুঠি প্রায়,
উদাসীন বেশে দাদা! চলিলে কোথায়!

২

দাদা! চলিলে কোথায়?—
সুখের জীবন তব,
নিত্য সুখ নব নব,
এমন জীবন নরে কত পুণ্যে পায়!
সৌম্য মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তিভরা,
রাজ-সভা আলো-করা,
সদা হাসি, কথা মাখা স্নেহ-মমতায়;
চরিত্র কলঙ্কহীন,
সুস্থ, শুদ্ধ চিরদিন,
এহেন জীবন আহা, কত পুণ্যে পায়,
তবে হেন অনায়াসে চলিলে কোথায়!

৩

দাদা! চলিলে কোথায়?—
মা তোমার অভাগিনী,
শোকতাপে পাগলিনী,
একমাত্র তুমি তাঁর আঁখি-তারা প্রায়!
তুমি যে দীনের রত্ন,
তাই মা'র হেন যত্ন,
অনাহারে অনিদ্রায় রক্ষিছে তোমায়!
দেবতার পায়ে পড়ি,
দিতেছে মা গড়াগড়ি,
তোমার আরোগ্য আয়ু দিবা নিশা চায়;
সে তীব্র তপস্যা-তাপে
ব্রহ্মাণ্ড আতঙ্কে কাঁপে,
হিমাদ্রির উচ্চ চূড়া গুঁড়া হয়ে যায়,
কোন্ রাহু পারে দাদা গ্রাসিতে তোমায়!

৪

দাদা! চলিলে কোথায়?—
আমি যে দিয়াছি ফোঁটা,
"যমের দুয়ারে কাঁটা,"
সে দিন কার্ত্তিক মাসে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়;
না হ'তে ছ'মাস পূর্ণ,
সে দর্প কি হবে চূর্ণ,
সবি কি হইবে শূন্য মাঘী পূর্ণিমায়!
আমি নিজ আয়ু দিব,
দাদা! তোমা বাঁচাইব,
থাক তুমি মা'র কোলে অমৃতের ছা'য়!
যেওনা যেওনা ভাই,
আর সহোদর নাই,
কেমনে সান্ত্বিব তব অভাগিনী মা'য়!
এক মাস রোগাতুর, যাবে বা কোথায়?

* আমার দাদা—স্বর্গীয় প্রমথমোহন দত্ত চৌধুরী ১৩১০ সালের ১৮ই মাঘ, মাঘী পূর্ণিমার পবিত্র দিনে, দিবা ২টার সময়ে, পরলোকে গমন করেন। লেখিকা।

৫

দাদা! চলিলে কোথায়?—
উঠ দাদা! উঠ ভাই,
ভাই বোনে ঘরে যাই,
তুমি যে চাহিলে ভাত—কাতর ক্ষুধায়!—
ফেলি সব বিঘ্ন বাধা,
আমি ভাত দিব দাদা,
কেন তুমি রাগ কর তব অনুজায়?
অই যে মা অভাগিনী,
বিবসনা পাগলিনী,
ডাকিছে আকুল রবে "বাবা বুকে আয়!"
বউ যে ভূতলে পড়ি,
যাইতেছে গড়াগড়ি,
ভূপেন নৃপেন কাঁদে অনাথের প্রায়।
তোমার স্নেহের মেয়ে,
কাঁদিছে আছাড় খেয়ে,
বালিকা বউ-মা কাঁদে লুটিয়া ধরায়;
প্রতিবাসী বন্ধুজন,
জ্ঞাতি, ভৃত্য, প্রজাগণ
সকলে নয়ন-জলে ধরণী ভিজায়।
এত করে কাঁদাইয়া,
সুখী হবে কোথা গিয়া,
তোমার কোমল হিয়া ভরা মমতায়,
তবে নিঠুরের মত চলিলে কোথায়?

৬

দাদা! চলিলে কোথায়?—
ভেঙে গেল প্রাণ মন,
আর নাই ভাই বোন,
কেমনে বাঁচিয়া রব, হারায়ে তোমায়!
তোমাহীন বাড়ী ঘরে,
রহিব কেমন করে,
দিন রাতি কাটাইব কার শুশ্রূষায়?—
চিকিৎসক প্রাণপণে
যুঝিলা শমন সনে,
কত যে বিনিদ্র আঁখি রক্ষিলা তোমায়—
সব শক্তি অবহেলি,
সজাগ পাহারা ঠেলি,
কে চোর অলক্ষ্যে তোমা হরি লয়ে যায়,
এত অপমান দাদা, কার সহে গায়?

৭

দাদা! চলিলে কোথায়?—
আজি জানিলাম ঠিক্,
মানব-জনমে ধিক্,
অশক্তা অধমা আমি তৃণকণা প্রায়;
যদি নিজ আয়ু দিয়া,
দাদা, তোমা বাঁচাইয়া,
মরিতাম মা'র কোলে, কি আনন্দ তায়!
পাশবদ্ধা সিংহী সম,
বৃথা আকিঞ্চন মম,
আস্ফালি তরঙ্গ বৃথা মিলিল বেলায়?
এ বিশ্ব ভোজের বাজি—
মরণের কারসাজি,
খেলার পুতুল মোরা, হাসায় কাঁদায়!
বিধির বিধান শুধু সত্য এ ধরায়!

৮

—চলিলে কোথায় দাদা! চলিলে
কোথায়?—
বলে যাও কোথা গেলে
জগতের সব ফেলে,
কোন্ খানে রবে এবে কিবা স্নেহ-ছায়?
বুঝি যাঁরে নিত্য নিত্য,
পূজিয়াছ ভরি চিত্ত,
ডাকিয়াছ নিরবধি যেই দেবতায়;
আজি এ রোদন-রোলে,
অভ্রভেদী হরিবোলে,
গেলে বুঝি তাঁরি কোলে, অমৃত-শয্যায়?
তবে দাদা! তব ঠাঁই,
জন্মের বিদায় চাই,
যাও গো দেবতা তুমি ত্রিদিব বথায়;
একেলা রহিনু ভবে,
জানি না কোথায় কবে
অভয়-আশ্রয় তব পাব পুনরায়।—
যাও গো বাবার কাছে, যাও অমরায়।

অভাগিনী
শ্রীমা—

পত্র।

(৪৮৪ সংখ্যা—২৪২ পৃষ্ঠার পর)।

প্রায় বৈকাল ৫টা "বীণা" ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল। এখান হইতে আর পশ্চিমের হিন্দুস্থানী বা বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দেখা যায় না। সর্ব্বত্র দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় লোক নিযুক্ত। পরিধানে লম্বা ধুতী, গলা-খোলা কোট, মাথায় টুপি, বৃহৎ শিখা লম্বমান, পায়ে চটি জুতা। এতদ্ব্যতীত গোয়ালিস বটলর খানসামা—কতকটা বাঙ্গালীর মত চেহারা, পরিধানে কোট প্যাণ্টুলন, মাথায় বাঁকা সিঁতি ও খোলা পা, বৈকালে কচা টোষ্ট ইত্যাদি লইয়া গাড়ীর নিকট অভ্যর্থনা করিতেছে। এখানে অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ ট্রেণ থাকে। জলযোগের পালা শেষ হইল, আবার দৌড়। ক্রমে দিনমণি বিদায়োন্মুখ, সন্ধ্যার আঁধারে ধরণীর মুখ ঢাকিয়া গেল। চন্দ্রমার কোমল কিরণ আকাশের গায় ফুটিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার আলোক দেখিয়া ক্ষুদ্র তারকাদল ছোট ছোট মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির নিকট চন্দ্রের আগমন জানাইতে লাগিল। আমাদের কম্পার্টমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে আলোকিত। আলোকে থাকিয়া দুই ধারি বনপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল আঁধারের লীলা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। সে আঁধারের বক্ষোভেদ করিয়া কেবল খদ্যোতিকা মাঝে মাঝে সন্তরণ করিতেছিল। রাত্রি ৯টার সময় ভূপালে উপনীত। এখানে সাহেবদের ডিনার (বড় হাজিরা) হয়। এখানে আমার সহযাত্রিণীগণ বেশপরিবর্ত্তন ও কেশবিন্যাস করিয়া প্রস্তুত হইলেন। অন্য গাড়ী হইতে তাঁহাদের স্বামীরা আসিয়া আহ্বরে লইয়া গেলেন। আমরাও ইত্যবসরে গাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া সারিলাম। অপর সকলেই আপন আপন শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন; কিন্তু নামা উঠার কার্য্য বন্ধ রহিল না। এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। ভোর ৭॥ টায় মনমারে গাড়ি পৌঁছিল। মান্দ্রাজযাত্রীরা এইখানে গাড়ী বদল

করিলেন। এখন আমরা ক্রমেই বম্বের নিকট হইতেছি। এইবার চন্দ্রদেবকে বিদায় দিয়া সূর্য্যদেব ধরায় উপস্থিত। প্রভাকরের স্বচ্ছ কিরণমালা উষাবালার কোমল বিকাশে ধরিত্রীর মৃণালগ্রীবায় পতিত হইল, অমনি সমস্ত জগতের হৃদয় আবার নবোদ্যম নবোৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

এইখান হইতে পথের নূতন শোভা, নূতন সৌন্দর্য্য নয়নে পতিত হইল। আর যেন আঁখি ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। এই সকল ভূভাগ সমতল প্রান্তর নহে, এখান হইতে পাহাড় কাটিয়া রেলপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই পার্ব্বতীয় বনপথের ক্রোড়দেশ দিয়া ট্রেণখানি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। পথিক এক মুহূর্ত্ত যে চক্ষু মেলিয়া সে সুখ উপভোগ করিবেন, তাহার যো নাই। এই উচ্চ নীচ আঁকা বাঁকা প্রস্তরময় প্রকৃতির বদন আড়ম্বরবিহীন ও অলঙ্কারশূন্য। হেথায় পুষ্পসৌরভও নাই। পৃথিবী-বক্ষ-বেষ্টিনী আদরিণী লতামালা বিরল। নির্জ্জন বনপথ ও গম্ভীরা প্রকৃতির মুখ। সেই পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে নবীন ও প্রাচীন বৃক্ষগুলি ঊর্দ্ধমুখে সেই বিশ্ব-দেবের করুণা চিন্তা করিতেছে, যোগী যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তপস্যা সাধিতেছে। এই সকল পর্ব্বতমালার গম্ভীর শান্ত শোভা দেখিয়া ঈশ্বরের কত কি বৈচিত্র্য-লীলার পরিচয় হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। 'কিন্তু পরিবর্ত্তনময় জগতের নিয়মানুসারে এই শুষ্ক লীলাময় ভূখণ্ডের আবার পরমমোহিনী মূর্ত্তি উদিত হয়। স্নিগ্ধ বর্ষাকালে বর্ষার নির্ম্মল বারি প্রভাবে এই পর্ব্বতশ্রেণীর একেবারে বিভিন্ন রূপান্তর দৃষ্ট হয়। চূড়াদেশ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত শ্যামল গুল্মলতা নানাবিধ দূর্ব্বাদলে একেবারে আচ্ছাদিত হয়। সে সময় ইহাকে ওষধি বনস্পতির পর্ব্বত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উপরে কৃষ্ণ-মেঘ চন্দ্রাতপ, বারিধারা যেন মুক্তাঝালর-বৎ সেই শ্যামল গাত্র বহিয়া ঝর ঝর বেগে চলিয়াছে। সেই বিমল শোভা এখনকার সঙ্গে তুলনা করিলে অনুভবে আইসে না।

ক্রমে ট্রেণখানি গন্তব্য স্থানের নিকট হইতে লাগিল। এই স্থান হইতে বম্বে পর্য্যন্ত ক্রমাগত বারটি টনেল পার হইয়া আসিতে হয়। সেই নিবিড় ঘন আঁধারে গাড়িখানি পড়িবামাত্র মেম সাহেবটি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চক্ষু বুজিয়া লইলেন। তাহার খেয়াল দেখিয়া বেশ আমোদ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে আর একবার আসিয়াছিলেন। অনেক স্থলে গাইডগিরিও করিতেছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, আমরা ১টার সময় বম্বে পৌঁছিলাম। প্রথমে দেখিলাম অদূরে কেবল নারিকেল বৃক্ষের বন ও এক দিকে সমুদ্রের অগাধ জলরাশি বহিয়া যাইতেছে। সেই অনন্ত পারাবারের অম্বুরাশি দেখিয়া প্রাণে যেন সজীবতার সঞ্চার হইল। অভিনব দৃশ্যের শোভার আশায় দুধারি সমুৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

বম্বের দ্বারদেশ কেবল শত শত মিলের স্তম্ভে পরিশোভিত। (ক্রমশঃ

মিলন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(শয়ন কক্ষে লাবণ্যবতী ও চপলা)

চপলা।

কেন আজ ম্লান মুখ বিষণ্ণ চাহনি,
আত্মহারা কোন্ দুঃখে,
রহিয়াছ অধোমুখে,
বাজিছে পরাণে কিবা বিষাদ-রাগিণী,
কি ব্যথা বাজিছে বুকে বল গো স্বজনি ?
আজন্ম লতার মত বেড়িয়া তোমারে
রয়েছে জীবন মম,
ধ্রুব তারকার সম,
একমাত্র আলো-কণা তুমিই আঁধারে,
মোর জুড়াবার স্থল এ বিশ্বমাঝারে।
অভাগিনী পিতা মাতা হারানু শৈশবে,
তুমিই সোদরা প্রায়
দুঃখিনীর এ ধরায়
নতুবা ধূলির সাথে মিশিতাম কবে,
কেন তব কথা মোরে লুকাতেছ তবে ?
বেশী দিন নাহি আর, মন্দোর-কুমার,
এ তব বিরহ-ব্যথা
ঘুচাবেন আসি হেথা,
চিরসুখী হবে সখি ! জীবন তোমার।
ওকি কেন ম্লান মুখ, চোখে অশ্রুধার ?
কি দুঃখ বেদনা সখি ! পাইলে পরাণে ?

লাবণ্যবতী। "ও কথা বলোনা আর,
মোর কাছে বার বার,
অশনীর মত মোর বাজিছে শ্রবণে,
অশান্তির কালো ছায়া ঢাকিছে নয়নে।"

চপলা। "তবে মন্দোর-কুমারে সখি !
বাস নাকি ভাল ?
আর কারে প্রাণ মন
করেছ কি সমর্পণ,
তাই কি অশান্তি-ছায়া ভাসিতেছে কালো,
মিনতি করি গো সখি ! কে সে মোরে বলো ?
তাই বুঝি লাজ-রক্ত মলিন মু-খানি,
কম্পিত অধর-তলে
মৃদু হাসি খেলে ছলে,
নব অনুরাগে সখি ! মগন আপনি,
কোন্ স্রোতে ছুটিতেছে কাহার বাহিনী ?
একি কণ্ঠহার সখি ! কোথায় তোমার ?
কোন্ চোরে করে চুরি,
কার বল এ চাতুরী ?
এ দশা করিল হেন প্রেম-প্রতিমার,
চিরসুখী ভাগ্যধর কেবা সে ধরার ?"

লাবণ্যবতী।

"বলি তবে সখি ! তোরে সেই একদিন,
সীমান্তের শৈশবের,
উপকূলে কৈশোরের,
সবি হেরি চারু ছবি সকলি নবীন,
সবি নব পুলকিত, ম্লান-ছায়া-হীন।

সহসা আঁখির পথে কে হল পথিক,
সখি! যাঁর যশোগান,
শুনিয়া মোহিত প্রাণ,
যাঁহার বীরত্ব-কথা ঘোষে চারি দিক্,
সেই শেষে হল এসে নয়নে পথিক।
কি করে অবোধ হিয়া রাখিব বাঁধিয়া?
তাই দেহ প্রাণ মন
করিয়াছি সমর্পণ,
তাই সখি! সর্ব্বত্যাগী সে প্রেম লাগিয়া,
এই দেখ বীরমূর্ত্তি নয়নে চাহিয়া।
বলিয়া গৌরবভরে খুলি কণ্ঠহার,
সুবর্ণ কবচ পরে,
বীরমূর্ত্তি শোভা করে,
সম্মুখে ধরিল বালা, সখীর তাহার,
নয়নে পলক নাহি পড়ে চপলার।"

চপলা।

"একি দেবি! মনে হয় সকলি স্বপন,
এ মুখের ছায়া প্রায়
এখনো মানসে ভায়,
আহত ছিলেন সেই প্রাসাদে যখন,
হেরেছি সে অতিথিরে, করেছি যতন।
ছি ছি সখি! কি করিলে, কুল-গর্ব্ব হায়,
কি করে ভাঙ্গিলে বল,
এ যে সখি! হলাহল?
দিবে কি ভিখারী-করে জনক তোমায়,
হারাইলে আপনারে ক্ষুদ্র নারী প্রায়।"—

লাবণ্যবতী।

"কি বলিস্ চপলারে, ভিখারী এ জন?
কোন্ রাজপুত-করে
হেন অসি শোভা ধরে?
কার যশোরশ্মি আজো পরশে গগন?
হেন রূপ বীর্য্য ধরে ভিখারী কখন?
অন্ধ ও নয়ন তোর নাই কণা জ্যোতি
পূগল-নন্দন-জয়
গাহে চরাচর ময়।
শোভিতেছে পূর্ণ চাঁদ পূর্ণিমার রাতি,
মন্দোর-কুমার সে যে জোনাকীর ভাতি।"

চপলা।

"পূগল-কুমার ইনি "সাধু" নাম যাঁর,
তোমার এ রূপরাশি,
তাঁর বাহুবলে মিশি,
করিবে বিশাল বিশ্বে মহিমা প্রচার,
শিব-শক্তি ছাড়া কভু হয়েছে কি আর?
কবে সে প্রণয় হ'ল কেমন করিয়া,
আমি ত তোমার সাথে,
যাইতাম প্রতি প্রাতে,
অন্ধ চোক লক্ষ্য করি দেখিনে চাহিয়া,
আঁখির মিলনে বুঝি গেছিলে ভাসিয়া?"

লাবণ্যবতী।

"বলি সখি! মনে হয় সবি স্বপ্নপ্রায়,
এক দিন মধু-প্রাতে
তুই না আছিলি সাথে,
একেলা গেলাম আমি অতিথি-সেবায়,
দেখিনু মগন তিনি গভীর নিদ্রায়!
কি জানি কেমনে হ'ল বদ্ধ এ চরণ,
অবশ দেহের ভার,
চলিতে না পারি আর,
দাঁড়াইনু মন্ত্রমুগ্ধ সাপিনী যেমন,
মুখে শুধু চেয়ে আছি ফিরে না নয়ন।
সহসা নিদ্রার ঘোরে চমকি উঠিয়া
"লাবণ্য! লাবণ্য" করে
ডাকিলেন সকাতরে,

নিদ্রিত নয়নে অশ্রু উঠে উছলিয়া,
অমনি মেলিয়া আঁখি দেখেন চাহিয়া।
হেরিয়া সম্মুখে মোরে কে জানে কেমন
আনমনে আত্মহারা,
দেখালেন প্রাণ সারা,
আমরি প্রেমের মোহে হয়েছে মগন,
কাঙালিনী হেরিলাম সোণার স্বপন।
আমি পাগলিনী প্রায়, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে,
শুধু শুনিলাম কথা,
সে নীরব আকুলতা
বুঝালেম বুঝি সখি! সেই মুখে চেয়ে,
উভয়ের মন-কথা বুঝিনু উভয়ে।
সেই দিন হতে সখি! হৃদয় আমার,
দেবাদেব সাক্ষী করে
দেছি সে চরণ পরে,
ছুটিতেছে তাঁরি পানে প্রেম পারাবার,
মন্দোর-কুমার, কোথা স্থান বল তার?"

চপলা।

"তবে সখি! লুকাইয়া রাখিয়া কি ফল?
প্রকাশ না কর কেন
পরাণে সহিছ হেন,
গোপনে গোপনে শুধু তীব্র দাবানল,
যোগ্য পতি তাঁর সম কোথা আর বল?"

লাবণ্যবতী।

"সখিরে অদৃষ্টক্রমে বিধাতা নিদয়,
শুনি পাণি-প্রার্থী মোর
পিতা হয়ে ক্রুদ্ধ ঘোর,
উপেক্ষিত করেছেন তখনি তাঁহায়,
কুলে মানে সঁপিবেন নিজ তনয়ায়।"

চপলা।

"তবে কি উপায় সখি! নাহি কিছু আর?
তাই উপাসনা লাগি
হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
তাই মোরে লুকায়েছ কামনা তোমার?
মিলন হয় নি সখি! আর দুজনার?"

লাবণ্যবতী।

"সে দিন মিলন সখি! হয়েছে কাননে,
দেবাদেব সাক্ষী করে
আমিত বরেছি তাঁরে,
তিনি কি না করিবেন স্বধর্ম্ম পালন
রুক্মিণীর কথা সখি নাই কি স্মরণ?"
সহসা মলিন মুখ স্তব্ধ যে সে সখি,
ভবিষ্যত অন্ধকার,
হৃদয়ের চারি ধার
ঘিরিয়া তাহার যেন উঠিল চমকি,
সম্মুখে ভবিষ্য ছবি দেখিল নিরখি!

চপলা।

"যুদ্ধ করি জিনিবেন মন্দোর-কুমারে?
সখি! তাঁরো বাহুবল,
ঘোষিতেছে ধরাতল,
বিশেষ তোমার পিতা চাহেন তাঁহারে,
দুই শক্তি এক হলে জিনিতে কে পারে?"

লাবণ্যবতী।

"থাম তুই চপলারে, তোর বুদ্ধি মন,
নিরেট পাষাণ-প্রায়,
কে না জানে এ ধরায়
সে ভুজের বলরাশি কেমন ভীষণ?
সমরে শত্রুর তিনি সাক্ষাৎ শমন।
তবে নিদারুণ বিধি যদি রে আমার,
আরো তীব্র দুঃখ-সরে
দেন নিমগন করে,
তাহ'লে আছে সে শক্তি এ নারী-জীবনে,

চিরনিদ্রা যাব সুখে অনল-শয়নে।”
দুজনার মুখচ্ছবি বিষাদে কেমন
হইল মলিন-তর,
যেন হৃদয়ের পর
চিত্রাঙ্কিত হল সেই সমর ভীষণ,
আর সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তি, ভবিষ্যবচন।

এমন সময়ে আসি সখি আর জন
কহিল ত্বরিত স্বরে
“মহারাণী ত্বরা করে
ডাকিছেন তোমা দেবি! আইস, এখন,
এসেছে মন্দোর-দূত লয়ে আভরণ।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নবীন ভারতী।

(৫)

আতরওয়ালার নিকট ১০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা ভরি আতর আছে। তুমি যেমন নমুনা চাহিবে, বিনা দামে আতরওয়ালা সেইরূপ আতর তোমাকে শুঁকাইয়া দিবে, তুমি আমোদে ভরপুর হইয়া যাইবে। তখন তুমি আতরের কতই প্রশংসা করিবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য আতর পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে। কিন্তু যখন মাল চাহিবে, তখন আতরওয়ালা তোমাকে উপযুক্ত দাম আনিতে বলিবে—বিনা দামে এক ছিটা ফোঁটাও দিবে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক্ এইরূপ। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর ধর্ম্মার্থীকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য নিজকৃপাগুণে এক একবার ধর্ম্মের পরমানন্দের আস্বাদন বা ঘ্রাণমাত্র দেন। ধর্ম্মার্থী অযাচিত কৃপায় বিনা পরিশ্রমে এই সুখ বা পুণ্যের অবস্থা ক্ষণেকের তরে লাভ করে এবং আনন্দে মাতোয়ারা হয়। সে কত ইচ্ছা করে, এই সুখ যেন চির দিন ভোগ করিতে পায়—এই স্বর্গের অবস্থা যেন চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু ঈশ্বর আতরওয়ালার ন্যায় চতুর ব্যবসাদার। নমুনা একটু শুঁকাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন দিবেন, কিন্তু বিনা দামে মাল এক ফোঁটাও দিবেন না। সাধককে প্রাণগত যত্ন পরিশ্রম ও ঈশ্বর-নির্ভর রূপ তপস্যা বা সাধনা দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইবে—প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবে। “বিনা দুখে হয় না সাধন।” পণ্ডিতেরা চিরদিন ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যে, যে অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, সে আনন্দে শস্য সংগ্রহ করে। বিশ্বাস, ভক্তি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অক্লান্ত সাধনা বলে এই দুর্গম পথ সুগম হয়।

(৬)

এক সিংহের বাচ্চা দৈবক্রমে এক শৃগালের দলে পড়িয়াছিল। সে শৃগাল-

শিশুদের মাতাকে আপনার মাতা এবং শৃগালদিগকে আপনার সহোদর ভ্রাতা বলিয়া মনে করিত। তাহাদের সঙ্গে ধায় দায় খেলা করে এবং তাহাদের মত ডাকিতে না পারিলেও ডাকিবার চেষ্টা করে; তাহাদের মত ভীরুতা ও ধূর্ত্ততা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও তাহা অভ্যাস করে। এইরূপে সিংহশিশু শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। একদিন শৃগাল-ভাইদিগের সহিত সে নদী-তীরে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় সিংহ আসিয়া তথায় দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়াই শৃগাল-শিশুরা সটান দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু সিংহশিশু তত দ্রুত যাইতে না পারিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং সিংহ লম্ফ দিয়া তাহাকে ধরিল। সিংহ অনেক দিনের পর হারা শিশুকে পাইয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বলিল, “তোকে কত খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, তুই আমার সন্তান, জীবাধম শৃগালদিগের সহিত কেন মিশিয়াছিস? তুই পশুদিগের রাজা, তোর বল বিক্রম ও সাহস দেখিয়া সকলে কম্পিত হইবে, না তুই ভয় পাইয়া ভীরুর ন্যায় শৃগালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিস! ছি ছি কি লজ্জা, কি ঘৃণার বিষয়!” সিংহ-শাবকের বিশ্বাস হয় না যে, সে শৃগাল নয়—সিংহ। পিতা তাহার হাত পা ও শরীরের গঠন শৃগাল-দিগের হইতে ভিন্ন দেখাইতে লাগিল, তাহাতেও সে বুঝে না। পরে তাহাকে ধরিয়া নদীর ধারে লইয়া গেল এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব ভাল করিয়া দেখিতে বলিল। সিংহ-শিশু দেখিয়া আশ্চর্য্য—শৃগালের সহিত তাহার মুখের কোনও সাদৃশ্য নাই, তাহার মুখ সেই সিংহেরি মত। সে এত দিন আপনার মুখ দেখে নাই এবং আপনাকে চিনিতে পারে নাই। এখন সে লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা চাহিল এবং তাহারি সঙ্গে থাকিয়া তাহার ন্যায় কার্য্য করিবে প্রতিজ্ঞা করিল। তখন সিংহ-শিশু পিতার সহিত মহাবনে প্রবেশ করিয়া শিকার শিক্ষা করিতে লাগিল এবং আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পশু-দিগের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিল।

এই আখ্যায়িকা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁহার প্রতি-কৃতিতে নির্ম্মিত। তাহার প্রকৃতি দেব-প্রকৃতি। সে পশুপ্রকৃতিদিগের মধ্যে পড়িয়া ভীরুতা, নীচতা, কপটতা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আপনার জীবন হীন করিয়া ফেলে এবং সংসারের অসার আমোদ প্রমোদকেই সর্ব্বোত্তম সুখ বলিয়া তাহারই অনুসরণ করে। ঈশ্বরের হস্তে মানুষ যখন ধরা পড়ে এবং দিব্যজ্ঞানে আপনার মুখ দেখিতে পায়, তখন নিকৃষ্ট সংসর্গ ও নিকৃষ্ট জীবন পরিত্যাগ করে এবং পিতার অনুগামী হইয়া আপনার উচ্চ প্রকৃতির বিকাশ লাভ করে। মনুষ্য এই দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে সমুদয় সংসারের উপর আধিপত্য স্থাপন করে এবং পিতার সহচর হইয়া অমৃতানন্দের অধিকারী হয়।

(৭)

দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ, জলের মত তরল এবং কিছুক্ষণ একভাবে থাকিলে বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন এক বস্তু আছে যাহার বর্ণ, গন্ধ ও প্রকৃতি অন্য প্রকার এবং তাহা বহু দিন থাকিলেও বিকৃত হয় না। ইহা দুগ্ধের সার পদার্থ এবং ইহার নাম ঘৃত! এই ঘৃত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন করিতে হইলে অনেক প্রকরণ চাই এবং তাহাতে দুগ্ধজীবন কত ক্লেশ সহ্য করে ও কত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক এক সময় মনে হয়, দুগ্ধ খারাপ হইয়া নষ্টই হইল—ইহার পরিণাম আর ভাল কি হইবে?

গোয়ালা দুগ্ধকে লইয়া প্রথমে কড়ায় চড়াইয়া দিল। দুগ্ধ অগ্নির তাপে ঘন সর রূপ ধারণ করিল। সর আকারে আস্বাদে ভালই হইল এবং তাহা মনুষ্যের ভোগে লাগিলে দুগ্ধের দুগ্ধজন্ম সার্থক হয়। কিন্তু গোয়ালা তখন তাহাকে ব্যয় না করিয়া এক পাত্রে জমাইয়া রাখে। এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া এমন বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয় যে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই উৎপাত ঘুচে মনে হয়। গোয়ালা তখন সেই পচা দুর্গন্ধ বস্তুকে যত্ন করিয়া লইয়া শীলে বাটিতে থাকে। যখন নিষ্পিন্ন বাটা হইল, তখন একপাত্র জলে তাহাকে ফেলিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা সজোরে মথিতে লাগিল। দুগ্ধের যদি জীবন ও চেতনা থাকিত, সে মনে করিত যে, ঘোর পাষণ্ডের হস্তে পড়িয়া আমার কি না দুর্দ্দশা ঘটিল, এবার বুঝি প্রাণে বিনষ্ট হই! কিন্তু মন্থন করিতে করিতে তাহা হইতে দিব্য তৈলাক্ত সুকোমল শুভ্রকান্তি এক পদার্থ বাহির হইতে লাগিল। ইহার আদরের নাম মাখন বা ননী এবং কত যত্ন করিয়া ইহাকে আহরণপূর্ব্বক ভাল পাত্রে রাখা হইল। দুগ্ধ তখন একটু প্রফুল্ল হইল এবং ভাবিতে লাগিল যদি এই অবস্থায় থাকিতে পাই, আমার সৌভাগ্য। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা তাহা নয়। গোয়ালা তাহার জন্য জলন্ত উনানে এক লোহার কড়া চড়াইল এবং এমন সুকোমল বস্তুকে ছ্যাঁক করিয়া তাহার উপরে ফেলিয়া দিল। মাখনরূপী দুগ্ধ মনে করিল এইবার প্রাণে মরিলাম!! কিন্তু কি আশ্চর্য্য যতই মাখন গলিতে লাগিল। ততই গলিত সুবর্ণের ন্যায় এক প্রকার সুন্দর পদার্থ বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহার সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। গোয়ালা কটাহ হইতে অতি যত্নে সেই ঘৃতকে পাত্রস্থ করিল। এখন দুগ্ধের কি সুন্দর পরিণাম হইল! তাহার যে কিছু অসারত্ব ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং দুগ্ধ খাঁটী মাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দিনে যে বিকার প্রাপ্ত হইত, এখন দুই এক বৎসর কাল নির্ব্বিকার হইয়া থাকিতে পারে এবং যত অধিক পুরাতন হইবে, তাহার বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন হইলেও গুণাধিক্য বশতঃ তাহা

মনুষ্যের তত উপকারী ও দুর্লভ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে।

গোয়ালার হাতে দুগ্ধ যেমন সুকৌশলে ঘৃতে পরিণত হয়, অসার মনুষ্য ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলে সেইরূপ সারবান জীবন লাভ করে। তাহার জীবনের পরীক্ষা অনেক সময় ক্লেশকর ও দুঃসহ হইতে পারে; কিন্তু সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা যদি পরিচালিত হয়, তাহার সমুদায় অসারতা দূর হইয়া যাইবে এবং সে খাঁটী মানুষ হইয়া জগতের পরম হিতসাধন করিবে।

(৮)

ইক্ষুদণ্ড একখণ্ড কঠিন কাষ্ঠ, কিন্তু ইহার মধ্যে সুমিষ্ট রস রহিয়াছে। এই রস ইক্ষু মাড়িয়া বাহির করিতে হয়। রস অগ্নিতে জ্বাল দিয়া গাঢ় করিতে পারিলে গুড় হয়, তাহা আরো সুমিষ্ট। এই গুড় যত পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়, তত দলো চিনি, কাশীর চিনি, দোবরা চিনি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহা আরো সুস্বাদু। এই চিনি আবার রস করিয়া প্রক্রিয়া বিশেষে যখন দানা বাঁধা হয়, তখন কুঁদা মিশ্রি প্রস্তুত হয়। ইহার মত স্থায়ী, সুদৃশ্য ও সুমিষ্ট বস্তু আর কি হইতে পারে? মানুষের হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব, তাহা এইরূপে মিষ্ট হইতে মিষ্টতর ও মিষ্টাদ হইয়া ঘনীভূত ও মধুময় হয়। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

(৯)

কুম্ভকার নানা স্থান খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ভাল মাটী বাছিয়া মাথায় করিয়া বহিয়া আনে। মৃত্তিকার তখন আত্মগৌরবে কত আনন্দ! কিন্তু হায়! পর দিন কুমার সেই মাটিকে জলসিক্ত করিয়া পদদ্বারা দলন করে। তখন মাটীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়। সেই অহঙ্কার যেন আরো চূর্ণ করিবার জন্য কুম্ভকার মাটীকে মুদ্গর দ্বারা আঘাত ও পেষণ করে। মাটীর দুঃখ মাটীই জানে, তাহার ফুটিয়া এক কথা বলিবার শক্তি নাই। তাহার প্রভু পরে সেই মাটী তাল পাকাইয়া চক্রে স্থাপন করে এবং সেই চক্র ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাকে কাটিয়া ছিটিয়া একটী ঘট প্রস্তুত করে। মাটী আপনার দুর্দ্দশা সব দেখিতেছে এবং সহিয়া যাইতেছে। কুম্ভকার তৎপরে সেই ঘটকে দিনের পর দিন রৌদ্রতাপে শুখাইতে থাকে। যখন ঘট খুব শুষ্ক হয়, তখন পোনে আগুন জ্বালিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করে এবং দগ্ধ করিয়া পাকা ঘট হইলে তাহা বিক্রয় করে। এই ঘট পূজার্থ গৃহস্থ কিনিয়া লইয়া গিয়া পুরোহিত দ্বারা আপন গৃহে ঘট স্থাপন করে। পুরোহিত ঘটটী পবিত্র গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া ফুল ও বিল্বদল দিয়া যখন মন্ত্রপূত করেন, তখন সেই ঘটে ইষ্ট দেবতার আবির্ভাব হয় এবং গৃহস্থ আত্মীয় পরিজন ও অপর সাধারণকে লইয়া তাহার নিকটে দণ্ডবৎ প্রণত হন। মৃত্তিকার ঘটের মধ্যে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রাণরূপেণ সংস্থিতা"—যে দেবী সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার সাক্ষাৎ

অধিষ্ঠান, ইহার অপেক্ষা ঘটের গৌরব ও সৌভাগ্য কি হইতে পারে? তাহার ঘট-জন্ম এত দিনে সার্থক হইল। যে মৃত্তিকার ঘট চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির আবাস হইয়াছে, তাহার যদি চেতনাশক্তি থাকিত, সে পদ-দলন, মুদ্গরতাড়ন, চক্র-নিষ্পেষণ এবং রৌদ্র ও অগ্নিতাপ-দহন—আত্মজীবনের অতীত সকল কষ্ট ভুলিয়া পৃথিবীর বস্তু স্বর্গের বস্তু হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দে বিহ্বল হইত এবং প্রাণময়ী দেবতাকে প্রাণে ধরিয়া জীবন ও জন্ম ধন্য মানিত।

ঈশ্বর ধর্ম্মসাধনার্থ মানুষকে যখন আহ্বান করেন, তখন তাহাকে আদরে মাথায় করিয়া আনেন। কিন্তু পরে তাহাকে তাঁহার পূজার উপযুক্ত করিবার জন্য নানা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। সে পদদ্বারা দলিত হয়, নানা প্রকার তাড়না লাঞ্ছনা ভোগ করে এবং ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হয়। এই সকলের মধ্যে ঈশ্বর তাহার হৃদয় ঘটকে প্রস্তুত করেন। পরে সেই ঘট যখন পবিত্র ভক্তি গঙ্গাজলে পূর্ণ হয় এবং তাহাতে প্রাণের দেবতার আবির্ভাব হয়, তখন সাধক সকল কষ্ট দুঃখ ভুলিয়া যান এবং আনন্দময়কে হৃদয়ে লইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। তখন তাঁহার জীবন কৃতার্থ হয়।

শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সন্তান পালন ও সন্তানদিগের শিক্ষা বিধান বিষয়ে শিক্ষিতা মহিলাদিগের দায়িত্ব কি গুরুতর! আমরা যে সকল কারণে রমণীদিগের উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, তন্মধ্যে সন্তানপালন ও সন্তানদিগের সুশিক্ষা বিধান প্রধান কারণ। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সচ্চরিত্রা ও গুণবতী মাতার পুত্র কন্যাগণই গুণবান্ এবং গুণবতী হইয়া থাকে। জননী যে কেবল স্তন্যদানে ও অন্নদানে সন্তানের শরীরই গঠন করিয়া থাকেন, তাহা নহে। সন্তান স্তন্যরসের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃহৃদয়ের পুণ্য-রসও আকর্ষণ করিয়া থাকে। সন্তান জননীর চলা-ফেরা কথা-বার্ত্তা ও হাব ভাবের অনুকরণ করিয়া যেমন চলিতে শিখে, বলিতে শিখে, তেমনি জননীর প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে, প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারে অন্তরের যে সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সন্তান তাহারও অনুকরণ করে; সেই সকল ভাবের দ্বারাই তাহার বাল্যজীবন সংগঠিত হয়।

এই জন্য জননীদিগের চরিত্র যে কতটা উন্নত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রত্যেক

পুরুষ ও নারীরই স্মরণ রাখা বিধেয়। আমরা দেখিতে পাই, জগতের উন্নত-চরিত্র সাধুপুরুষদিগের জননীগণ প্রায় সকলেই ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহারা শৈশবকালে সন্তানদিগের কোমল অন্তঃকরণে এমন এক সুশিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন যে, সেই বীজ হইতেই তাঁহাদের হৃদয়ে সাধুতা ও সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং নারীহৃদয় যেমন পুণ্যে সু-নির্ম্মল, স্নেহ মমতায় সুকোমল হওয়া প্রয়োজন, তেমনি উচ্চশিক্ষাতেও উন্নত হওয়া আবশ্যক।

রমণীগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা না হইলে সন্তানদিগের সঙ্গে কখন কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সন্তানদিগের সাক্ষাতে কিরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে, তাহাদিগের সম্মুখে কখন কিরূপ আদর্শ ধরিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষার জন্য, সুখের জন্য, আমোদের জন্য, আদর ও শাসনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে;—এই সকল গুরুতর বিষয়ে কিরূপে জ্ঞান লাভ করিবেন?

তাঁহারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে পারিলেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শিশুপ্রকৃতির অস্ফুট ভাবগুলি বুঝিতে পারিবেন, এবং সেই সকল অস্ফুট ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে, যেরূপ শিক্ষা ও অন্যান্য আয়োজনের প্রয়োজন, তাহাও করিতে পারিবেন।

অতএব এ কথা এক প্রকার নিশ্চয় যে, এ দেশের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগের উপরেই নির্ভর করে।

এ দেশের অশিক্ষিতা রমণীগণ, তাঁহাদিগের নির্ম্মলহৃদয়ের সুকুমার স্নেহধারায় সন্তানদিগকে যতটা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, হয় ত অন্য কোন দেশের রমণীরাই তাহা পারেন না; অথবা সন্তানদিগের সেবায় এদের মাতারা আপনাদের সুখ দুঃখ যেরূপ অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, আমরা জানি না অন্য কোন দেশের জননীরা তাহা পারিয়া উঠেন কি না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বলিতে হইবে, এতদ্দেশীয় রমণীগণ সন্তানদিগকে উপযুক্ত সুশিক্ষা দানে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

এইজন্য দেখা যায়, এ দেশের যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও লাভ করিতেছেন, অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্রদিগকেও সুখী করিতেছেন; কিন্তু চরিত্রগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া জনক জননীর মুখোজ্জ্বল করিতে, অথবা স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিতে ও যশস্বী হইতে কয়জনকে দেখা যায়?

অতিপূর্ব্বে যখন হিন্দুজাতির সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হয় নাই, যখন প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির ন্যায় পুণ্য ও প্রীতিতে হিন্দুর নির্ম্মলচিত্ত সুশোভিত থাকিত, যখন মধ্যাহ্ন ভাস্করের দীপ্ত তেজোরাশির ন্যায় বীরত্বে ও মহত্ত্বে হিন্দু-হৃদয় সমুজ্জ্বল থাকিত, তখন হয় ত হিন্দু নারীগণের

পবিত্র চিত্ত উচ্চশিক্ষায় উন্নত না হইয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু তখন বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায় ও সামাজিক সংঘর্ষণে সমাজে নানা প্রকার বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হয় নাই, দেশের রীতি নীতিও দূষিত হইয়া যায় নাই, সমাজমধ্যে নাস্তিকতা, কপটতা এবং ধর্ম্মবিহীন শিক্ষারও প্রাবল্য উপস্থিত হয় নাই। তখন ভোগৈশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ আসক্তিশূন্য শুভ্রচিত্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী গুরুদিগের গৃহেই সন্তানদিগকে রাখিয়া দেওয়া হইত। সন্তানগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যায় বিদ্যাবান্, সংযমে সংযমী ও ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইয়া জনক জননীর নিকট ফিরিয়া আসিতেন। কাজেই তখন রমণীগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও সন্তানদিগের শিক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত হইত না।

কিন্তু এখন আর সে কালও নাই, সে সমাজও নাই, সেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলন করাও অসম্ভব। তাহার পর কিছুকাল পূর্ব্বে (ইদানীন্তন কালেও) বাড়ীর বৃদ্ধ দাদা মহাশয়েরা পৌত্র দৌহিত্রদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের অন্য কোন কার্য্যই ছিল না, সর্ব্বদা নাতি নাতিনীদিগকে লইয়া হাসি গল্প আমোদ প্রমোদ করিতেন, চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক কাহিনী বর্ণন করিয়া নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, এবং শুভঙ্করী ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বচন সকল মুখে মুখে শিখাইয়া দিতেন।

এখন সে দাদা মহাশয়দিগের সঙ্গেও নাতি নাতিনীদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। দাদা মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, অর্থশালী, অথবা মোটা পেন্সিয়ান-ভোগী; তাঁহারা প্রায় সকলেই বৃদ্ধ বয়সটা হয় দার্জ্জিলিঙ্গে নয় ত মধুপুর, গিরীডী, কিম্বা বৈদ্যনাথেই কাটাইয়া দেন। প্রতিদিন "বেঙ্গলী" "অমৃতবাজার" পাঠ, নিদ্রা, আহার, ভ্রমণ ও গল্পগুজবই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য হইয়া উঠে। আর যাঁহাদের তেমন অর্থ নাই, তাঁহারা পৈতৃক বসতবাটীতে বাস করিয়া নাতি নাতিনীর পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়ার সঙ্গেই প্রণয় সংস্থাপন করেন, এবং আস্তে আস্তে বৈতরণী নদীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। আর তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানেরা পরিবার পরিজন লইয়া দূর বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করেন।

কাজেই এখন আর আমাদের বালক বালিকারা যে দাদা মহাশয়ের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও সাহায্য পাইবে, তাহার আশা নাই।* অথচ বালক বালিকাদিগের যাঁহারা পিতা,—প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের জীবন-সংগ্রাম এরূপ কঠোর যে, সন্তানদিগের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তাঁহারা একেবারে অসমর্থ।

কেমন করিয়া দৃষ্টি রাখিবেন? তাঁহাদের

* দাদা মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন দিদীমারাও ছেলে মেয়েদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা এবং মানসিক উন্নতির অনেক সহায়তা করিতেন, এখন তাহারও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বা, বো, স।

সময় কোথায়? কেহ হয় ত উকিল। প্রত্যূষে উঠিলেন। মুখ ধুইয়া চা পান করিলেন। একটু মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলেন। তার পর যেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, অমনি ভ্রূকুটি-কুটিল ফন্দীবাজ সেয়ানা মক্কেলেরা বগলে এক তাড়া কাগজ লইয়া, এবং মনে অনেক রকম ফেরব্বাজি বুদ্ধি লইয়া হাজির হইল; অতি অল্প প্রয়োজনীয় কথার সঙ্গে বিস্তর অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়া উকীল মহাশয়ের ঘড়িতে দশটা বাজাইয়া দিল।

উকীল বাবু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া চোগা চাপকান পরিয়া শামলা মাথায় দিয়া কাছারিতে চলিলেন। বেলা দশটা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত জেরাতে, বক্তৃতাতে, আইনের নজীরেতে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য অথবা সত্যকে সত্যই সপ্রমাণ করিয়া অপরাধী রামকে খালাস করিয়া, নির্দ্দোষী শ্যামকে জেলে পাঠাইয়া, কিম্বা প্রকৃত দোষী ব্যক্তিরই দোষ সাব্যস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে একটু জলযোগ করিলেন। একটু সমবয়স্কদিগের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া লইলেন। আবার যেমনই সন্ধ্যা অতীত হইল, অন্ধকারে ধরণীর মুখ আচ্ছন্ন হইল, অমনি একটি দুইটি করিয়া মক্কেলের দল আসিয়া উকীল বাবুর বৈঠকখানার বেঞ্চগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এইরূপ মুনসেফ বাবু বল, ডেপুটী বাবু বল, ডাক্তার বাবু বল, ইঞ্জিনিয়ার বাবু বল, সকল বাবুরই এক দশা। আপীশে গাধা খাটুনি খাটিতে হয়, বাসায় আসিয়াও রায় লিখিতে হয়, আইন পড়িতে হয়, বাহিরের কাজের চিন্তা করিতে হয়। কেরাণীরা ত আপীশের সাহেবদের কাছে মাথা বিক্রয় করিয়াছে। এক যা অবসর আছে একটু স্কুল-মাষ্টারদের। তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহাদের অধিক বেতন, সেই সকল ব্যক্তিরই চাকুরীতে পোষায়। নহিলে অল্প বেতনের মাষ্টারদের লোকের বাড়ী বাড়ী ছেলে পড়াইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে হয়।

এখন সকলে একবার চিন্তা করুন, এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তি কখনই বা আত্মোন্নতি করিবেন, কখনই বা একটু ধর্ম্মকর্ম্মের চেষ্টা করিবেন, কখনই বা সন্তানদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন?

কিন্তু বামন ঠাকুরাণী ও ঝিদিগের আবির্ভাবে ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত রমণীদিগের সময়ের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। বরং রাশি রাশি বাঙ্গালা গল্পের বহি ও খবরের কাগজের চুটকি প্রবন্ধই অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের সময় কাটাইবার একটা উপায় হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় মেয়েরা যদি উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হন, এবং সেই সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি পাশ্চাত্য রমণীদিগের অসংযত বিলাস-বুদ্ধি জাগ্রত না হইয়া তাঁহাদিগের উন্নত কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা সন্তানদিগের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

অনেকে হয়ত বলিবেন, কেন? আমরা ত ছেলে মেয়েদের জন্য টাকা খরচ করিয়া বাড়ীতে এক একজন মাষ্টারেরই বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহারাই ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

আমরা জানি, অনেকেই এই দু ঘণ্টার ভাড়াটে শিক্ষকের হস্তে সন্তানদিগের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তাহার ফল কি বড় ভাল হইতেছে না কি? মফঃস্বলের অনেক দরিদ্র ছাত্র, যাহারা অর্থাভাববশতঃ পড়াশুনার কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না, অথবা যাঁহাদের চাকুরীর যৎসামান্য আয়ের দ্বারা উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাঁহারাই দুর্ভাগ্য জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তগুলি দশ জায়গায় বিক্রয় করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ছেলে পড়াইয়া বেড়ান।

এই সকল শিক্ষক সকালে উঠিয়াই হয়ত এক বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে বাড়ীর আদুরে ছেলেগুলির ঘুমই আর ভাঙ্গে না। শিক্ষক বেচারী উদ্বিগ্ন হইয়া ভৃত্যকে চারি পাঁচ বার বাটীর ভিতর পাঠাইলেন। তারপর চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ছেলে বাবুরা আসিয়া দর্শন দিলেন। কিন্তু রাত্রে শোবার সময় কার বই কে যে কোথায় রাখিয়া দিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। তাহা লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে কতক্ষণ কলহ চলিল। অবশেষে দুই তিন জায়গা খুঁজিয়া বইগুলি পাওয়া গেল এবং পড়া আরম্ভ হইল। বইগুলির ভাল করিয়া পড়া হইতে না হইতেই মাষ্টার বাবু ঘড়ি খুলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার স্কুলে বা আপীসে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। কাজেই তিনি কোন রকমে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া বাসায় চলিলেন। তাড়াতাড়ি স্নান আহার করিয়া আপীসে ছুটিলেন। আবার তিনিই হয়ত সন্ধ্যা-সমাগমে ক্ষুধাক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে অন্য এক বাড়ী ছেলে পড়াইতে যাইবেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মুখ হয়ত একটি বাক্যও উচ্চারণ করিতে চাহিবে না। তথাপি মাষ্টার বাবু কোন রকমে আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া মাসের শেষে দশটী টাকা পকেটস্থ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি, যাহাঁরা পেটের দায়ে আপনার শরীর ও মনের উপর নিতান্ত জুলুম করিয়া বাড়ী বাড়ী ছেলে পড়াইতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগের হস্তে সন্তানদের ভারার্পণ করিয়া জনক জননী-দিগের কি নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত? ঐ সকল শিক্ষকদিগের চরিত্র ভাল না মন্দ, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করাও অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে।

দুঘণ্টার জন্য নিযুক্ত মাষ্টারের হাতে ছেলেদের ভার দিলে, ঘরে যে রকম শিক্ষা হয়, তাহা ত এক রকম বর্ণনা করা গেল। তদ্ভিন্ন ছেলেরা যে স্কুল কলেজে পড়ে, সেখানে অধিকাংশস্থলে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত নাই, ছাত্রদিগের উপর মাষ্টার-

দিগের চরিত্রেরও কোন প্রভাব নাই; ছেলেরা যে সকল ছাত্রদিগের সংসর্গে মিলিত হয়, তাহাদিগের নৈতিক অবস্থা উন্নত নহে।

এরূপ অবস্থায় সুশিক্ষিতা রমণীগণ যদি সন্তানদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান না করেন, চরিত্রের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাহাদের আচার ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক না হন, তাহা হইলে আর কেই বা দৃষ্টি রাখিবে, কেই বা সতর্ক হইবে? ছেলেরা আপন খেয়ালে চলিয়া চলিয়া স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

আমরা সেই জন্যই বলিতেছি, শিক্ষিতা মহিলাগণের সন্তানদিগের সুশিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতিসাধন বিষয়ে দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। তাঁহারা যদি উচ্চশিক্ষা পাইয়াও সন্তানদিগের সমস্ত ভার ভাড়াটে শিক্ষক-দিগের হস্তে অর্পণ করেন, এবং নিজেরা ইংরাজী বাঙ্গালা গল্পের বহি পাঠ করিয়া আমোদে প্রমোদে সময় কাটাইয়া দেন; অথবা যদি বালকবালিকাদিগকে কেবল উত্তম উত্তম আহার্য্য সামগ্রী দান করিয়া, মনোরম মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সুশোভিত করিয়া, শুধুই ভোগসুখে অভ্যস্ত করেন, শুধুই বি, এ পাশ করিবার জন্য, শুধুই বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলেন; তাহা হইলে এদেশের ছেলেদের আর মানুষের মত মানুষ হইবার আশা কোথায়?

তাই বলি, শিক্ষিতা মহিলারা যদি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তান-দিগের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করেন, শিক্ষায় ও সৎকার্য্যে সন্তানদিগকে উৎসাহিত করেন, সন্তান-দিগের সঙ্গে গল্প গুজব গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিয়া তাহাদিগের বন্ধু-স্থানীয় হইতে পারেন, তাহাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন; এবং মহৎ লোকের জীবনের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া ও স্বীয় স্বীয় জীবনের উন্নত আদর্শ দেখাইয়া, সন্তানদিগের ভিতর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রস্ফুটিত করিতে পারেন, জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত করিতে পারেন, পরসেবার ভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, ধর্ম্মভাবে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহাঁদের উচ্চশিক্ষা ধন্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ঈশ্বরের নামাবলী।

স্খলনহীন, স্তন্যদাতা, স্তন্যরক্ষক, স্তম্ভ, স্তবনীয়, স্তিমিতলোচনধ্যেয়, স্তুত, স্তুতি-বাদাতীত, স্তূয়মান, স্ত্রীজাতিবন্ধু, স্ত্রীরূপিণী, স্ত্রীপুংপ্রভু, স্থ, স্থপতি, স্থলজলদেবতা, স্থবির, স্থাপয়িতা, স্থায়ী, স্থাস্নু, স্থির, স্থিরতর, স্থিরতম, স্থিরসিদ্ধান্ত, স্থূলত্বহীন, স্থেয়, স্থৈর্য্যবান্, স্নিগ্ধ, স্নেহদাতা, স্নেহ-বান্, স্নেহময়, স্নেহার্ণব, স্পর্দ্ধাহারী, স্পর্শ-মণি, স্পৃহণীয়, স্ফুরিত, স্ফূর্ত্তিমান্, স্মরগুরু, স্মরণীয়, স্মরহর, স্মর্ত্তব্য, স্রষ্টা, স্বকীয়,

স্বচ্ছন্দ, স্বতঃ, স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বতন্ত্র, স্বতঃসিদ্ধ, স্বত্ববান্, স্বপ্রকাশ, স্ববশ, স্বভূ, স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভুব, স্বরাট্, স্বরূপ, স্বর্গ, স্বর্গপতি, স্বর্গবিধাতা, স্ববীজ, স্বস্তি, স্বস্তিবাচক, স্বস্থ, স্ব-স্বরূপ, স্বাদু, স্বাধীন, স্বাভাবিক, স্বাভাবিকজ্ঞানশক্তি, স্বামী, স্বামীর স্বামী।

হ।

হংস, হননকর্ত্তা, হতাশের আশা, হন্তা, হস্তবান্, হস্তাবিহীন, হসন, হর, হরি, হরিকেশ, হরিদেব, হরিমঙ্গল, হরিসুন্দর, হর্ত্তা, হর্ষণ, হর্ষমান, হানিপূরক, হার, হারক, হারাধন, হারী, হিংসাহীন, হিতকাম, হিতকারী, হিতসাধক, হিতৈষী, হিরণ্ময়, হীনতারণ, হৃদয়রতন, হৃদয়বন্ধু, হৃদয়বান্, হৃদয়ের ধন, হৃদয়রঞ্জন, হৃদয়রতন, হৃদয়শোভন, হৃদয়েশ, হৃদয়েশ্বর, হৃদিবল্লভ, হৃদীশ, হৃষ্ট, হৃষীকেশ, হ্রীমান্, হ্লাদী।

রসায়ন-তত্ত্ব।

কার্ব্বণ।

কয়লা।

চিহ্ন C ; সাংযোগিক গুরুত্ব ১২।

অবস্থা—অসংযুক্ত অঙ্গার কঠিন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংযুক্ত অবস্থায় চৌর্ণোপল (যে প্রস্তর হইতে চূণ জন্মে), চা খড়ি, মার্ব্বেল, প্রবাল ও শম্বুকাদিতে যথেষ্ট আছে। ইহা জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের এক প্রধান উপকরণ। ইহাকে অম্লজনের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়।

কার্ব্বণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক অঙ্গার আবার হীরা, কৃষ্ণসীস (Graphites), ও পাথুরিয়া কয়লা বা কোল ভেদে তিন প্রকার। কৃত্রিম অঙ্গারও তিন প্রকার, যথা—কয়লা বা সামান্য অঙ্গার, অস্থ্যঙ্গার ও দীপাঙ্গার। কয়লা, হীরা ও গ্রাফাইট্, এই তিন পদার্থ অঙ্গারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; অর্থাৎ কয়লা, হীরা ও কৃষ্ণসীসের বর্ণ, কাঠিন্য ও ভার প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণ সকল পৃথক্ পৃথক্ হইলেও ইহারা অঙ্গার-নামক একটী ভূত বা মূল পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ; যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কয়লা, হীরা ও কৃষ্ণসীস লইয়া বায়ুমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহাদিগের প্রত্যেক পদার্থ হইতে সমান সমান পরিমিত অঙ্গার অম্লজনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সামান্য সামান্য দ্ব্যাঙ্গার গ্যাস উৎপন্ন হয়।

হীরা—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ। রত্নশ্রেষ্ঠ হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গার বই আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোলকুণ্ডা, সম্বলপুর ও বুন্দেলখণ্ডে, এবং বর্ণিয়ো দ্বীপে, ইউরাল পর্ব্বত সন্নিধানে ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে পান্না রাজ্যে হীরকের খনি আছে। ভারতবর্ষের খনিসমূহে এখন আর সেরূপ হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধুনা ব্রেজিলদেশীয় খনিসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। স্ফটিকভাবাপন্ন হইবার সময় হীরক ঘনসম ত্রিভুজ, ঘনসম চতুর্ভুজ, ঘনসম অষ্টভুজ প্রভৃতি মনমেটরিক বা একবিধ-মূর্ত্তি প্রণালীর কোন না কোন আকার ধারণ করে। হীরার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫৫। বিশুদ্ধ হীরক বর্ণহীন স্বচ্ছ পদার্থ। কিন্তু পীত, লোহিত, হরিৎ, শ্বেত, নীল, এমন কি কৃষ্ণবর্ণের হীরকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ হীরকের প্রভা অতি চমৎকার, এই জন্য হীরা বহুমূল্য হইয়াছে; এবং ইহা অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। ইহা কাচ কর্ত্তন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। হীরককে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন-পূর্ণ বোতল মধ্যে নিমগ্ন করিলে অতি সুন্দর তেজ ও জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, এবং অক্সিজেনের সহিত হীরকের সংযোগে C^{O}_{2} (আঙ্গারিকাম্ল বায়ু) উৎপন্ন হয়, হীরকের কোনও চিহ্ন থাকে না। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গার বই আর কিছুই নহে। ইহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় না। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে ইহা সর্ব্বপ্রথম নশ্বর পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ হয়।

গ্রাফাইট বা কৃষ্ণসীস—ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ সীসের ন্যায়, এ নিমিত্ত ইহাকে কৃষ্ণসীস কহে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা সীস নহে। সিংহল দ্বীপে, সাইবিরিয়া দেশে, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কম্বারলণ্ড প্রদেশে, আমেরিকাতে, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে ইহার আকর আছে। প্রথমতঃ মহারাণী এলিজেবেথের রাজত্বকালে ইহা কম্বারলণ্ডের অন্তঃপাতী বরোডেল নগর হইতে আনীত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·২০৯। ইহা কাগজের উপর ঘসিলে ধূসরবর্ণ দাগ পড়ে; এই জন্য ইহা দ্বারা পেন্সিল প্রস্তুত করে। ইহা অতিশয় কোমল ও স্নৈহিক; এই নিমিত্ত ইহাকে চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ নিবারণ জন্য গাড়ীর চাকার আলে দিয়া থাকে। ইহা অতিশয় দুর্দাহ্য, এই নিমিত্ত ইহার মুচি প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণকারেরা স্বর্ণাদি ধাতু দ্রব করে। বায়ুমধ্যে রাখিয়া দিলে ইহাতে মরিচা পড়ে না, এই নিমিত্ত লৌহাদি যে সকল ধাতু বায়ুমধ্যে রাখিলে মরিচাযুক্ত হয়, সেই সমস্ত ধাতুর উপর কৃষ্ণসীসের প্রলেপ দেওয়া হয়। গন্ধক-দ্রাবক ও পটাসিয়ম ক্লোরেট সহযোগে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণসীস প্রবলরূপে তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণসীস সূক্ষ্ম গুঁড়ার আকারে পৃথক্ হইয়া আসে। লৌহ-নির্ম্মিত সামগ্রীর উপর কৃষ্ণসীস দিয়া তাহার মসৃণতা সম্পাদন করা যায়। ইহার বিশেষ গঠন নাই; কখন কখন ষট্‌কোণবিশিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। হীরা যেমন সহজে বাষ্পে দগ্ধ হয়, গ্রাফাইট তদ্রূপ হয় না। কৃষ্ণসীস সহজে চূর্ণ করা যায়।

পাথুরিয়া কয়লা বা কোল—অঙ্গার ব্যতীত ইহাতে অম্লজান, উদজান ও যবক্ষারজান মিশ্রিত আছে। পাথুরিয়া

কয়লা খনিজ পদার্থ। উত্তর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পৃথিবীর অনেক স্থানে উহার আকর দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্গত রাণীগঞ্জ গিরিদি প্রভৃতির খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। খনিতে নামিবার সময় চতুর্দ্দিকস্থ কয়লার উপর উদ্ভিদ সকলের পত্রাদি অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদায় দেখিয়া বোধ হয় যে, পাথুরিয়া কয়লা উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথ্বীতলস্থ উদ্ভিদরাশি কালচক্রে ভূগর্ভশায়ী হইয়া কোলরূপে পরিণত হয়। যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভাবে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া কয়লা হয়, তাদৃশ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ভূগর্ভশায়ী উদ্ভিদও কয়লারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যেমন কাষ্ঠদাহে তাহার সমুদায় উদজান ও অম্লজান বহির্গত হয়, ভূগর্ভ-পরিণত কোল সেরূপ সর্ব্বতোভাবে উদ্‌জান ও অম্লজানশূন্য হয় না। অধিকন্তু উহাতে এক প্রকার স্নৈহিক পদার্থ সঞ্চিত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩২ হইতে ১·৭২ পর্য্যন্ত।

কোল তিন প্রকার যথা—য়্যানথ্রাসাইট, পিট ও লিগ্নাইট কোল।

১। য়্যানথ্রাসাইট—ইহা শীঘ্র দগ্ধ হয় না। যখন দগ্ধ হয়, তখন শিখার সহিত প্রজ্বলিত হয় না। ইহাতে শতকরা ৯৩ অংশ বিশুদ্ধ কার্ব্বণ আছে। ষ্টীম এঞ্জিন চালাইবার সময় এই কয়লা ব্যবহৃত হয়।

২। পীট্—ইহা দ্বারা রন্ধন ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাতে একটি দাহ্য বাষ্প আছে। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহার কতকগুলি টুকরা অগ্নিতে তাতাইলে তাহারা গলিত হইয়া চাপ বাঁধে। ইহাতে শতকরা ৮৪ ভাগ বিশুদ্ধ কার্ব্বণ আছে।

৩। লিগ্নাইট কোল—গ্যাস প্রস্তুত কারখানায় এই কোল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শতকরা প্রায় ৭০ অংশ কার্ব্বণ আছে। কোল দুই দ্রব্য ধারণ করে (ক) অরগ্যানিক ম্যাটার, যাহা দাহনের দ্বারা পৃথক্ করা যায় এবং (খ) ইন্-অরগ্যানিক ম্যাটার, যাহা দাহনের পর ভস্ম অবস্থায় পতিত থাকে।

কয়লার অর্গ্যানিক পদার্থে অধিক কার্ব্বণ এবং হাইড্রজেন ও অল্প নাইট্রজেন আছে। ইন-অর্গ্যানিক পদার্থে কেবল বালি, কাদা, গন্ধক ও লোহা থাকে। জ্বালানি কার্য্যে পাথুরিয়া কয়লার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। কলিকাতায় যে গ্যাসের আলোক প্রদত্ত হয়, তাহা এই পাথুরিয়া কয়লা হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন পাথুরিয়া কয়লা হইতে মভ, ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি রঙ্ এবং এমোনিয়া, আলকাতরা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

কোক্—কোল হইতে আলকাতরা, জল, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ বহির্গত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় বিশুদ্ধ অঙ্গার, উহাকে কোক্ বলে।

অধুনা কোক্ ইন্ধনস্বরূপে ব্যবহার হইতেছে। কোক্ ধূসরবর্ণ, সচ্ছিদ্র ও অত্যন্ত কঠিন, এবং ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট। কোক্ পোড়াইলে ঝুল কালী পড়ে না এবং প্রখর তাপ পাওয়া যায়। লৌহাদি ধাতু গলাইবার জন্য কোক্ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রস্তুত করে।

কয়লা বা সামান্য অঙ্গার—উদ্ভিদ দগ্ধ করিলে যে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহাকে কয়লা বলে। আধ সের কাট পোড়াইলে প্রায় আধ পোয়া কয়লা হয়। বায়ু-প্রবাহে কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে তাহার অধিকাংশ উড়িয়া যায়। এই হেতু প্রবাহ-শূন্য বায়ুমধ্যে কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া কয়লা প্রস্তুত করে। যদি একখান জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার কিয়ৎভাগ কোনও পরীক্ষা নল মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রবিষ্ট ভাগ কয়লা মাত্রে পরিণত হয়; বহির্ভাগ শিখা-বিশিষ্ট হইয়া জ্বলিয়া যায়। কাষ্ঠদাহন-কালে তদন্তর্গত উদ্‌জান ও অম্লজান সংযোগে যে সকল উদ্বেল পদার্থ জন্মে, তৎসমুদায় উড়িয়া যায়। অঙ্গার ধাতব পদার্থের সহিত কয়লারূপে অবস্থান করে। কয়লা ছিদ্রবহুল পদার্থ, উহার মধ্যে বায়ু ও জল শোষিত থাকিতে পারে। এক খানি টাট্‌কা কয়লা লইয়া কোন আর্দ্র-স্থানে এক দিন রাখিয়া দিলে, তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইয়া ভার বৃদ্ধি হয়। কয়লা আপন আয়তন অপেক্ষা ৯০ গুণ এমোনিয়া ও ৯ গুণ অক্সিজেন শোষিত রাখিতে পারে। এই শোষকতা শক্তি থাকাতে কয়লা দ্বারা জল ও বায়ু শোষিত হইয়া থাকে। এক ইঞ্চ পরিমিত কয়লা-গুঁড়ার নীচে একটী মৃত ইন্দুর রাখিয়া দিলে উহা পচিয়া যায় বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন কোনও দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। কয়লা দ্বারা ঐ দুর্গন্ধ শোষিত ও নিবারিত হয়। রোগীর গৃহে কয়লার ঝুড়ি টাঙ্গাইয়া তথাকার বায়ুর দোষ সংশোধন করা গিয়া থাকে। কয়লা মধ্য দিয়া নিস্রুত করিয়া লইলে মলিন জল পরিস্কৃত হয়। কাষ্ঠাঙ্গারের ছিদ্রসমূহ বাষ্পে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া উহা জলের উপর ভাসে। ইহাতে সামান্যত বোধ হইতে পারে যে, অঙ্গার জল অপেক্ষা লঘু, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অঙ্গার গুঁড়া করিলে উহার মধ্যস্থ ছিদ্রগুলি বিনষ্ট হয়। তজ্জন্য অঙ্গারচূর্ণ জলের উপর নিক্ষেপ করিলে উহা না ভাসিয়া আস্তে আস্তে জলে নিমগ্ন হইতে থাকে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, কাষ্ঠাঙ্গার জল অপেক্ষা ভারী।

অস্থ্যঙ্গার—কোনও অবরুদ্ধ পাত্রে অস্থি রাখিয়া তাপ দিলে যে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহাকে অস্থ্যঙ্গার কহে। অস্থ্যঙ্গারের দশাংশের একাংশ বিশুদ্ধ অঙ্গার, অবশিষ্ট নয় অংশ ভস্ম। অস্থ্যঙ্গারের বর্ণনাশকতা শক্তি অতিশয় প্রবল। বার্লি শর্করাদি পরিষ্করণার্থ ইউরোপীয়েরা বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ঔদ্ভিদিক বর্ণ নষ্ট করে।

দীপাঙ্গার—প্রবাহশূন্য বায়ুমধ্যে দীপ জ্বালাইয়া এই অঙ্গার সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা দ্বারা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মসী প্রস্তুত হয়। ছাপিবার জন্য যে মসী ব্যবহৃত হয়, তাহা দীপাঙ্গার হইতে তৈয়ার হয়। রজন, তার্পিণ তৈল প্রভৃতি যে সকল পদার্থে অধিক অঙ্গার আছে, সেই সকল দ্রব্য প্রজ্বলিত করিয়া কোন পাত্র দ্বারা আবৃত করিলে পাত্রের গায়ে কৃষ্ণবর্ণ দীপাঙ্গার লাগিয়া যায়।

ঝুল (সুট)—কাষ্ঠাদি পোড়াইবার সময় কিয়দংশ অঙ্গার ধূমাকারে দেওয়ালের গায়ে বা ছাদে লাগিয়া তথায় কৃষ্ণবর্ণ আবরণের ন্যায় সঞ্চিত হয়, ইহাকে ঝুল বা সুট কহে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার সময় উহা হইতে যে এমোনিয়া বাষ্প নির্গত হয়, তাহা এই ঝুলের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া ঝুল কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম্ম—কার্ব্বণ কঠিন পদার্থ, আস্বাদহীন ও গন্ধ-বিরহিত; প্রায় সচরাচর ইহা কৃষ্ণবর্ণ; অতি সহজে ইহাকে গুঁড়া করা যায়; সকল তরল পদার্থে ইহা অদ্রব। গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারির প্রবল স্রোত দ্বারা ইহাকে কোমল করিতে পারা যায়। ইহা উত্তাপের পরঃ উপযুক্ত পরিচালক নহে, কিন্তু বৈদ্যুতিক স্রোতের উত্তম পরিচালক। ভূবায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণানুষ্ণতাতে কোন রূঢ় পদার্থের সহিত কার্ব্বণের কিছুই সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কার্ব্বণকে লোহিতোত্তপ্ত করিলে কোন কোন রূঢ় পদার্থ, বিশেষতঃ (Or) অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। যখন উত্তাপিত করা যায়,তখন C (কার্ব্বণ, দগ্ধ ও ভূবায়ুস্থ হয়, এবং প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ব্বণ অন্যান্য রূঢ় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বাইডস্ বা কার্ব্বিউরেটস্ নামে ব্যবহৃত হয়।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

বিধবা-বিবাহের উপসংহার।

আমরা বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি, এক্ষণে বর্ত্তমানবর্ষের শেষে ইহার শেষ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ দুগ্ধপোষ্য ও বাল-বিধবা রহিয়াছে, তাহাদিগকে কুমারী বোধে তাহাদিগের প্রতিপালন, শিক্ষা দান ও পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত। যে বিধবারা বয়স্কা এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণপূর্ব্বক পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারা গৃহে ও জনসমাজে পূজনীয়া আদর্শ রমণী হইয়া থাকুন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বলচিত্ত ও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অক্ষম অথচ পতি-

পুত্রবিহীনা হইয়া দারিদ্র্যে পেষিত এবং অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় অন্যের গলগ্রহ হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্র, যুক্তি ও রাজ-বিধি-বিহিত পুনর্ব্বিবাহের আশ্রয় লউন, তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ ও উন্নতি হইবে এবং জনসমাজেরও প্রভূত মঙ্গল হইবে। আমরা নিজের কথায় আর অধিক না বলিয়া স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রপ্রমাণ ও অকাট্য যুক্তিবলে বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া যে মর্ম্মভেদী হৃদয়-গলিত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় তাঁহার পুস্তকের উপসংহার করিয়াছেন, আজি তাহাই সাদরে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ৪০ বৎসরের অধিক হইল, তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আজও তাহা প্রযোজ্য। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে দেখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কয়েকটী বিধবার পরিণয় হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে ইহা আরও অধিক এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহার ব্যবস্থা কিছু কিছু অনুসৃত হইয়াছে। দিন দিন সমাজসংস্কারের পথ অল্পে অল্পে খুলিতেছে। কিন্তু আজও সমাজ সংস্কার-সম্বন্ধে অচল অটল হইয়া রহিয়াছে। কবে সমাজ উপযুক্ত ধর্ম্মসাহস অবলম্বন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে সচল ও অগ্রসর হইবেন, আমরা আশানেত্রে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি এবং মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট তাহারই জন্য কায়মনোবাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি।

উপসংহার।

দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষু-কর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠকমহাশয়-বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া হতভাগ্য বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত, অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া হতভাগ্য-বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত? এ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল

অবধি, আমাদের দেশে আচার-পরিবর্ত্তন হয় নাই, এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে এ দেশে, চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ, ক্রমে ক্রমে, আচারের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক, পূর্ব্বতন লোকদিগের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের আচারের কত পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না; এক্ষণে, সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণেরা, সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, সেই শূদ্রাধিষ্ঠিত উচ্চ আসনের নিম্নদেশে উপবেশন করেন। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, অতি অল্পকালের মধ্যেও দেশাচারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। দেখুন রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি, বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে, বৈদ্যজাতি এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না; এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনারা দেশাচার-পরিত্যাগী সদাচার-পরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না। দত্তকচন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর অবধি, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের উপনয়নযোগ্য কালমধ্যে, আর শূদ্রের বিবাহযোগ্য কালমধ্যে, গ্রহণ করিলেই দত্তকপুত্র সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সকল বর্ণেরই পাঁচ বৎসর মধ্যে গ্রহণ করিয়া, চূড়াকরণ-সংস্কার না করিলে, দত্তকপুত্র সিদ্ধ হইত না। ঐ সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হওয়াতে, তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা অনুসারে পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে, যখন আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, তখন হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রস্তাবিত বিষয়, পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা, সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন, যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত

ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচগ্রহণ না করিতেন; এবং পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে, দত্তকপুত্র সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে লোকসমাজের কোনও কালে, কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন! আপনারা ইতঃপূর্ব্বে, কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই, পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে, অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে, যখন শাস্ত্র পাইতেছেন, এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে, বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয়, স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদের কোনও মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল! বস্তুতঃ, দেশাচারের দোহাই দিয়া, আর আপনাদের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের মধ্যে অনেকে, দেশাচার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন; এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও, কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায়, কি আক্ষেপের বিষয়! দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন; দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত-বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া গণ্য মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু

লৌকিকরক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহাব ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিকরক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণমাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়। হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান! হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাই সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই, এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিকরক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি, তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচার গুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু, তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরাবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ; দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ; দৃঢ় সংকল্প করিয়া লৌকিকরক্ষা-ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ; তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক-রক্ষা-ব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

ভারতীয় পুণ্যনদী।

(৪৮৫-৮৬ সংখ্যা—২৯১ পৃষ্ঠার পর)

দেবপ্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী অলকানন্দার সহিত সম্মিলিত হইতেছে। প্রয়াগ শব্দের মৌলিক অর্থ (প্র সম্যক + যজ্ দেবপূজা করা + অ—ধি; অথবা প্র প্রকৃষ্ট + যাগ যজ্ঞ) যথায় প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ বা দেবপূজা করা হয়। ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যথায় যজ্ঞ করিয়াছেলেন। ব্রহ্মকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ডাদি তাহার প্রমাণ। গাড়োবালে আরও চারিটী প্রয়াগ আছে, তাহা

যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। দেবপ্রয়াগ অতি পবিত্র ও পরম তীর্থস্থান। সংযুক্ত ধারা এই স্থান হইতেই গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানটী সমুদ্রের সমতল হইতে ১৯৫৬ পাদ উচ্চ। হরদ্বার হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূর। সঙ্গমস্থলে যুক্ত নদীর বিস্তৃতি ২৪০ পাদ; কিন্তু ইহার বেগ এত প্রবল যে, তীর্থযাত্রিগণ একটী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া কূলে অথবা পাদার্দ্ধ জলে বসিয়া জলপাত্রে জল তুলিয়া স্নান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। একদিকে ভাগীরথী, অপর দিকে অলকানন্দা। ভাগীরথীর মূর্ত্তি অতীব ভীষণ। সমুচ্চ সানুদেশ হইতে প্রচণ্ডবেগে কলকল নিনাদে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইয়া উভয়তীরস্থ ঘন পাষাণ-প্রাচীর বিকম্পিত করিতেছে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিপর্য্যস্ত ও সঞ্চালিত হইতেছে এবং দোদুল্যমান ফেনরাজী নৃত্য করিতে করিতে অলকানন্দার বক্ষে বিলীন হইতেছে। ভাগীরথীর উভয় কূলই কৃষ্ণোপলময় মসৃণ ও প্রশস্ত। অলকানন্দার উভয় কূলও কৃষ্ণোপলময়, কিন্তু ভাগীরথীর অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় ৭০।৭৫ হস্ত ঋজুভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার আয়তনও ভাগীরথী অপেক্ষা বৃহত্তর ও সুগভীর হইলেও সঙ্গমস্থলে ইহার বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দ। পূর্ণতোয়া প্রশান্তভাবে প্রচণ্ড তরঙ্গিণী ভাগীরথীকে আলিঙ্গন করিতেছে। ইহার বিস্তৃতি ১৪২ পাদ, বর্ষাকালে জলরাশি ৪০।৫০ পাদ উচ্চ হইয়া থাকে। তরঙ্গের অপ্রাবল্য হেতু অলকানন্দায় অপর্য্যাপ্ত মৎস্য দৃষ্ট হয়। ৩।৪ হস্ত পরিমিত বৃহৎ বৃহৎ রোহিত মৎস্য ও ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ সোহয় মৎস্য সকল দলে দলে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা এত নির্ভীক ও শান্ত যে যাত্রীদিগের হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের গাত্র স্পর্শ করিলেও পলায়ন করে না। পবিত্র বোধে এখানে কেহই মৎস্য ধৃত বা আহার করে না। এখানে ভাগীরথীর বিস্তৃতি ১১২ পাদ। বর্ষাকালে ইহারও জলরাশি ৪০।৫০ পাদ উচ্চ হইয়া থাকে। উভয় নদীর উপরেই সেতু আছে। ইতিপূর্ব্বে ঝোলা বা রজ্জু-সেতু ছিল।

অলকানন্দা ও ভাগীরথী উভয় নদীর সঙ্গমস্থলেই দেবপ্রয়াগ নগর প্রতিষ্ঠিত। অলকানন্দা পূর্ব্বদিক্ হইতে এবং ভাগীরথী উত্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া পরস্পরে সরলরৈখিক কোণাকারে সম্মিলিত হইয়াছে। নদীর সমতল হইতে শতপাদ উচ্চে একটী সমুচ্চ নগ-শৃঙ্গে নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চাতের সানুমালের উচ্চতা আটশত পাদ। তীর হইতে নগর পর্য্যন্ত পর্ব্বত কাটিয়া সোপানশ্রেণী প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নগরে অধিরোহণ ও তথা হইতে সহজে অবতরণ করা যায়। গৃহসকল অসমভাবে উভয় নদীর অন্তঃকূলোপরি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থাপিত। ভাগীরথীর অভিমুখী গৃহশ্রেণী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর। অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল ও প্রস্তরনির্ম্মিত এবং ঢালু ছাদ তক্তা দ্বারা আবৃত। নগরের উচ্চপ্রদেশে রঘুনাথজীর (রামচন্দ্রের) বৃহৎ মন্দির। চারি হস্ত উচ্চ উন্নত সমচতুরস্র প্রস্তরময় আয়ত অঙ্গনের উপর মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুভ্র শিখরদেশ উজ্জ্বল তাম্রপত্রে মণ্ডিত; চূড়ায় সুবর্ণগোলক ও ত্রিশূল, পতাকাসহকারে সুশোভিত রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে প্রবেশদ্বার। তোরণের অভ্যন্তরে বিবিধ আকারের ঘণ্টা সকল দোদুল্যমান। যাত্রিগণ এই সকল ঘণ্টাবাদ্য দ্বারা আরাধ্য দেবতার বোধন সম্পাদন করিয়া থাকে। মন্দিরের পূর্ব্বভাগে গর্ভগৃহে রামচন্দ্রের পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিটী কৃষ্ণোপলে খোদিত, চারি হস্ত উচ্চ দিব্যাসনে উপবেশিত; মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ রক্ত বর্ণে রঞ্জিত। বিগ্রহের সম্মুখে, তোরণের বিপরীতভাগে, ধাতুময় গরুড়ের প্রমাণ প্রতিমূর্ত্তি। গরুড় এক হাঁটু ভূমে গাড়িয়া দুই হস্ত যোড় করিয়া প্রভু রামচন্দ্রের বন্দনা করিতেছে। মন্দিরের উচ্চতা ৭০।৮০ পাদ। উন্নত অঙ্গনের নিম্নদেশে মহাদেবের মন্দির। প্রধান পাণ্ডা বলেন যে, মন্দির ও দেবমূর্ত্তি দশ সহস্র বৎসরেরও অধিক নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও পাণ্ডাদিগের প্রাদুর্ভাব। সঙ্গমস্থলে ও তন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ড, প্রভৃতি তিনটী কুণ্ড খনিত আছে। তন্মধ্যে বশিষ্ঠ কুণ্ড অলকানন্দার উপরে এবং ব্রহ্মকুণ্ড ভাগীরথীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রীদিগকে এই তিনটী কুণ্ডেই স্নান দান ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। কুণ্ড কয়েকটি স্রোতের সমতলের কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থাপিত, সুতরাং বেগের প্রচণ্ডতা নিবন্ধন অবরোহণ অসম্ভব। যাত্রিগণের অধিকাংশই আচমন বা স্পর্শন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্প হইয়া মন্দিরের ও নগরের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। দৌলত রাও সিন্ধিয়া ব্রাহ্মণ-স্থপতি আনয়ন করিয়া আবশ্যক সংস্কারাদি করাইয়াছিলেন। এতদর্থে তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। সেবা ও যজন কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য গাড়োবাল-রাজ পঞ্চবিংশতিখানি গ্রাম দেবত্ব প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যাত্রীদের হইতেও অল্প অর্থ সংগৃহীত হয় না।

দেবপ্রয়াগে সার্দ্ধ দুইশত গৃহ আছে। অধিবাসীদিগের অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। এখানে গ্রীষ্মকালে কখন কখন গ্রীষ্মের আধিক্যও হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে ছায়াতলে তাপমান যন্ত্র (১০০°) একশত ডিগ্রীরও উপরে উঠিয়া থাকে। নগরের উচ্চতা সমুদ্রের সমতল হইতে ২২৬৬ পাদ।

ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান হইতে দেবপ্রয়াগ ন্যূনাধিক ৬০ ক্রোশ।

ইহার উপনদী।

প্রথম—কেদার গঙ্গা* ১২ ক্রোশ দীর্ঘ।

* কেদার গঙ্গা কোন কোন মতে কেবল

দ্বিতীয়—জাহ্নবী ১৫ ক্রোশ দীর্ঘ। সঙ্গমস্থল ভৈরোঘাটী।

তৃতীয়—রিতল, পার্ব্বতীয় প্রবাহ।

চতুর্থ—জলকর ১০ ক্রোশ দীর্ঘ।

পঞ্চম—বিলং, ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ।

ভাগীরথীর উপর তীর্থ, গ্রাম ও নগর।

(১) গঙ্গোত্রী—উৎপত্তিস্থান হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূর। তীর্থ।

(২) ভৈরোঘাটী—গঙ্গোত্রী হইতে ৩॥ ক্রোশ দূর। তীর্থ।

(৩) ভাতেরি গ্রাম—ভগ্ন ও পরিত্যক্ত-প্রায় গ্রাম।

(৪) সুখী—ভৈরোঘাট হইতে ৬॥ ক্রোশ। গ্রাম।

(৫) উতল—সুখী হইতে ১৮ ক্রোশ। গ্রাম।

(৬) সুরথ—উতল ,, ৭॥ ক্রোশ। গ্রাম।

(৭) তীরী—সুরথ ,, ৮॥ ,,। নগর।

(৮) দেবপ্রয়াগ তীরী হইতে ১১ ক্রোশ। তীর্থ। নগর।

তৃতীয় অধ্যায়।

অলকানন্দা।

ভাগীরথী ভগীরথ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে আনীত। কিন্তু অলকানন্দা স্বর্গঙ্গা, স্বতঃ স্বর্গ হইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছে। পুরাণে ইহার মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কোন দৈবিক বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় না, সুতরাং আমরাও তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়া ইহার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গাড়োবালের উত্তর সীমায় হিমাচলের বক্ষঃস্থিত নীহারময় হ্রদ হইতে একটী অনতিবিস্তৃত পূতধারা নিঃসৃত হইয়া কিছু দূর পূর্ব্বে সুমন্দগতিতে সরস্বতী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পূত ধারাই অলকানন্দার মৌলিক স্রোত। ইহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের সমতল হইতে ১৩৮১৫ পাদ উচ্চ। সরস্বতী গঙ্গা হিমাচলের উত্তুঙ্গ উত্তর শিখর হইতে উৎপন্ন হইয়া কয়েক ক্রোশ ১৮০০২ পাদ উচ্চদেশে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গরুড় গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গরুড় গঙ্গা একটী নীহার-গলিত ধারা মাত্র। সংযুক্ত ধারা কিয়দ্দূর দক্ষিণবাহিনী হইয়া অলকানন্দায় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক অলকানন্দা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন ভূগোলবেত্তার মতে সরস্বতী গঙ্গা ও ধৌলী নদীর সংযোগে অলকানন্দার উৎপত্তি। কেহবা ধৌলী ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে অলকানন্দার আবির্ভাব

একটী নীহার-গলিত ধারামাত্র। স্বল্পগাধ ও ৭।৮ হাত বিস্তৃত, অনধিক দুই ক্রোশ দীর্ঘ; ইহা একটি দুর্গম কন্দর হইতে নিঃসৃত হইতেছে। কিন্তু হিমালয়ভ্রমণকারী ফ্রেজার বলেন, ইহা দ্বাদশ ক্রোশ দীর্ঘ; প্রবল স্রোতস্বতী, দেবদারু পর্ব্বত (Cedar Mountain) হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গোত্রীর নিকটে ভাগীরথীর বাম দিকে পতিত হইতেছে। সামান্য বোধে যথাস্থানে প্রদর্শিত হয় নাই।

অনুমান করেন। কোন কোন মতে বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার অংশবিশেষের নাম মাত্র। কাশীস্থ পঞ্চগঙ্গা তীর্থে যেরূপ পঞ্চনদীর অস্তিত্ব কল্পিত, ইহাও তদ্রূপ। তজ্জন্য কেহ কেহ স্রোত-সরস্বতী গঙ্গা হইতে ধৌলীর সঙ্গমস্থল বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অলকানন্দার প্রকৃত মূল-দেশ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার একটী ক্ষুদ্র উপনদী মাত্র। ইহারই দক্ষিণ উপকূলে প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রম।

বদরিকাশ্রম—বর্দ্দীনাথ বা বদ্‌রীনাথ। বদরিকাশ্রম একটী পৌরাণিক তীর্থ। বদরীনারায়ণ—এখানে নারায়ণ (বিষ্ণু) তপস্যা করিয়াছিলেন এবং দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ অবস্থান করিতেন বলিয়া অদ্যাপি সাধুযতিগণ তথায় গমন করিয়া থাকেন। ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে প্রতিবর্ষে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দ্বাদশ বৎসরান্তর কুম্ভমেলা উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোকের সমাগম হয়। এখানে শীতাধিক্য প্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালীর পরদিন হইতে চৈত্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল দেবমন্দির অবরুদ্ধ থাকে। বরফ পড়িয়া পথ ঘাট দুর্গম হয়, সুতরাং এ সময়ে তথায় কেহই গমন করে না; পূজারী পাণ্ডাগণ পূজার তৈজস পাত্রাদি মূল্যবান্ সামগ্রী সকল একটি নিভৃত গুহায় আবদ্ধ করিয়া সার্দ্ধ অষ্টক্রোশ দূরবর্ত্তী ঘোষীমঠে আসিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। শীতাবসানে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দেওয়ালী পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার মুক্ত থাকে ও পূজাদি কার্য্য সকল নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়।

আশ্রমপদ—বদরীনাথ তীর্থ-নগর দুইটী উত্তুঙ্গ সানুমানের সানুদেশে প্রতিষ্ঠিত। অধিত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ক্রোশ ও প্রসার অর্দ্ধ ক্রোশ। ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত, চতুর্দ্দিক সমুচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত, নিম্নে বিষ্ণুগঙ্গা কলকলস্বরে মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নগরের উন্নত দেশের ৪০।৫০ পাদ উচ্চে, নদীর অব্যবহিত ঢালুর উপর, বদরীনাথের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের শীর্ষদেশ দেবপ্রয়াগস্থ রঘুনাথজীর মন্দিরের ন্যায় উজ্জ্বল তাম্রপত্রে আচ্ছাদিত এবং চূড়া সুবর্ণগোলক ও ত্রিশূলে সুশোভিত। চিত্রিত পতাকা তদুপরি উড্ডীয়মান। পাণ্ডাগণ বহু কালের নির্ম্মিত বলিয়া মন্দিরের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু দৃশ্যে তাহা বোধ হয় না। হিমশিলাপাতে ও ভূ-কম্পে প্রাচীন মন্দির অনেক কাল পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান মন্দির তাহারই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাও ভূকম্পে বিপর্য্যস্ত হইয়া পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বদরীনাথ বা বদরীনারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। বিগ্রহের একদিকে কুবের ও অপর দিকে নারায়ণ মূর্ত্তি। অদূরে ভিন্ন মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী প্রতিষ্ঠিত। নারদ

গুরু ও উদ্ধবের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমূর্ত্তিও বিরাজ করিতেছে। বদরীনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ পৃথক্ ভোগও নির্দ্ধারিত আছে। কথিত আছে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুগঙ্গায় স্নান করিবার সময় নদীর গর্ভ হইতে এই বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি দশবার ডুব দিয়া বিগ্রহটীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। পরে মন্দির নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে বদরী-নারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মন্দিরের কিঞ্চিন্নিম্নেই তপ্তকুণ্ড। কুণ্ডটী সম-চতুষ্কোণ, প্রত্যেক দিক্ বিংশতি হস্ত পরিমিত। কাষ্ঠের খুঁটীর উপর তক্তার ছাদের দ্বারা কুণ্ডটী সমাচ্ছন্ন। একটী উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ভূগর্ভ-নিহিত প্রণালীর দ্বারা উষ্ণ জল নীত হইয়া সর্পফণার উৎসমুখী হইতে কুণ্ডে পতিত হইতেছে। উষ্ণজলোৎপন্ন ঘন ধূমরাশি অনবরত উত্থিত হইয়া তীব্র গন্ধকগন্ধে দিক্ প্রপূরিত করিতেছে। জল এত উত্তপ্ত, যে স্পর্শ করা যায় না। তজ্জন্য অপর একটি প্রস্রবণ হইতে শীতল জল আনীত হইয়া মিশ্রিত করিয়া তাপসহ করা হইতেছে। যাত্রিগণ এই মিশ্রিত কতুষ্ণ জলেই স্নানক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তপ্তকুণ্ডস্নানের ফলও প্রত্যক্ষ। যাঁহারা মশকপ্রধান স্থানে অনাবৃত অবস্থায় কিছু-কাল বাস করিয়াছেন, অথবা সিমলা-শৈল প্রভৃতি স্থানের চিলু পীসুর সহিত পরিচিত আছেন, তপ্তকুণ্ড-স্নানের সদ্যো-জাত জোঁ—র কষ্ট তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে সমর্থ। জোঁ একপ্রকার কীটাণু ও সমধিক কষ্টদায়ক। বস্ত্রে ও গাত্রে (চর্ম্মে) সংলগ্ন হইয়া অনেক দিন ধরিয়া কষ্ট দিয়া থাকে। ইহারা বোধ হয় জোঁকের সূক্ষ্মরূপধারী। তপ্তকুণ্ড-স্নান ইহাদিগের জন্য চিরস্মরণীয়। নিকটেই ব্রহ্মকপালী। এখানে তর্পণ ও গয়ার ন্যায় পিণ্ডাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ভারতে পিতৃপুরুষদিগের প্রেতত্ব মোচন বা উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক তীর্থ নিরূপিত আছে। প্রসিদ্ধ গয়াক্ষেত্র, কাশীস্থ পিশাচ-মোচন, কুরুক্ষেত্রে আপ্‌গয়া ও বদরীনাথে ব্রহ্মকপালী তন্মধ্যে প্রধান। এখানে আরও পঞ্চতীর্থ ও পঞ্চশিলা আছে। পঞ্চ-তীর্থ—যথা ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদ-ধারা, সৌরীকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড। অতিরিক্ত নারদকুণ্ডও একটী প্রধান তীর্থ। পঞ্চ-শিলা—যথা গরুড়-শিলা, নারদ-শিলা, বারা-শিলা, মার্কণ্ড-শিলা ও নৃসিংহ-শিলা। ভারতের পরমতীর্থ ও উত্তর খণ্ডের মহা-স্থলী বলিয়া বদরীনাথ বৈকুণ্ঠ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও জাতিবিচার নাই। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই সমভাবে অসঙ্কোচে একত্রে আহার বিহার করিয়া থাকে। যাত্রিদত্ত পূজা ও উপহার ব্যতীত গাড়োয়াল ও কুমায়ুন প্রদেশে ২২৬খানি গ্রাম দেবত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল গ্রাম গাড়োয়াল-রাজ বদরীনারায়ণের সেবার্থ প্রদান করিয়াছেন। পূজারী ও পাণ্ডাগণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। প্রধান পাণ্ডা

রাওল নামে পরিচিত। সকল পাণ্ডাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। সকলেই চিরকৌমার-ব্রতধারী, তজ্জন্য অধিকাংশই দুশ্চরিত্র। তীর্থের মাহাত্ম্যে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় বলিয়াই বুঝি মহাপীঠ ও প্রধান তীর্থ-স্থানে পাপ পুণ্যের বিচার নাই। বদরী-নাথ যাইবার পথ দুর্গম না হইলেও বড়ই কষ্টকর। হনুমানচটী হইতে আরম্ভ হইয়া ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ পথ "চড়াই" উপরে উঠিয়াছে। ইহা গাড়োবাল-রাজ-ধানী শ্রীনগর হইতে ২৮ ক্রোশ দূর। বদরীনাথের মন্দিরের ছয় ক্রোশ পশ্চিমে ছয়টী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত আছে। ইহারা বদরীনাথ শৃঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের উচ্চতা ২২০০০ পাদ হইতে ২২৫০০ পাদ। ইহার নৈঋত কোণে ও তিন ক্রোশ দূরে আর একটী শৃঙ্গ আছে, তাহার উচ্চতা ২১,৩৮৫ পাদ। বদরীনাথের পশ্চিম হিমাচলে অনেকগুলি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—

নন্দদেবী	উচ্চতা	২৫,৬৬১ পাদ
কমেত	,,	২৫,৪১৩ ,,
ত্রিশূল	,,	২৩,৩৪২ ,,
ধূন গিরি	,,	২৩,১৮১ ,,
বদরীনাথ	,,	২৩২১০ ,,
কেদারনাথ	,,	২২,৮৫৩ ,,

রেল হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের অপকারিতা।

শ্রীক্ষেত্রে রেল হওয়ায় রেল-কোম্পানীর যথেষ্ট আয় হইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষেও অতিশয় সুবিধার কারণ হইয়াছে। কিন্তু রেল হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের যত অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা স্মরণ হইলে বড় কষ্ট হয়। শ্রীক্ষেত্র অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। সমুদ্রের হাওয়া যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি উষ্ণ ও পাচক। শ্রীক্ষেত্রে তুলসীগাছ বড় বেশী, ধূপের গন্ধে ত্রিসন্ধ্যাতেই সহরের অধিকাংশ স্থানই সুরভিত। তুলসীপত্রের হাওয়া অতি পরিষ্কার। অনেক দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানও নির্ম্মাল্য চন্দনের সুগন্ধে সুরভিত। এই সব কারণেই হয়ত শ্রীক্ষেত্রের স্বাস্থ্য এত সুন্দর। কিন্তু হায়! রেল হওয়া অবধি অনেক লোকের সমাগমে শ্রীক্ষেত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যোগের সময় শ্রীক্ষেত্রের দুর্দ্দশা এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। প্রত্যেকবার রথের সময় মহামারী উপস্থিত হয়। শ্রীক্ষেত্রে কলেরাত একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। সময় সময় বসন্তও উপস্থিত হয়। প্লেগটা বাকী ছিল, এবার দোলে প্লেগটা দেখা দিয়াছিল। দোলের একদিন পূর্ব্ব হইতেই ইন্দুর বিড়াল মরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বসন্তেরও খুব ধুম লাগিয়াছিল।

এবার দোলযাত্রায় ৭০ হাজার যাত্রী হইয়াছিল। দিনে তিনবার স্পেশেল ট্রেণ

কলিকাতা হইতে পুরী যাতায়াত করিত। এত লোকের একত্র সমাবেশে কেনই বা কলেরা, বসন্ত ও প্লেগের আবির্ভাব না হইবে?

কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যাত্রীর পরিমাণ বুঝিয়া ট্রেণ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কাহারও হয়ত এরূপ ইচ্ছা নয় যে, শ্রীক্ষেত্রে একটা ভীষণ মহামারি উপস্থিত হইয়া দেশ ছার খার হয়, অযথা লক্ষ লোকের প্রাণসংহার হয় এবং নানারূপ সংক্রামক রোগে এমন সুন্দর শ্রীক্ষেত্র শ্রীহীন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়ায়। এখনও শ্রীক্ষেত্রে রীতিমত প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখনও সতর্কতার যথেষ্ট সময় আছে। দোলের সময় কিঞ্চিৎ প্লেগ দেখা দিয়াছিল, রথের সময় হয়তো প্লেগ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বসিবে এবং অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিবে। সোণার শান্তিকুঞ্জে অশান্তির অনলবৃষ্টি হইবে। হায়! হায়! সে দুঃখের কথা স্মরণ হইলেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। গয়ায় প্লেগ ধরিয়াছে, বৈদ্যনাথেও প্লেগ হইয়াছে, শ্রীক্ষেত্র কেবল আপনার স্বাস্থ্যবলে এখনও একরূপ ভাল আছে, কিন্তু এই বার রথের সময় হইতেই যদি কর্ত্তৃপক্ষ সাবধান না হন, তবে অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের মত স্বাস্থ্যকর স্থানেও প্লেগ ধরিবে, পশ্চাৎ শত জলের শত চেষ্টাতেও কোনও ফল দর্শিবে না।

রেল-কোম্পানির আয়ের জন্য শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের প্রত্যেক পর্ব্ব উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রী যাইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় না। এক স্থানে এত লোকের মিলনই সর্ব্বনাশের মূল।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস।

নলিনীর শিক্ষা।

১

বেলা চারিটার সময়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছুটী হইয়া গেল। সব মেয়েরা আপনাপন বাসায় চলিল। তন্মধ্যে একটি বালিকা কিছুদূর গিয়াই পুনরায় বালিকা-বিদ্যালয়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। দেখিল প্রায় সকল মেয়েই চলিয়া গিয়াছে, দুই চার জন বাকী রহিয়াছে, তাহারাও যাইবার জন্য উদ্যত। একটী বালিকা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ঐ বালিকার মুখ রাগে রক্তবর্ণ হইল। বালিকার নাম নলিনী। সে খুব বড় লোকের মেয়ে। পড়াশুনায় নলিনীর মোটেই মন নাই, বরং বড়লোকের মেয়ে বলিয়া সে স্কুলের সকল মেয়েকেই ঘৃণা করিত।

নলিনী সেই বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এক মুষ্টি বালুকা লইয়া বালিকার

গায়ে ছিটাইয়া দিল। বালিকাটী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল "ভাই নলিনি। তুমি আমার গায়ে ধূলা দিলে কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি?"

হাসিতে হাসিতে নলিনী বলিল "বেশ করিয়াছি, স্কুলে আমি শ্লেটে অঙ্ক না কসিয়া ছবি আঁকিতেছিলাম, তা তুই গুরুমাকে বলে দিলি কেন?"

বিভাবরী বলিল "সেত তোমার ভালর জন্যই বলিয়াছিলাম।"

নলিনী আমিত তোর কাপড় ময়লা কর্‌বার জন্য ধূলো দিয়েছি, আরও দিব বলিয়া আরও এক মুষ্টি ধূলা বিভার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

বিভাবরী খুব শান্ত, ধৈর্য্যশীলা ও নিরীহা বালিকা। এই জন্য নলিনী প্রায়ই বিভার উপর সকলের চেয়ে বেশী অত্যাচার করিত। কিন্তু বিভা কোনও দিনও নলিনীর প্রতি কোনও উচ্চ বাচ্য করে নাই।

বিভার পিতা ২৫৲ টাকা মাহিনার একটি ছোট চাকরি করিতেন। নলিনী ও বিভা এক ক্লাসেই পড়িত। লেখা পড়ায় বিভার খুব মন।

বিভা গায়ের ধূলা গুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাসায় চলিল।

২

বিভা বাসায় গেল। বিভার মা বলিলেন—বিভা! তোর মুখখানি এত বিষণ্ণ কেন বাছা! ওমা! কাপড়ে এত ধূলো লাগিল কি করে? বুড়ো মাগী হয়েছ, তবু একটু জ্ঞান নেই? আর কি প'রে স্কুলে যাবি বল দেখি, ভাল কাপড় আর যে বাক্সে নাই।

বিভা। না মা! আমি কাপড়ে ধূলো লাগাই নাই, নলিনী দিয়েছে।

মা। নলিনী কে?

বিভা। স্কুলের একজন ছাত্রী, ঐ যে সে দিন সে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছিল।

মা। সে মেয়েটা ত বড় বজ্জাৎ, তা গুরুমাকে বলে দিস্‌নে কেন?

বিভা। না মা! তা হলে কি হয়? নলিনী তার বাপ মায়ের বড় আদুরে মেয়ে, তাকে কিছু বল্লে, তার ভাইরা এসে গুরু মাকে কত কি বলে। তাই গুরু মা নলিনীকে বেশী কিছু বলেন না।

"তুই তার সঙ্গে যাস্‌নে" বলিয়া বিভার মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে বিভা স্কুলে চলিল। স্কুলে সে সবার চেয়ে ভাল ছাত্রী, গুরুমা তাহাকে খুব ভালবাসেন।

বিভা স্কুলে গিয়া লতিকা-নাম্নী একটী বালিকার নিকট নলিনীর বালি দেওয়ার কথা বলিল। লতিকা তৎক্ষণাৎ গিয়া গুরুমাকে বলিয়া দিল।

গুরু মা নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "নলিনী! তুমি বিভার গায়ে বালি দিয়াছ?"

নলিনী। হ্যাঁ দিয়েছি বৈকি।

গুরু মা। কেন দিয়াছ?

নলিনী। আমার ইচ্ছা।

গুরু মা। আজ তুমি সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকিবে।

নলিনী প্রথমতঃ ভাবিল বিভা বলিয়া দিয়াছে; তৎপরে যখন শুনিল বিভা বলে নাই লতিকা বলিয়াছে, তখন সে মনেমনে বলিল 'এর প্রতিশোধ লইতেই হইবে।'

গুরু মা পড়া দেখাইয়া দিলেন, রাগে পড়ার কথা নলিনীর মনে রহিল না।

স্কুলের ছুটী হইবামাত্র নলিনী বাহিরে আসিয়া লতিকাকে খুঁজিতে লাগিল। লতিকা নলিনীর ভয়ে একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল, নলিনী বাসায় গেলে সে বাসায় যাইবে এই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু নলিনী গাছের অন্তরাল সত্ত্বেও লতিকাকে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল। বৃক্ষের নীচে লতিকার শ্লেট বই ছিল, লতিকা তাহা পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া নলিনীর দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল। নলিনী লতিকার কাছে আসিয়া বলিল "পোড়ারমুখী! আমি বিভার গায়ে বালি দিয়াছিলাম তা তোর এত মাথাব্যথা কেন? তা তুই গুরু-মাকে বল্‌লি কেন?"

লতিকা। পোড়ারমুখী! তুই আমাকে পোড়ারমুখী বলবার কে? গুরুমার কাছে বলে বেশ করেছি।

তখন দুইজনে মারামারি হইতে লাগিল, নলিনী লতিকার সঙ্গে না পারিয়া লতিকার পশ্চাদ্দিক্ হইতে একখানি বই লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, লতিকাও তাহার বই ছিঁড়িতে যাইতেছিল, কিন্তু নলিনী দৌড়িয়া অন্য পথে চলিয়া গেল।

৩

নলিনী এ পর্য্যন্ত স্কুলে কাহারও মার বা গালি খায় নাই, সকলেই তাহার মার্ ও গাল খাইয়াছে—শব্দটী করে নাই। আজ লতিকার মার্ ও বকুনি খাইয়া নলিনীর বড় রাগ হইল, সে ভাবিল ইহার শাস্তি দিতেই হইবে।

বাসায় গিয়া নলিনী দেখিল মা ঘুমাইতেছেন। সে বই রাখিয়া মেজের উপর পা ছড়াইয়া কান্দিতে লাগিল।

মাতার ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি নলিনীকে কান্দিতে দেখিয়া বলিলেন "নলিনি! কান্দ কেন মা?"

নলি। "লতিকা মেরেছে।"

মা। লতিকা কে?

নলি। স্কুলের একজন ছাত্রী।

মা। তোকে মার্‌লে কেন?

নলি। শুধু শুধু।

মা। শুধু শুধু কি মানুষ মানুষকে মার্‌তে পারে?

নলি। সে পড়া পারে নি, আমি পেরেছি, তাই আমাকে মেরেছে।

মা। তুই মারলিনে কেন?

সাধুতার ভান করিয়া নলিনী বলিল "আমি কাউকে মারি নে। মা! ছোট দাদা আসুক, তাকে তুমি লতিকাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। ছোট দাদা গিয়ে লতিকার বাপ মাকে লতিকাকে শাসন করতে বলে আস্‌বে।"

মা। তুই লতিকাদের বাড়ী চিনিস্?

নলি। না চিনিলেও তার বাপের নাম যদুপতি রায়। সে উকীল, ছোট দাদা চিন্‌বে না?

মা। জ্যোতি আসুক ত?

এমন সময় নলিনীর ছোট দাদা জ্যোতি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। নলিনীর মা তাহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

"আমি যদুপতি বাবুর বাসা চিনিনে" বলিয়া জ্যোতি চলিয়া গেল।

জ্যোতি আলস্যবশতঃ বলিল সে যদু বাবুর বাসা চিনে না। নলিনী ভাবিল সত্যই জ্যোতি যদুবাবুর বাসা চিনে না। সে বলিল মা! আমি কাল লতিকাদের বাসায় গিয়ে সে বাসা চিনে আসব।

"সেই ভাল বাছা" বলিয়া মা মুখ-প্রক্ষালনের জন্য বাহিরে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় যখন নলিনীর মাষ্টার নলিনীকে পড়াইতে আসিলেন, তখন নলিনী বড় মুস্কিলে পড়িল, গুরু-মা কতটুকু পড়া দিয়াছেন, তা ত নলিনীর মনে নাই।

নলিনী পড়ার কথা মাকে বলিল। মা বলিলেন "তা তুই কি তোদের ক্লাসের কোনও মেয়ের বাসা চিনিসনে?"

নলিনী শুধু বিভাদের বাসা চিনিত। কিন্তু সেত সেদিন বিভার গায়ে ধূলা দিয়াছিল, আরও কত দিন কত লাঞ্ছনা করিয়াছে, বিভাও যদি আজ পড়া না দেখাইয়া দেয়। কিন্তু কি করে, নলিনী সাহসে ভর করিয়া বিভার বাসায় চলিল। বিভা তাহাদের বাসায় নলিনীকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহার হাত ধরিয়া মাদুরে বসাইয়া বলিল "ভাই নলিনি! আজ কি জন্য এখানে আসিয়াছ? বিভার কথায় নলিনীর মন গলিয়া গেল। মৃদুস্বরে সে বলিল "কতটুকু পড়া ভুলিয়া গিয়াছি।" বিভা সাদরে নলিনীকে পড়া দেখাইয়া দিয়া তাহাকে বাসায় রাখিয়া আসিবার জন্য তাহার সঙ্গে চলিল। কিছু দূরে গিয়াই মুখরা নলিনীর বিভার উপরে রাগ হইল, মনে মনে বলিল পোড়ারমুখী আবার পথ দেখাইতে আসিয়াছেন। আমি আর পথ চিনিনে। প্রকাশ্যে বলিল বিভা! তুই বাড়ী যা।

বিভা। একা যেতে পারবেত?

নলিনী। পোড়ারমুখী! যা শিগ্‌গির বল্‌ছি।

বিভা। আমি যাচ্ছি, তুমি যাও।

"গেলিনে দাঁড়া" বলিয়া নলিনী একটী ঢেলা লইয়া বিভার গায়ে ছুড়িয়া দিল। বিভার হাঁটুর উপর ঢেলাটি লাগিয়া ছাল উঠিয়া রক্ত বাহির হইল, চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল, বিভা ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

৪

পর দিন আবার স্কুল হইল। আবার ছুটী হইলে নলিনী লতিকার নিকটে গিয়া বলিল "লতিকা! চল্ তোদের বাড়ী কেমন দেখে আসি।"

লতিকা ভাবিল নলিনীকে জব্দ করিবার

নলিনী। আমার ইচ্ছা…

গুরু মা। আজ …

দাঁড়াইয়া থাকি…

নলি…

না… পথ চিনিনে।

লতিকা। না চি… এইখানে বসে বসে আমার বই ছিঁড়্বার সুখ বোঝ।

নলিনী বুঝিল লতিকা প্রতিদান লইতে চাহে। সে প্রথমে রাগারাগি, পরে বিনয় করিতে লাগিল। লতিকা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নলিনী রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল পরিচিত লোক দেখা যায় কি না। নলিনী দেখিল বিভাবরী তাহার ছোট ভ্রাতার জন্য বাজার হইতে মিছরী কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। নলিনী ভাবিল বিভাও লতিকার মত করিবে। কিন্তু বিভা যাই দেখিল নলিনী বি…ণ্ণ-মুখে সেই যায়গায় বসিয়া রহিয়াছে, অমনি নলিনীর নিকটে গিয়া বলিল "নলিনি! তুমি এখানে এরূপভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন?"

নলিনী লতিকার কথা বিভার কাছে …বিভা লতিকাকে মন্দ বলিতে …নলিনীকে লইয়া নলিনীদের বাসায় …। বাসায় পঁহুছিয়া কৃতজ্ঞতায় …নীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। বিভাকে … সে এত অপমান করিয়াছে, আর বিভা না কি এত অপমান সত্ত্বেও তাহার প্রতি এত স্নেহ প্রকাশ করিতেছে! নলিনী বিভার হাত ধরিয়া বলিল, বিভা! বিভা!! আমি কেন তোমার মত হইলাম না? তুমি দেবী, আজ হইতে তুমি আমার ও আমি তোমার ভগিনী হইলাম।

বিভা সেবার পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে, নলিনী হয় নাই। কিন্তু নলিনীর চরিত্র এখন বড়ই মধুর। সে এখন আর সে নলিনী নাই।

একদিন স্কুলের পর সব ছাত্রীরা একত্র হইয়া ঘুঁটি খেলিতেছিল, খেলিতে খেলিতে দুইটী বালিকায় বিবাদ আরম্ভ হইল। কিন্তু নলিনী—সেই নলিনী আজ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিল।

শিক্ষয়িত্রী বিবাদের ওস্তাদ নলিনীর এরূপ পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও নলিনীকে পুরস্কার স্বরূপ একখানি গার্হস্থ্য শিক্ষা কিনিয়া দিলেন। নলিনী সরল ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিতে লাগিল "আমি মন্দ ছিলাম, বিভার দৃষ্টান্তে এখন ভাল হইয়াছি।"

কুমারী সুরুচি।
মেদিনীপুর।

পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতীর স্মারক কীর্ত্তি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কাশীধামে ভ্রমণে গিয়া স্বর্গগত পরমহংস ভাস্করানন্দের স্মৃতি-চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি। বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে, তাঁহার শিষ্য ও স্থলাভিষিক্ত শ্রীমন্-মৈথিলী স্বামী মহাশয় গুরুদেবকে চির-স্মরণীয় করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নশীল। ভাস্করানন্দের সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি, ছবি ও পূজা অর্চ্চনার স্থান রহিয়াছে। ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট নন। যাহাতে স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি হয় এবং জনসাধারণের উপকার হয়, তজ্জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা আয়োজন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও বন্ধুর পত্র নিম্নে প্রকটন করিতেছি।*

পরমহংস ভাস্করানন্দের তিরোভাবের পর অবধি তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীস্বামী স্বয়ং প্রকাশানন্দ মৈথিলী মহোদয় গুরু-দেবের স্মারক কীর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহী হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাস্কর-পাঠশালা (কলেজ) ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা ৪০০ চারিশতেরও অধিক এবং দশজন সুযোগ্য অধ্যাপক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি জটিল শাস্ত্র সকলই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় বিষয়। কোবিদ-প্রবর স্বামীজী স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। অনেক সদাশয় শিষ্য সাধ্যমত অর্থানুকূল্য করিতেছেন। পাঠশালাটি তিন বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। দিন দিন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, ইহার জন্য একটী স্বতন্ত্র উপযুক্ত বাটীর নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য একটী বৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদর্থে প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। অধ্যাপনা, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি পাঠশালা সংক্রান্ত মাসিক ব্যয়ের সমষ্টিও ছয়শত টাকা। ইহার জন্য সার্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন। তাহার সুদ হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। স্বামীজী তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্। তাঁহার গুরুদেব ও তাঁহার নিজের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল সদাশয় মহারাজা, রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য ভক্ত আছেন, তাঁহারা মনোযোগী হইলে অনায়াসে এই অর্থ সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ তিনি আশা করেন যে, কাশীর ও অযোধ্যার মহা-রাজা এবং আমেতি, প্রতাপগড়, প্রয়াগপুর ও বলরামপুর রাজগণ হইতেই আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। ইতিমধ্যে

* এই পত্র কিছুদিন পূর্ব্বে সঞ্জীবনীতেও মুদ্রিত হয়।

কয়েক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং মাসিক অর্থানুকূল্যও নিয়মিতরূপে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় স্মারক কীর্ত্তি পরমহংস দেবের সমাধি-মন্দির। কাণপুরের বিখ্যাত বণিক্ গয়াপ্রসাদ এতদর্থে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার উইলের প্রতিবাদ করাতে এতদিন উক্ত টাকা আদালতে আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে ও উইল সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমেতির রাজা আনন্দ-বাগ প্রদান না করিলে, সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ হইবে না, উইলে এইরূপ নির্দ্দেশ থাকাতে শ্রীমন্-মৈথিলী স্বামী মহোদয় বিশেষ যত্ন ও অনুরোধ দ্বারা আমেতি-রাজের সম্মতি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং শীঘ্রই মন্দির নির্ম্মাণ হইবে। এই আনন্দ-বাগেই পরমহংস দেব জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই স্থানেই তাঁহার স্থূল দেহ সমাধিস্থ আছে। এখানে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, আরতি, ভোগ, ইত্যাদি নিত্যকার্য্য সকল নিয়মিতরূপে রাজব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তদর্থে দেবল, ভৃত্য প্রভৃতিও নিযুক্ত আছে। আনন্দবাগ উদ্যানটি অতি রমণীয় স্থান, দুর্গাকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্থাপিত। এখানে আগমন মাত্রেই মনে অভূত আনন্দ অনুভূত হইয়া আনন্দবাগ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। মৈথিলী স্বামীজি বলেন, সন্ধ্যার পর হইতে যতই রজনী বৃদ্ধি হয়, ততই যেন আনন্দবাগে আনন্দের স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়। স্থানের মাহাত্ম্যেই হউক, অথবা সাধুসমাগমজনিতই হউক, বাস্তবিক আমরা অনেক দিন স্বামীজির প্রসাদে পবিত্র পরমানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। স্বামীজি সমাধিমন্দির সংস্থাপনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র। সত্বরেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে।

তৃতীয় স্মারক কীর্ত্তি ভাস্কর অন্নছত্র। ইহার জন্যও উক্ত মহাত্মা গয়াপ্রসাদ বার্ষিক সার্দ্ধ তিন সহস্র (৩৫০০) টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিগত বিজয়া দশমীর দিন হইতে ছত্রের কার্য্য চলিতেছে। প্রত্যহ ভাস্কর-পাঠশালার ২৫ জন দরিদ্র বিদ্যার্থীর ভোজ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বর্ণ নির্ব্বিশেষে ৭০।৭৫ জন দরিদ্র ও অনাহূত দীন ব্যক্তিকে ভোজ্য বিতরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ উভয় কালেই ভোজ্যদানের নিয়ম করা হইয়াছে। এরূপ উদার ব্যবস্থা বড়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু কেবল ভোজ্য বিতরণ না করিয়া অন্নদানেরও ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। অন্নদানই অন্নছত্রের উদ্দেশ্য। অনাথ দীন দরিদ্র প্রস্তুত অন্নেরই প্রত্যাশী। বিশেষতঃ অনেক বিদ্যার্থী ও বিপন্ন অনাহূত তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে। রন্ধনের স্থানাভাবে ভোজ্য তাহাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

ভাস্কর-পাঠশালার সাহায্যার্থে রামব্রহ্ম উপাধ্যায় নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি মাসিক তিন শত টাকা ব্যয়ে একটী স্বতন্ত্র অন্নছত্র খুলিতেছেন। প্রবাসী দরিদ্র ছাত্রগণ ইহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

পালামৌর বন্যজাতি।

(৪৮৫-৮৬ সংখ্যা—৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

বন্য মনুষ্যগণ নিম্নলিখিত কয়েক জাতিতে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—খেরওয়ার, চেরো, কোরওয়া, ধাঙ্গুক, ভুঁইয়া, ধাঙ্গড়, কোল, ওরাউন, হোস, খিরউয়ার, ভোক্তাস, ডোম, কাহার ইত্যাদি। তন্মধ্যে চেরো, ভোক্তাস ও ওরাউন এই তিন সম্প্রদায় আদিমনিবাসী ও বহু প্রাচীন। চেরো সম্প্রদায়ের উৎপত্তি-স্থান ও আগমন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট যে কয়েকটী জাতির বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই বলিব। ভোক্তাস ছোট নাগপুর বিভাগে সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে পালামৌতে দৃষ্ট হয়। উহারা বহুকাল হইতে পালামৌতে বাস করিতেছে। উহারা রোহিতাস পর্ব্বত হইতে আগমন করে—ইহাদিগকে খিরওয়ারও বলা হয়। তাহারা খিরওয়ার পর্ব্বতে পূর্ব্বে বাস করিত এবং তন্নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্য তাহাদের নামানুসারে সম্ভবতঃ খিরা হইয়াছে। খিরওয়ার সন্নিকটবর্ত্তী তুরকী-রাজ, হাজারিবাগের পশ্চিমে অবস্থিত কুণ্ডারাজ এবং পালামৌ অন্তর্গত চিচারির (ভায়া রাজা) উক্ত জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ভোক্তাসগণ সচরাচর ঘোর কৃষ্ণকায়, বিরাটমূর্ত্তি ও কদাকার। তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ তাহাদের নহে, কারণ তাহারা কালের পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া সেই সেই জাতির ভাষা ও আচার কয়েকটী গ্রহণ করিয়াছে—কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীও হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পর যাহারা কোন কারণে সমাজ ও জাতিচ্যুত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকেই কোল বলা হয়। কোল অর্থ "হিন্দুসমাজ-চ্যুত।" ছোট নাগপুরের কোলদিগকে ওরাউন বলা হয়। হোস সম্প্রদায় আর্য্যগণের সমাগমে তাহাদের আদিম স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া কতক সিংহভূমে ও কতক পালামৌতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইহারা সূর্য্যদেবের উপাসক—তীর ধনুক, ও কুঠার ইহাদের কেবল মাত্র

অন্ত্র। ইহাদিগকেও কোল শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। বন্য ও কোলদিগের মধ্যে ইহারা সুশ্রী ও দীর্ঘাকৃতি।

ডোমদিগের বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন—কারণ ডোম সর্ব্ব দেশেই আছে। ইহারা কুকুর মাংস ভক্ষণ করে। এই সকল বন্যজাতি সভ্য ও শিক্ষিত মনুষ্য সমাগমের পূর্ব্বে বড়ই নিরীহ, সত্যপ্রিয় ও সরলপ্রকৃতি ছিল। এখনও অনেক স্থানে তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের ন্যায় অন্যায় বুঝিবার ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির বড়ই অভাব। ক্ষুধার সময় সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য না থাকিলে অসঙ্কোচে পরের খাদ্য উঠাইয়া লইয়া ভক্ষণ করে। না বলিয়া লইলে যে চুরি করা হয় অথবা কাড়িয়া অপরের দ্রব্য ভক্ষণ করা যে অন্যায়, ইহা তাহাদের বিবেক বলিয়া দেয় না। তাহাদের ভাবে বোধ হয় যেন সমস্তই আপনার—পর বলিয়া একটা কোনও বস্তু নাই। আমার সম্মুখে খাদ্য নাই, তোমারটা সম্প্রতি খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম, সময়ান্তরে তোমার না থাকিলে আমারটা অনায়াসে বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে পার। বাস্তবিক ইহারাই হিতোপদেশের "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। চিন্তাশক্তির অভাবে ভবিষ্যৎ কদাপি চিন্তা করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী প্রকৃত ঘটনা নিম্নে দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কোন এক অরণ্যে সরকারী কার্য্যে গিয়াছিলেন। বৃক্ষের নিম্নে ও ইন্‌স্‌পেক্‌সন বাঙ্গলার চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি বন্যকে অত্যন্ত শীতহেতু স্ত্রীপুত্রসহ কাঁপিতে ও আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়া তিনি বড়ই দয়ার্দ্র হইয়া সকলকে এক একখানি কম্বল বিতরণ করিলেন। উহারা কম্বলে দেহাবৃত করিয়া দারুণ শীত হইতে রক্ষা পাইয়া বড়ই চমৎকৃত হইল—সাহেবের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ কিংবক্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। পরে নরনারী শিশু একত্র হইয়া আনন্দধ্বনি ও সাহেবের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করতঃ নিজ ভাষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে ধন্যবাদসূচক সঙ্গীত করিয়া চলিয়া গেল। উক্ত সাহেব পর বৎসর গ্রীষ্মের সময় পুনরায় সেই স্থানে গিয়া কম্বল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাহারা বলিল "তাহার পর আর আবশ্যক না হওয়ায় সেই সমুদয় কম্বল ফেলিয়া দিয়াছি।" সাহেব তাহাদের চিন্তাশক্তির এতদূর অধোগতি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। আহা! আজ কাল আর সে দিন নাই। দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন, মূর্খ, নিরীহ জীব বলিয়া ইহারা সভ্য ও শিক্ষিত লোকদিগের নিকট দয়ার পাত্র না হইয়া নিষ্ঠুরভাবে সর্ব্বদা নিপীড়িত হইয়া থাকে—অশ্বাভাবে পশুর ন্যায় শকট টানাইয়া পারিশ্রমিক পরিবর্ত্তে পদাঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত করা হয়—আরও সময় সময় হাকিম কর্ত্তৃক বিশেষ "হাকিমের পেয়াদা" কর্ত্তৃক যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহারিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

বেগারী ধরা প্রথাটা অত্যন্ত কদর্য্য ও শোচনীয়।

এই দেশের প্রচলিত পয়সাকে "কাঁচ্চা" বলিয়া থাকে, তাহা অনেকটা গোরক্ষপুরী পয়সার ন্যায়। উক্ত দুই কাঁচ্চা একত্র হইলে তাহারা উহাকে এক টাকা বলে। বন্যেরা কাঁচ্চা পর্য্যন্তই চিনে, ইহার পর কোন খোঁজ রাখে না। ১৲ টাকায় কখন ২৭ গণ্ডা, কখন ৩০ গণ্ডা, কখন বা ২৫ গণ্ডা করিয়া কাঁচ্চা পাওয়া যায়। ১॥ কাঁচ্চায় এক পয়সা। আমাদের দেশী অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত পয়সাকে ইহারা বড় পয়সা বলে। এই বন্যদিগকে পুরস্কার বা পারিশ্রমিক স্বরূপ কাঁচ্চা না দিয়া আধুলি, সিকি বা দু'আনি দিলে উহারা ফেলিয়া দেয় বা অলঙ্কারজ্ঞানে বন্যনারীদিগের কপালে লাগাইয়া দেয়। ইহাদের সখও বিলক্ষণ আছে—কেহ লাল বা পীতবর্ণের কাপড় দিলে প্রীত হয়—বোম্বাই সাড়ীর ন্যায় মূল্যবান জ্ঞানে যত্নে উঠাইয়া রাখে, কোন পর্ব্ব বা আমোদ উপলক্ষে স্ত্রীকে পরায়। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গ উল্‌কিতে পরিপূর্ণ। একবার একটী সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাকে দেখিলাম। তাহার পিতা মাতা তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়াছে এবং একজন (যাহার উল্কি পরান কাজ) সূচিকা দ্বারা সমস্ত শরীর বিদ্ধ করিয়া কোন স্থানে তাহাদের দেবীমূর্ত্তি, কোন স্থানে ত্রিভুজাকার ইত্যাদি নানা চিত্র অঙ্কিত করিতেছে এবং সেই বালিকা রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেছে—কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ উহা না হইলে স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না।

বিজ্ঞান-রহস্য।

দেহতত্ত্ব—মস্তিষ্ক।

মস্তকের করোটি মধ্যে সূক্ষ্ম সূত্রসমষ্টির ন্যায় শিরাময় যে তরল পিণ্ড অবস্থিতি করে, তাহাই মস্তিষ্ক। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা ঘৃতবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া সামান্য কথায় ইহাকে মস্তকের ঘৃত বা মগজ বলিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড যেরূপ রক্তাধার, রক্তধারা বেগে তথা হইতে সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয়; মস্তিষ্কস্থ সূক্ষ্ম শিরাসকলও তদ্রূপ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মস্তিষ্ক-সাপেক্ষ বলিয়া ইহা বোধশক্তির আধার; এ জন্য ইহাকে মন ও বুদ্ধিস্থানও বলিয়া থাকে। শরীরের সার অংশ ও জীবনীশক্তির উৎস বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে করোটির অস্থিময় নিভৃত গহ্বরে মস্তিষ্ক রক্ষা করিয়াছেন। ইতর ও শ্রেষ্ঠ সকল জন্তুরই মস্তিষ্ক আছে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক বড়। রুষীয় বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক দরকেভিচ মস্তিষ্ক-তত্ত্ব অনুসন্ধান

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুরুষের মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা গড়ে ১৩৫ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় তিন ছটাক অধিক ভারী। ব্যবচ্ছেদবেত্তা বিস্চফ্ বলেন যে, নারী-জাতির মস্তিষ্ক পুরুষজাতির মস্তিষ্ক অপেক্ষা নবমাংশ হইতে দ্বাদশাংশ অল্প। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সভ্যতার তারতম্যে মস্তিষ্কের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বর্ব্বর অস্ট্রেলিয়াবাসী পুরুষের মস্তিষ্ক তত্রত্য নারীর মস্তিষ্কাপেক্ষা ·১০৭ কিউবিক সেন্টিমিটর বড়। সেন্টিমিটর প্রায় ·৩৯ ইঞ্চ দীর্ঘ। অর্দ্ধসভ্য মিসরদেশীয় পুরুষের মস্তিষ্ক স্ত্রীর মস্তিষ্কাপেক্ষা ·১৩৭ সেন্টিমিটর, এবং সভ্যতম পারিস নগরবাসী ফরাসীর মস্তিষ্ক তত্রত্য সভ্য রমণীর মস্তিষ্কাপেক্ষা ·২২২ সেন্টিমিটর বৃহৎ। ইতর জন্তুদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ এই প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে,* যথা—

বিড়াল—ইহার	মস্তিষ্কের গুরুত্ব	২৮	গ্রাম।
কুক্কুর ...	মস্তিষ্কের গুরুত্ব	৮০	গ্রাম।
মেষ ...	,, ,,	১২০	,,
সিংহ ...	,, ,,	২৫০	,,
গরিলা (বনমানুষ)	,, ,,	৪০০	,,
বৃষ ...	,, ,,	৫০০	,,
ঘোটক	,, ,,	৬৫০	,,
মনুষ্য ...	,, ,,	১৩৬০	,,
তিমি ...	,, ,,	২৮০০	,,
হস্তী ...	,, ,,	৭৬০০	,,

শরীরের পরিমাণে মস্তিষ্কের গুরুত্বের তারতম্য।

কচ্ছপের মস্তিষ্ক তাহার শারীরিক গুরুত্বের ১/২২৪০ অংশ।

বৃষের	,,	১/৬৫০	,,
হস্তীর	,,	১/৫০০	,,
বানরের	,,	১/৫০	,,
মেকেকোর (মেক-শুকপাখী)		১/২০	,,
মনুষ্যের	,,	১/৪০	,,
চটক পক্ষীর	,,	১/২৫	,,
সিম্পাঞ্জির (বনমানুষ)		১/২৫	,,

নূতন সংবাদ।

১। আলিপুরের পশুশালায় সম্প্রতি একটি হাতীর বাচ্চা হইয়াছে, আর একটির বাচ্চা শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা।

২। লর্ড কর্জ্জন ইতিমধ্যে একদিন চুপে চুপে কালীঘাটের মন্দির দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

৩। লর্ড কর্জ্জনের খিজমৎকার তাঁহার গৃহ হইতে দুইটা রূপার বাতিদান ও আরও কতকগুলি জিনিষ চুরি করিয়া এক পোদ্দারের দোকানে বন্দক দিয়াছিল, ধরা পড়িয়াছে।

৪। যদি কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, মান্দ্রাজের গবর্ণর-পত্নী লেডি আম্পহিল

* Scientific American 13-2-1897.

অগ্রে এবং লর্ড আম্পহিল দুই সপ্তাহ পরে সিমলা যাত্রা করিবেন। লর্ড কর্জ্জন যদি বিলাত যান, তাহা হইলে লর্ড আম্পহিল তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৫। মান্দ্রাজে শিক্ষিতা ধাত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য লেডি আম্পহিল সচেষ্ট হইয়াছেন।

৬। একটি নূতন দাতব্য হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য আজীমগঞ্জের বাবু ধনপৎ সিং নৌলাখা ১৫০০০ হাজার টাকা দান করাতে ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

৭। আঙ্কল টমস্ ক্যাবিনের প্রকাশক চার্লস হেনরী ক্লার্কের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৫২ সালে ১ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তক বার লক্ষের অধিক বিক্রয় করিয়া দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা খরচ খরচা বাদে লাভ করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে গ্রন্থকর্ত্রী বিবি ষ্টোকে হাজার গিনি পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার পিতা কাপ্তেন জেমস্ ক্লার্ক কোপেনহেগেনের যুদ্ধে লর্ড নেলসনের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন।

৮। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার পেড্লার সাহেবের বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর অতীত হওয়াতে কার্য্য হইতে অবসর লইবার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আর দুই বৎসরের জন্য কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

৯। রুষিয়ার সম্রাট আডমিরল্ ম্যাকারফকে নৌসেনার অধিনায়ক এবং কুরুপ্যাটরককে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

১০। গত ১লা এপ্রিল লর্ড কার্জ্জন বর্দ্ধমান ভ্রমণে গিয়া মহারাজাধিরাজের অতিথি হইয়াছিলেন।

১১। গত ৭ই চৈত্র কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১২। গত ৭ই এপ্রেল বঙ্গের ছোট লাট দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

১৩। ঢাকার নবাব খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর বড় লাটের বাটীতে (Private) গোপনে যাইবার অধিকার পাইয়াছেন।

১৪। আণ্ডামান দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিনা তারে সংবাদাদি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

১৫। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নগরে একটি স্নানাগার হইয়াছে। তথায় দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান হয়। দুগ্ধে স্নান করিলে রং ফরসা হয় বলিয়া মার্কিণ রমণীগণ দলে দলে স্নান করিতেছেন।

১৬। গত ২৬শে মার্চ্চ সার হেনরী কটনের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

১৭। লালদীঘির প্রাঙ্গণে দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

১৮। এ দেশে শিল্পাদি শিক্ষার সহায়তার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় একটি

সভা স্থাপিত হইয়াছে। সুবিদ্বান্ বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাহার সম্পাদক। অনেক কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহাতে উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন।

১৯। বেথুন কলেজ কমিটী বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকে কমিটীর নূতন সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

২০। কলির দাতা কর্ণ এণ্ড্রু কার্ণেজি ফিলাডেলফিয়া নগরে ৩০টী পাঠশালা নির্ম্মাণার্থ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২১। মান্দ্রাজের গবর্ণর মান্দ্রাজ নগরে কুক্কুরাশ্রম নির্ম্মাণার্থ ২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২২। গত দশ বৎসরের মধ্যে গ্রেট-ব্রিটেনে নিদ্রিত জননীর শরীরের চাপে অন্যূন ১৫ হাজার শিশু সন্তান মারা পড়িয়াছে। জর্ম্মণিতে ২ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক শিশুর সহিত একশয্যায় রাত্রিকালে কাহাকেও শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। ইহাতে উক্তরূপ শিশুহত্যা দুর্ঘটনা ঘটে না। এদেশে এরূপ দুর্ঘটনা অনেক ঘটে, তাহার প্রতিবিধানের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম এ, প্রণীত; এস্. কে লাহিড়ী এবং কোং দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য ২৲ টাকা। গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ এবং সুন্দররূপে মুদ্রিত। ইহাতে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লোকদিগের ৩৫ খানি সুন্দর ছবি আছে। রামতনু বাবু যেমন আদর্শ চরিত্রের লোক, তাঁহার জীবনী পণ্ডিত শাস্ত্রীর দ্বারা লিখিত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এবং বর্ণিত ঘটনা সকল এরূপ ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে সাধারণের শিক্ষা ও চরিত্রোন্নতির সহায়তা হয়। সামান্য সামান্য ঘটনা ও তারিখাদিতে কিছু কিছু ভুল দৃষ্ট হইল, আশা করি বারান্তরে তাহা সংশোধিত হইবে। রামতনু বাবু যে কৃষ্ণনগরে ও লাহিড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ইতিবৃত্ত আমূল বর্ণিত হইয়াছে। রামতনু বাবু কিরূপ দারিদ্র্য ও বাধাপ্রতিবন্ধকের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্র সংগঠন করেন, কিরূপ নৈপুণ্য ও সুযশের সহিত অধ্যাপকতা কার্য্য সম্পন্ন করেন, যখন যেখানে ছিলেন আপনার সরলতা, সত্যপরতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, সৌজন্য ও চরিত্রবলে কেমন সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃবিয়োগ, পুত্রকন্যা-বিয়োগ, স্ত্রীবিয়োগ প্রভৃতি পারিবারিক

নানা দুর্ঘটনা ও ঘোর পরীক্ষার মধ্যে কিরূপ ঈশ্বরনির্ভর ও বিশ্বাসবলের পরিচয় দিয়াছেন, এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর ও উন্নতিকর কার্য্যে কিরূপ প্রাণের সহিত যোগদান করিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি কেবল জীবনী নহে, আধুনিক বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। ইহাতে সাধারণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বঙ্গসাহিত্যসমাজের পূর্ব্বাবস্থা ও সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজী শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা তাহার সংস্কারার্থ বিবিধ চেষ্টা, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতির স্থূল বিবরণ আছে এবং যে সকল মহাপুরুষ গত ১০০ বর্ষে বঙ্গসমাজ ও বঙ্গসাহিত্যাদির সংগঠনকর্ত্তা, তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, বক্তা রামগোপাল, নাটককার রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, উপন্যাসলেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির বিশেষ বৃত্তান্ত আছে।

এরূপ পুস্তক প্রত্যেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর পাঠ্য। এতৎপাঠে সকলেই মহোপকার লাভ করিতে পারিবেন।

২। বীরকুমার-বধ-কাব্য — "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি", "কনকাঞ্জলি" প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমানকুমারী প্রণীত ও শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রকাশিত, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমতী মানকুমারী তাঁহার সরল, মধুর ও স্বভাব-স্ফূর্ত্ত কবিতার জন্য বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। এতদিন তাঁহার খণ্ড কবিতা সকলই লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছিল—এখন একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ জনসমাজকে উপহার দিয়া তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতার্হ ও কবি-যশোভাজন হইলেন। এই গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার রসজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বাগ্‌বৈচিত্র, চরিত্র-চিত্রাঙ্কনপটুতা এবং সর্ব্বোপরি অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের জয়সংস্থাপনের স্থির লক্ষ্য দর্শন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। লেখিকা মিত্রাক্ষর ছন্দরচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহার পিতৃব্য কবীন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুসরণে বর্ত্তমান গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া পিতৃব্যের মুখ যে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় ও দীর্ঘজীবিনী করুন্ এবং তাঁহার লেখনী হইতে এইরূপ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ সকল আরও বাহির করিয়া বঙ্গরমণীদিগের গৌরববৃদ্ধি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহায় হউন্।

কাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রকাশক কবিরত্ন মহাশয় যে সমীচীন সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি হৃদ্য। তাহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"অভিমন্যু কথা মহাভারতের একটী প্রধান ঘটনা। অভিমন্যুকথা শোকার্ত্ত মানবের সান্ত্বনাস্থল।

মাতুলো যস্ত গোবিন্দঃ পিতা যস্ত ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে নিয়তি কেন
বাধ্যতে॥

অভিমন্যু-নিধন সানুজ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। আসক্তি ও অভিমানের উপর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। বৈরাগ্যই মহান্ ধর্ম্মের সিংহাসন। অভিমন্যু-নিধনে পাণ্ডব-হৃদয়ে একটী গভীর বৈরাগ্যের ছায়া পতিত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা জয়োল্লাসে স্ফীত হন নাই; তাঁহারা সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও মত্ত বা বিচলিত হন নাই। দ্যূতক্রীড়া ব্যসনমধ্যে পরিগণিত, সর্ব্বদা পরিহার্য্য। যিনি যুধিষ্ঠির দ্বারা জগতে ধর্ম্মসেতু বন্ধন করিবেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু-নিধন ঘটাইয়া, ভক্ত যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি চিরকালের জন্য ঘুচাইয়া দিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী অভিমন্যু-বধ কাব্যের উপসংহারে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় এ বিষয়টী বুঝাইয়াছেন।

'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' এই মহাবাক্য —এই সার সত্যই এ কাব্যের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থকর্ত্রী তাহা অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অতি মধুরভাবে বুঝাইয়াছেন। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।' গ্রন্থকর্ত্রী প্রতিভাবলে নব নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক চরিত্রেই এই মহান্ সত্যকে পাঠকের প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

এই মহাকাব্যের কবি সাত্ত্বিক প্রকৃতির কবি; এই জন্য ইহাঁর কাব্যে কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্র ব্যাসবর্ণিত সেই সেই চরিত্র হইতে বিভিন্ন হয় নাই, বরং কোনও কোনও চরিত্র মূল মহাভারত হইতে উজ্জ্বলতর।

এই কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে চিত্ত সেই অপার্থিব সাত্ত্বিক রস আস্বাদন করিয়া পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হয়, অলৌকিক বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া অসীম মঙ্গলের পথে প্রসারিত হয়। অতএব সৎকাব্যের চরম উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।"

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, "বীর-কুমার-বধ কাব্য" যখন মুদ্রিত হইতেছিল, তখন কুচবিহারের মহারাজা ইহার কয়েক ফরমার প্রুফ দর্শনে প্রীত হইয়া গ্রন্থকর্ত্রীর উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ১৫০ টাকা দান করেন। এই পুস্তকখানি সুন্দররূপে মুদ্রিত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা আশা করি, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই এই অপূর্ব্ব কাব্যখানির প্রচারার্থ যথাসাধ্য উৎসাহ ও সাহায্যদানের ত্রুটি করিবেন না।

বামারচনা।

বাসন্তী নিশায়—প্রান্তরে।

একি ?
আজ ধরা ডুবে গেছে, কোন্ শোভাতে ?
মধুর সলয় মৃদু মৃদু পদে,
এসেছ কাহার হৃদি কোকনদে,
আকুল হৃদয় জুড়াতে ?
শত-কুমুদীর বিরহ-বেদনা,
জুড়াইতে লয়ে অমল জ্যোছনা
অবনীর অমা হরিতে।
শশাঙ্ক নির্ম্মল নীল নীলিমায়
ভাসিতেছে মরি কার করুণায়,
কাহার চরণে নমিতে ?
নির্জ্জন বন, উপবন, গিরি,
নীরবে ছড়ায় কাহার মাধুরী—
গভীর, সুপ্ত, অলসা?
আরতি করিছে শত দীপ জ্বালি,
স্নিগ্ধ নিশীথে, তারকাবলী—
ধ্যানে ধরি কার লালসা ?
রেণুময় পীতবক্ষ বিছায়ে
প্রান্তর—তনু পড়েছে এলায়ে
পথিক নয়ন লোভাতে।
কোথাও শ্যামল, নব তৃণদল,
মাখিয়া নিশির নীহারাশ্রু-জল
ঘুমায় অতুল শোভাতে।
আঁকিয়া বাঁকিয়া রাজপথখানি
চলিয়াছে যেন ম্লান উদাসিনী
নগর তেয়াগি কাননে।
শত পান্থপদ বক্ষে ধরিয়া,
অনলস প্রাণ গিয়াছে বহিয়া,
বুঝি কোন গূঢ় কারণে।
পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ তরুদল,
দূরিতে সতত আতপ অনল
অযুত হস্ত বিসারি।
অতি প্রিয়তম বান্ধবের মত,
জুড়াইছে তায় স্নেহে অবিরত
বিনত হৃদয় প্রসারি।
চারি দিকে এক স্তব্ধ মহান্
নীরব মাধুর্য্য রয়েছে শয়ান
মগ্না বিভোর ধরণী।
চিন্তা-শ্রম-হরা অঞ্চল বিছায়ে,
বিশ্বদেবে যেন হৃদয়ে ধোয়ায়ে,
ঘুমায় বিশ্ব-ঘরণী।
মরি! এ মধুর শীতল পবন
উন্মুক্ত, বিশাল, অমল, গগন,
কি বিশাল ভাব বহিয়া।
ঢালে প্রসন্নতা মর প্রাণে ধীরে,
হীন অবসাদ মুক্ত পূত নীরে
দূরি দূরে—স্নেহে ক্ষালিয়া।
খুলে যায় প্রাণ, থেমে যায় গান,
রহে না হেথায় মান অপমান,
যেথা বিমোহিনী প্রকৃতি।
নগ্ন শোভন সৌন্দর্য্যে সাজিয়া,
শত দীপ্ত দীপ হৃদয়ে জ্বালিয়া,
ব্রহ্মে করিছে আরতি।
যোগী জন জাগে সমাধিতে মন,

ধ্যেয়ায় বাঞ্ছিত আরাধ্য চরণ,
এ বাঞ্ছিত মুক্ত অনিলে,
সুবিমল নিশা আলোক-প্রকাশি
মগ্ন করে বত সালোক্য পিপাসী,
ঈপ্সিত শান্তি সলিলে।
চির-মায়াবদ্ধ ভ্রান্ত নর নারী
চৌদিকে হেরি মহিমা তাঁহারি
মুহূর্ত্তে আপনা ভুলে।
দিগদিগন্তরে অসীম বাসনা
প্রদানে তাদেরও লুকান বেদনা
তাঁহারি চরণমূলে।
শিল্প শোভা হতে আঁখি ফিরাইয়া
দূর জনস্রোত পশ্চাতে ফেলিয়া
বারেক এ নব মহিমা।
আঁখি পরে যার হয় প্রতিভাত,
ভোলে সে ধরার ঘাত প্রতিঘাত,
ভাবি অসীমের অসীমা।
ভাবদৃষ্টিহীন আঁখি তাও ঢাকা,
পরতে পরতে শত যবনিকা
কুহেলিকা-মাখা পৃথিবী,
কি শুভ মুহূর্ত্ত ক্বচিৎ কখন(ও)
ঘুচালে দারুণ নয়নবন্ধন
হরষ ধন্যা মানবী।
স্বর্ণ ভারত শস্যশ্যামলা,
দিব্য উজল সুজলা সুফলা
জ্যোৎস্না পুলক বসনে।
কি নব সৌন্দর্য্য কত শোভাময়,
হেরে জগতের প্রাণী সমুদয়
প্রীতি পরিপ্লুত নয়নে
কেবল মায়ের অভাগী দুহিতা
শতাবগুণ্ঠনে হয়ে আবরিতা
সৌধ বা কুটীরমাঝারে।
প্রিয় অবরোধ পালে ধীর মনে,
আঁখি নত ক'রে স্তব্ধ গৃহকোণে
কভু আলো, কভু আঁধারে।
সীমাবদ্ধ এক সাম্রাজ্যের মাঝে
সকলেই রত আপনার কাজে,
দীনা হীনা কিবা মহিষী।
"উন্মুক্ত আকাশ"—গৃহ-চন্দ্রাতপ,
নাইক' সেথায় শীত বা আতপ
পোহায় দিবস সুনিশি।
"মহীরুহ" তথা উচ্চ প্রাচীর
সভয়ে অনিল বহয়ে সুধীর
প্রাঙ্গণ-পুষ্প বিকাশি।
এ জীবন বদ্ধ পতি, পিতা, পুত্রে,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা সেই সূত্রে,
হয় না অন্যত্র উদাসী।
প্রকৃতির এই অবরুদ্ধ বালা,
তার চোখে আজ সুষমার ডালা,
কে ধরেছে বল খুলিয়া!
অন্ধ চক্ষু মেলে কি দেখিছে চেয়ে?
এ যে মা তোমার কারাবাসী মেয়ে
এসেছে শৃঙ্খল টুটিয়া।
মুক্ত আকাশ—মৌন জগৎ
যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ,
দাও তবে প্রাণে ভরিয়া।
এ মধু মুহূর্ত্তে—হে প্রকৃতি রাণি!
খুলে দাও বক্ষ—লও সেথা টানি
হরষ-অশ্রু মুছায়ে।
এ চির-জড়তা ভীতি অবসাদ
ক্ষণেকও রহি গো ভুলিয়ে।

শ্রীমতী সরসীবালা, শাহারণপুর।

নীহারে সিক্ত শুষ্ক গোলাপ।

সবুজ পাতার তলে ওরেরে গোলাপ!
কেন লজ্জা-নম্র-মুখী,
কেন জলে পূর্ণ আঁখি,
কি দুঃখেতে করিছ দুঃখের বিলাপ?

সবুজ পাতার তলে ও প্রিয় গোলাপ!
দেখে তব শুষ্ক মুখ,
বড়ই হইল দুখ,
কেন হইয়াছ শুষ্ক? কে দিয়েছে শাপ?

কোথায় গোলাপ তোর সে সুখের দিন,
যে গিয়েছে কাছ দিয়ে,
দেখিয়াছে চেয়ে চেয়ে,
ফিরেও না চায় এবে দেখিয়ে মলিন।

সে সুখের দিন তোর কোথারে গোলাপ!
ফুল! তব মধু যেচে
ভ্রমর আসিত কাছে,
সে দিন কেনরে গেল? কি করেছ পাপ?

সে সুখের দিন তোর কোথারে গোলাপ!
তোর যে গন্ধের বাসে,
গগনের বিধু হাসে,
কোথায় গেলরে তোর সে সব প্রতাপ!

পাইয়ে সুগন্ধ তব সান্ধ্য সমীরণ
আহ্লাদ-সাগরে ভাসি
ধীরে তব কাছে আসি
সাদরে চুম্বিত তব সুচারু বদন।

সে সুখের দিন তোর গিয়াছে ভাসিয়া,
দেখ ঐ পুষ্পগাছে
গোলাপ ফুটিয়া আছে,
গন্ধে মধুকরগণ আসিছে ধাইয়া।

নিকটে যাইয়ে তার সরস পবন
হাসি আনন্দের হাসি
লইয়ে সুগন্ধিরাশি,
চারি দিকে করিতেছে অমৃত সিঞ্চন।

উহারো হইবে দশা তোমারি মতন,
ফুরাইবে যত সুখ
শুকাবে সুন্দর মুখ,
ফুরাইয়া যাবে বর্ণ কান্তি সুশোভন।

কুমারী সুরুচি,
মেদিনীপুর।

১৩১০ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।	
নববর্ষ ...	২
বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা ...	৫
শিক্ষিত মহিলার দায়িত্ব	৩১
দেরাদুনে কন্যাপাঠশালা	১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীশিক্ষা ...	১০০
বামাবোধিনীর একচত্বারিংশ-জন্মোৎসব	১২৯
প্রেমগাথা ...	১৩১
প্রার্থনা ...	১৩৩
বামাবোধিনীর জন্মোৎসব-সম্মিলন	১৩৪
নব্য বঙ্গ-মহিলা ..	১৭৯
শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব	৩৪২

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

একটু পূর্ব্বস্মৃতি ...	৪৫
সুমাতা ...	৮৯
বিবির অগ্নিসংস্কার ...	৯৯
দান-যজ্ঞ ...	১৩৭
আশ্চর্য্য স্বামিভক্তি ...	২৪৭
বিবি বেসাণ্টের বক্তৃতা	২৬৬
করমেতি বাই ...	২৯৭
স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে	৩০৪

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

বীর-পূজা ...	৯
গীতাসার ব্যাখা	২০, ১৫২, ২৩৪, ৩০০
নবীন ভারতী	২২, ১৮২, ৩৩৮
ঈশ্বরের নামাবলী	৪৪, ১১৩, ১৮৫, ২১৮, ২৪৯, ৩১৪, ৩৪৭
মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যাখান ...	৬৯
জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন (পূর্ব্বজন্ম)	৮৪
অমরত্ব ও নারীধর্ম্ম ...	৮৬
মহদ্বাক্য ...	১১১, ১৪৮
গুরুভক্তি ...	১২২
পৌরাণিক কথা—উমাব্রত	১৩৯
সুমাতার জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা	১৭২
সতীর প্রতিজ্ঞা ...	২৪৩
মৃত্যু বা নিভৃত চিন্তা ...	২৭০
উদাসীনের চিন্তা ...	২৯১
গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্য	৩০৬

৪। সমাজ ও গৃহধর্ম্ম।

বিবাহ ব্যয় ...	৩৯
গৃহকার্য্য ...	৪৮
দাহ না সমাধি ..	১৯৬
ভাইফোঁটা ...	৩
দুগ্ধপোষ্য বিধবা ...	২২৬
মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষা চর্চ্চা	২২৮
কায়স্থ মহিলাগণের সমীপে নিবেদন	২৪৫
হিন্দু-বিধবা ...	২৫৯
বিধবা-বিবাহের উপসংহার	৩৫২
আমাদের দেশের কি হইল ?	২৬৩
নূতন ও পুরাতন প্রভু ও ভৃত্য	২৭৫, ৩২৫
গৃহ-চিকিৎসা—মুষ্টিযোগ	৪২, ১২০

৫। ইতিহাস, জীবনচরিত ও ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ফা-হিয়ান ...	১২, ৬৭
লোহানী বণিক ...	১৬
শিষ্যকর্ত্তৃক গুরুর উদ্ধার	৭৯
পাশ্চাত্য গ্রাম্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	৯১, ২১৫, ৩০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দয়ানন্দ সরস্বতী	১০৮, ১৮৪
স্বর্গগত কবি হেমচন্দ্র ...	১৭৭
মৌনিসভা ...	২৩১
নানক ...	২৬১
মৃত্যুসম্বন্ধে বিশ্বাস ...	২৯৪
ঐতিহাসিক উপন্যাস—পরাজয়	১৬৮, ২০০
কোরিয়ার সহিত জাপান ও রুসিয়ার সম্বন্ধ	৩২৩
নলিনীর শিক্ষা ...	৩৬৪

৬। দেশভ্রমণ।

হিমাচলের কাকু ...	১৯
জীবনের একদিন ...	২৬
ভারতীয় পুণ্যনদী	৫৩, ১১৪, ২৮৯, ৩৫৭
বনবাসিনীর পত্র ..	৫৭, ২৮৩
আমেরিকার পত্র (ইংরাজী)	৬৩
কপিলেশ্বর ...	১০৪
বন্যনারী ...	২১০
পত্র ...	২৩৯
ডুমরাওন ভ্রমণ ...	২৮১
পালামৌর বন্যজাতি ...	৩১১, ৩৭১
পত্র ...	৩৩৩
রেলওয়ে হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের অপকারিতা	৩৬৩

৭। বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান-রহস্য ...	৪৯, ৩৭৩
দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ ...	৭৪
প্রাণিতত্ত্ব ...	৮২
শীলমৎস্য ...	১১৮
রসায়ন-বিদ্যা—নাইট্রোজেন	১৪৩
ঐ কার্ব্বণ ...	৩৪৮
চতুর্দ্দশ ভুবন ও জীবদেহ ...	১৪৫

৮। পদ্য।

অনন্ত ...	৮
ইলিয়ড	১১, ১১৭, ১৪৬
বিসর্জ্জন ...	১২
আদর্শ রমণী ...	৩৭
সাধুবচন-সংগ্রহ	...৩৮, ৮৭, ১৯৮
শোক-গাথা ...	৪৩, ৭৭
কালের খেলা ...	১০৫
জ্যোতি ...	১২১
শরৎ-পূর্ণিমা রজনী ...	১২০
চৈতন্যাষ্টকম্ ...	১৫০
সুভদ্রা ...	১৫৯
বন্যনারী-সঙ্গীত ...	১৮৬
ধর্ম্মরাজ্য ...	২০৮
সংসার-লীলা ...	২০৮
অপরাজিতা ...	২১৩
আকাঙ্ক্ষা ...	২৩৩
মিলন ...	২৩৫, ৩৩৫
দশা কি হইল ? ...	২৬৫
চিত্তপ্রসাদ ...	২৮৬
সুখের জীবন ...	৩১৩
আমার দাদা ...	৩৩১

৯। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা ...	১
বিবিধ তত্ত্ব ...	৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাব্যবোধ	...৫১, ৮৮, ১৭৬
পত্রাবলী	... ৭১
সিগারেটের অপকারিতা	... ৭৫
বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ	... ১৫৪
রচনা-রীতি	... ১৯৪
বঙ্গ দ্বিধা হও	... ৩০৮
রুষজাপান যুদ্ধ	... ৩০৯
পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতীর স্মারক কীর্ত্তি	৩৬৯

১০। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৯৪, ২২০, ২৫৩, ৩১৬, ৩৭৬।

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৩, ৬৫, ৯৭, ১৩৫, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ৩২১।

১২। নূতন সংবাদ।

৫৯, ৯৩, ১২৪, ১৮৭, ২১৯, ২৫০, ৩১৪, ৩৭৪।

১৩। বামারচনা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবাহন গীতি	... ৬০
নববর্ষের প্রার্থনা	... ৬১
কোথা মম গেহ	... ৬২
করুণা তোমার	... ঐ
কবি বিদায়	... ৯৫
প্রীতি উপহার	... ৯৬
শিশু	... ১২৬
অমানিশায় কর্ত্তব্য আবাহন	১২৭
শুভ বরষার দিনে	ঐ
কুন্তলীন	... ১২৮
জননী	... ১৮৮
জ্যোৎস্নার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ কামনা	১৯০
সে কথা তুল না	... ঐ
আত্মসমর্পণ	... ১৯১
মর্ম্মগাথা	... ১৯৭
স্মৃতি	... ঐ
আহ্বান	... ২২
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়	... ২২
ভাইদ্বিতীয়া	... ২২৬
কাঙ্গালের আবাহন	... ঐ
একটী নবজাত শিশুর জন্মোপলক্ষে	২২৪
অমিয়া আমার	... ২৫৪
শিশুর হাসি	... ২৫৫
অনিত্য সংসার	... ঐ
নীরব	... ৩১৭
বিদায়ী পূর্ণিমা	... ঐ
যায় দেবী যায়	... ঐ
স্মৃতি	... ৩১৮
ব্যর্থ আশা	... ৩১৯
করুণা সুন্দরী	... ৩২০
বাসন্তী নিশায়—প্রান্তরে...	৩৭৯
নীহারে সিক্ত শুষ্ক গোলাপ	৩৮১